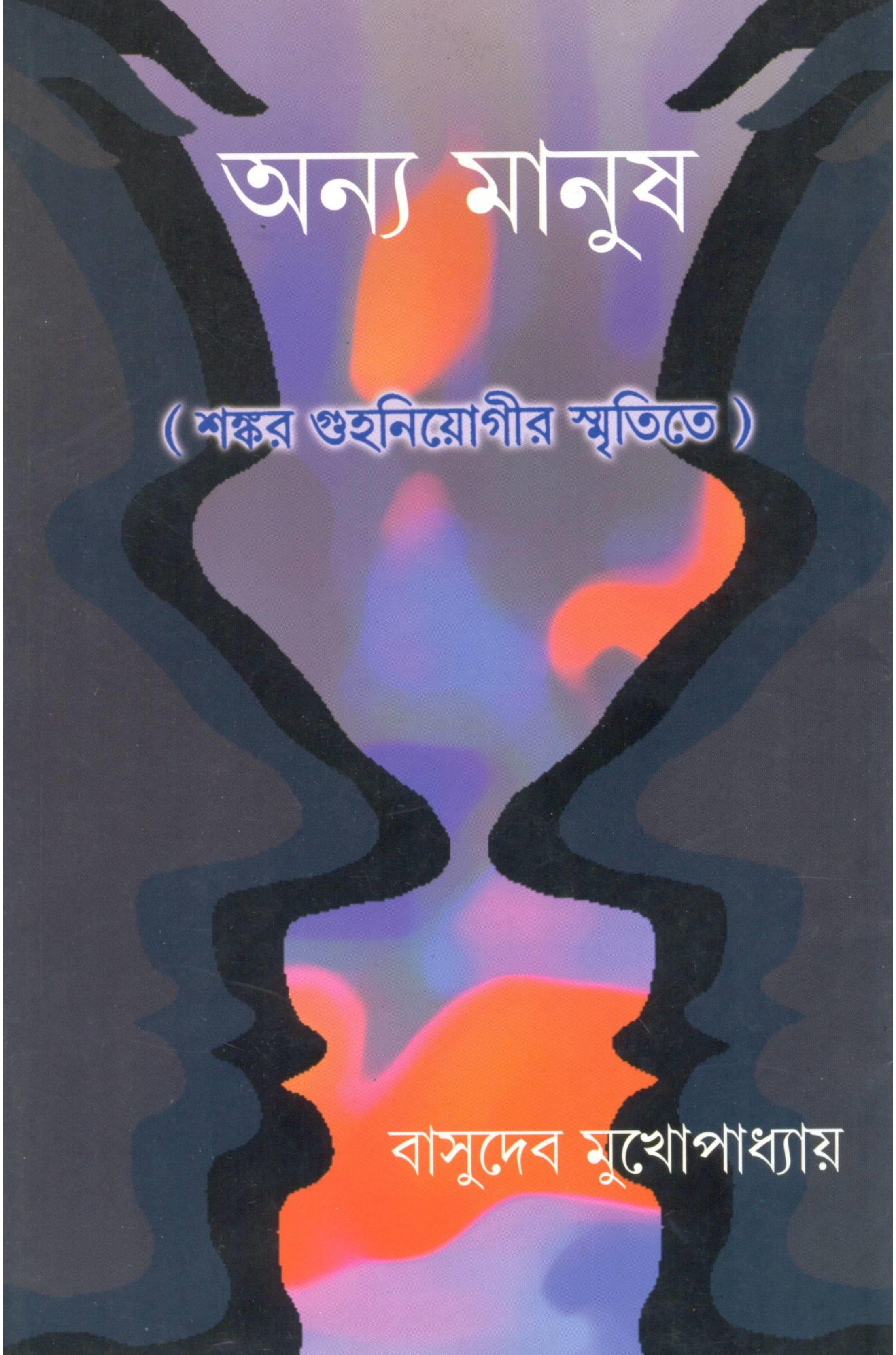
অন্য মানুষ
(শঙ্কর গুহনিয়োগীর স্মৃতিতে)
বাসুদেব মুখোপাধ্যায়

অন্য মানুষ

(শঙ্কর গুহনিয়োগীর স্মৃতিতে)

বাসুদেব মুখোপাধ্যায়

পাভলভ ইনস্টিটিউট

Annya Manush
by Basudev Mukherjee

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারি 2005

প্রকাশক
গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়
পাভলভ ইনস্টিটিউট
98 মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা - 700 007

মুদ্রাকর
ইমপ্রেসিভ ইমপ্রেশন
10 কার্তিক বোস স্ট্রীট
কলকাতা - 700 009

প্রচ্ছদ
দীপ্তধী মুখোপাধ্যায়

দাম : 50.00 (পঞ্চাশ টাকা)

ISBN 81-88036-11-0

যাঁদের ভালবাসায় বেড়ে উঠেছি, যাঁদের আজও আপন
অস্তিত্বে অনুভব করি, তাঁদের সকলের কথা মনে রেখে

রাজনন্দগাঁওয়ের পশ্চিম আকাশে সূর্য অস্ত যায় সামনের দল্লী-রাজহারা ন্যাড়া লোহা পাহাড়কে সাক্ষী রেখে। আকাশের দিগন্ত থেকে তারই বর্ণালী আলোর ছটা রঙ মাখিয়ে ছড়িয়ে পড়ে চারপাশে।

ঠাণ্ডাটা কমে আসছে, বাতাসের স্পর্শে সেই শীতলতা আর নেই। তবু এ দেশে যত দিন ঠাণ্ডা থাকে ততদিনই পশুপাখি ও মানুষের প্রাণধারণের স্বস্তি। ঠাণ্ডা থাকে মোটে এই তিনটে মাস।

তারপরই যখন দূরের পলাশ গাছটা ফুলে ভরে উঠবে, ফুলগুলো ঝরে ঝরে তলায় পড়বে, তার ওপর বড় বড় মাছিগুলো ভোঁ ভোঁ আওয়াজ করে ঘুরে বেড়াবে, চামড়া পোড়ানো সূর্যের তেজ তখনই বাড়তে থাকবে। আর কখন যেন ফিক্ করে একটু হেসে, দক্ষিণ পবনে দোলা না দিয়ে বসন্ত উধাও হয়ে যাবে।

শুরু হবে গাঁয়ে গাঁয়ে জলকষ্ট, পেটের অসুখ আর সারা শরীর জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দেওয়া শুকনো বাতাসের তাপ। তখন হাসপাতাল এইসব সাধারণ রোগ-অসুখে ভরে উঠবে। বোঝা যাবে, এবার গরম শুরু হয়েছে।

রাস্তার পাশে একটা টিলার ওপর শহীদ হাসপাতালের গা ঘেঁষে বানানো ডাক্তারদের ঘরগুলোয় এক ফালি বারান্দার রেলিংয়ের ওপর অভীক তার প্রিয় স্থানটিতে হাঁটু মুড়ে বসে, দূর আকাশে যাবার আগে দিনমণির এই রাঙিয়ে দিয়ে যাবার খেলার দিকে তাকিয়েছিল। সেটাই যে সে ভাল করে দেখছিল এমন হয়তো নয়। ঐ দিকেই তাকিয়েছিল আর নানা কথা তার মনের মধ্যে ভিড় করছিল।

পুরানো দিনের অনেক কথা। যেন মনে হচ্ছে এই তো সেদিনের কথা। ভাবতেও কষ্ট হয়, সেই মানুষটা আর নেই, মনে হচ্ছে এই তো কয়েকদিন হল নিয়োগীজী এদিক ওদিক দিল্লী বা ভিলাই কোথাও গেছেন।

যেমন বাইরের কেউ তাঁর খোঁজ করতে এলে বলে দেওয়া হয়, তিনি বাড়িতে নেই বাইরে কাজে গেছেন। আপনার কোন দরকার থাকলে আপনি ঐ লাল ময়দানের কাছে মুক্তি মোর্চার অফিসে খোঁজ করুন।

ভাবনার স্রোতের মাঝে হঠাৎ যেন ছত্তিশগড়ের সেই লম্বা রোগা মানুষটা ভুস্ করে অভীর চোখের সামনে ভেসে ওঠেন। সেই হাসি হাসি মুখ অবিকল, অভীর সামনে দাঁড়িয়ে বলছেন, "ডাক্তারসাব, একেলী বইঠে কেয়া শোচ রহে হো।"

ক্লান্ত শরীরে অভী হাই তোলে। চশমাটা খুলে চোখ রগড়ায়। আজ তার সারাদিন হাসপাতালে কেটেছে, অনেক কাজ বাকি পড়ে ছিল, আজ সব শেষ করে ফিরেছে। শুধু চা খেয়েছে আর কাজ করেছে।

বন্ধুরা কেউ নেই, তারা সব কেউ কলকাতায় কেউ বাড়ি গেছে। সবাই নানা কাজ নিয়ে ব্যস্ত। আর এখানে নিঃসঙ্গতা যেন অভীককে রাত্রির ঘন অন্ধকারের মত চেপে ধরেছে।

ওদিকে নারীমুক্তি মোর্চার সম্মেলন চলছে, বাইরে থেকে অনেক প্রতিনিধি এসেছেন। মোর্চা অফিস এখন জমজমাট। হাসপাতালে তাদের অনেকের রাত্রে শোবার জায়গা করে দিতে হয়েছে।

অভীরও সম্মেলনে যাওয়ার কথা; কিন্তু যাওয়ার কোন উৎসাহ সে পায় না। চুপটি করে বসে চারপাশে চক্ষুষ্মান এই অনুভূতির জগৎকে, এই বিশ্বসংসারকে এখন সে আপনার মত করে উপলব্ধি করতে চায়। হঠাৎ তার মনটা বিষাদে ভরে ওঠে, তাকেও একদিন এই জগৎ ছেড়ে চলে যেতে হবে।

দেখতে দেখতে তার চোখ চলে যায় ঘরের কার্নিশে গজিয়ে ওঠা শ্যাওলা ছত্রাক আর এ পাশে ও পাশে ঘিরে ফেলা আগাছার দিকে। প্রকৃতি ঠিক তার আপন কাজে মত্ত।

তিনশো পঞ্চাশ কোটি বছর আগে যে প্রাণের প্রবাহ শুরু হয়েছিল তা আজও সমানভাবে অব্যাহত। এর মাঝে হিমযুগ এসেছে আরও কত মহাবিপর্যয় এসেছে; কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যেও প্রাণের প্রবাহ থেমে যায়নি। ডি.এন.এ. তার প্রাণের ধারাবাহিকতা নিয়ে প্রতিমুহূর্তে কাজ করে চলেছে। এটাই প্রাণের অভিব্যক্তির রহস্য।

আর এর চারপাশে সাজানো ফুল গাছগুলো মানুষ লাগিয়েছে। প্রকৃতির পাশাপাশি নতুন একটা প্রকৃতি তৈরির চেষ্টা। ফুলগাছগুলো অনেকদিন জল পান করেনি। রাস্তার বিস্তর ধুলো পড়েছে তাদের গায়ে। তবু মৃদু সুমন্দ বাতাসে তারা দোলা খায়। রাবারের নলটা দিয়ে একটু জল ছিটিয়ে দিলে ভালই হত ।

তার বন্ধুরা এসব করে। অভী আপন মনে হাসে, তার এসব দেখতে ভাল লাগে; কিন্তু করতে উদ্যম আসে না। হয়তো এক একজনের এমন স্বভাব থাকে। ছেলেবেলা থেকে সে ঐভাবে গড়ে ওঠে। অভীর মনে হয়, দি-ই না হয় একটু জল। কিন্তু কাজটা সহজ নয়, অনেক হাঙ্গামা। এইসব সাতপাঁচ ভেবে অভী নিশ্চিত হয়, এ তার স্রেফ কুড়েমি।

নিয়োগীজী খুব গাছপালা ভালবাসতেন। যেখানেই গেছেন একটি নতুন চারাগাছ সঙ্গে নিয়ে ফিরেছেন। ঐ গাছই যেন ছিল তাঁর কাজের স্মৃতি। এ ব্যাপারে তিনি রীতিমত পড়াশোনা করতেন, তাঁর যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। অনেকদিন তিনি বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়েছেন। ছত্তিশগড়ের সব গাছ তার চেনা।

প্রাণের অভিব্যক্তির মত নিয়োগীজীর কাজের অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতাই এক সামাজিক বিকাশ, উন্মোচনের শর্ত। যে চারা নিয়োগীজী বপন করে দিয়ে গেছেন তাকে মহীরুহে পরিণত করতে হবে। একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে অভীর!

তবু অভী এখন এখানে একা। একটু তলিয়ে দেখলে নিঃসঙ্গতা, একাকিত্ব এইসব কথার কী অসম্ভব ব্যঞ্জনা! নিয়োগীজীকে জিজ্ঞাসা করে এর কোন সদুত্তর পাওয়া যেত না। বলতেন, এই আপনারা সবাই চারপাশে আছেন, কই তেমন কিছু মনে হয় না তো। অভী নিশ্চিত, তাঁরও নিশ্চয়ই মাঝে মাঝে নিজেকে নিঃসঙ্গ মনে হত। হয়তো কাজের চাপে এসব নিয়ে মাথা

ঘামানোর সময় পেতেন না।

আর এখন বন্ধুরা কেউ নেই বলে কী অভীকে নিঃসঙ্গতায় পাক দিয়ে ধরেছে! কিন্তু এভাবে ভাবলেও তো চলে না। জীবনে কোন্ মানুষটা একা নয়, কোন্ মানুষটা বিচ্ছিন্ন নিঃসঙ্গ নয়। জন্মের পর থেকে প্রতিটি মানুষ একা আর নিঃসঙ্গ। আর যারা সর্বক্ষণ কাজ করেন তাদের একা একাই পথ হাঁটতে হয়। সঙ্গী পেলে ভাল নইলে তিনি একাই চলতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন।

অভীক এখানে আরও যে দু'জন চিকিৎসক সহকর্মীর সঙ্গে থাকে, তারা মুক্তি মোর্চার কাজে হোক, চিকিৎসার কাজে হোক মাঝে মাঝেই এদিক ওদিক যায়। অভীকেও ওদের সঙ্গে যেতে বলে; কিন্তু অধিকাংশ সময় নানা কাজের অজুহাতে অভী এড়িয়ে যায়।

শহরে প্রাণের উন্মাদনা-উদ্দীপনা অনেক বেশি। সব সময় যেন একটা চড়া আবেগে তাড়া খেয়ে সবাই ছুটছে। একসময় সে-ও এমনই ছিল, কিন্তু আজকাল লোকজনের ভিড়, কোলাহল, মানুষের অতিরিক্ত ব্যস্ততা — এসব কিছুই যেন ভাল লাগে না, বিরক্তিও লাগে। তাছাড়া ভাল-মন্দ বেছে নেওয়া বা পছন্দের ব্যাপারটাও যেন থাকে না। কয়েকদিনের জন্য কলকাতা গিয়েও সে দেখেছে, মনটা হাঁপিয়ে ওঠে।

দীর্ঘদিন নির্জনতার মধ্যে থেকে হয়তো এই নির্জনতাই তার সঙ্গী হয়ে গেছে। এও এক অভ্যেস! তাহলে নিঃসঙ্গ লাগে কেন!

আবার এখানে সারাজীবন কাটিয়ে দেবে একথা যখন সে ভেবেছে তখন অন্তরের পূর্ণ সাড়া পায়নি। বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলেও পরিষ্কার কোন দিশা পায় না। অভী ঠিক বুঝে উঠতে পারে না, কী করবে, কী তার করা উচিত, কোথায় সে যাবে, কোন্ অমৃতলোকে! তার ঠিক মনের মত কাজের জায়গাটি কোথায় পড়ে আছে, কে তার জন্য আসন পেতে রেখেছে, যেখানে তাকে দিয়ে কেউ মানুষের জন্য অনেক কাজ করিয়ে নিতে পারবে। যেখানে সে তার জ্ঞানবুদ্ধি অনুযায়ী চিকিৎসার কাজ দিয়ে অসংখ্য গরিব, খেটে-খাওয়া মানুষজনের মধ্যে মিশে থাকতে পারবে। সেখানেই জীবনের মুক্তি, প্রাণের আনন্দ সে খুঁজে পাবে!

নিয়োগীজীর কথাই বার বার মনে হয়, তিনি এসব শুনে বলতেন — জায়গা কেউ কাউকে দেয় না, জায়গা করে নিতে হয়।

কিন্তু এমন মনের মত ঠিকানা গড়ে তোলার ক্ষমতা কী সত্যি অভীর আছে! যত দিন যাচ্ছে অবস্থা যেন আরও কঠিন, জটিল আর ঘোরালো হয়ে উঠছে। আগে বাইরের সঙ্গে লড়াইটাই প্রধান ছিল। এখন বয়েস বাড়ার সঙ্গে নিজের মধ্যে লড়াইটাই যেন বেশি ভার মনে হচ্ছে।

তাছাড়া এখানকার মানুষেরা অভীকে এতই ভালবাসে যে এদের ছেড়ে যাওয়ার কথা অভী ভাবতেই পারে না। অভী চলে গেলে এরা নিশ্চয়ই দুঃখ পাবে। কিন্তু সারা জীবন সে এখানে থাকবে এই সিদ্ধান্তটা সে নেবেইবা কেমন করে? সব কেমন যেন এলোমেলো হয়ে

গেল!

সে গা ঝাড়া দেয়, এক্ষুনি সিদ্ধান্তটা কাউকে জানাতে হবে এমন নিশ্চয়ই নয়। আপাতত এসব আলমারিতে তোলা থাক। সে খেয়াল করে, দূর থেকে কেউ কেউ তাকে তাকিয়ে দেখছে; কিন্তু সাহস করে এগিয়ে এসে বলার কথাটা বলতে পারছে না।

পায়চারি করতে করতে সে ছত্তিশগড়ের কথা ভাবে। এখানে চারিদিকে মাটিতে ছড়ানো লোহা, তাই মাটি লাল। তারই মাঝে ইতস্তত সবুজের ঝোপ, এ পাশে ও পাশে বিচ্ছিন্নভাবে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকটা নানা মাপের গাছ।

লোহার খনি, লোহার পাহাড়, লোহার পাথর — চারদিকে শুধু লোহা আর লোহা। এই লোহা মাটি থেকে, পাহাড় থেকে জড়ো করে যে মানুষেরা — তারা এই দেশের, এই সমাজের; কিন্তু তাদের কোন পরিচয় ছিল না।

এরা যেন ছিল মাটির ওপর আপন গরজে নিছক প্রাণের তাড়নায় গজিয়ে ওঠা ঘাসের মত। গজায়, শুকিয়ে যায় আবার গজায়। আর তাদের কাজই হল সভ্যতার কার্বন ডাই-অক্সাইড শুষে নিয়ে অক্সিজেন দিয়ে যাওয়া। উল্টে আধুনিক সভ্যতা এদেরকে পায়ের তলায় কার্পেটের মত চমৎকারভাবে ব্যবহার করে চলে।

এরা সবাই ছিল 'রক্তকরবী'র সেই 'ঙ', 'ক'। সবাই জানত ভিলাইয়ের ইস্পাত কারখানার কথা; কিন্তু ছত্তিশগড়ের এই লৌহখনি, যার লোহা পাথরে ভিলাই চলে তার নাম কে জানত —! নিয়োগীজী যেন রঞ্জনের মত এসে এই 'ঙ', 'ক'-দের ভারতবর্ষের মানুষদের কাছে পরিচয় করিয়ে দিলেন। যেন জগজ্জনে জানলো, নামহীন গোত্রহীন পরিচয়হীন এ অঞ্চলের অসংখ্য মানুষজনের কথা — যাদের শ্রমে চলছে এই ভারতবর্ষ নামক দেশটা।

এখানকার গোঁড় আদিবাসী মানুষগুলোও যেন ঘুম ভেঙ্গে, অবাক হয়ে শুনল, তাদের সোনার দেশটার কথা।

তারা নিয়োগীজীর মুখ থেকে আরও জানলো, এ দেশের সভ্য শিক্ষিত মানুষরা তাদের বর্বর বলে যত অপমানই করুক না কেন তবু একটা কথা এই বর্বরেরা জোর গলায় বলতে পারে, তারা জারজ নয়, তারা ভূমিপুত্র, এই দেশের আদি মানুষ। তাই তারা আজ নিজের দেশে তাদের আপন মর্যাদা ফিরে পেতে চায়।

আজ তারা যেন ঘোষণা করতে চায়, এই ছত্তিশগড়ের বায়ু যারা বিষিয়ে দিচ্ছে, তাদের আলো যারা নিভিয়ে দিচ্ছে — তারা কেউ ক্ষমা পাবে না।

মনে পড়ে আসামের জঙ্গলে আর ঝর্ণার পথ ধরে ছুটে বেড়ানো সেই ছোট্ট ছেলে বাচ্চুকে, জলপাইগুড়ির পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়িয়ে পাঠাগার তৈরি করা, ছেলেপিলেদের সংগঠিত করা — সেই অখ্যাত অনামী কিশোরটিকে, যে বাংলার রেনেসাঁর গর্ব, সে আজ ছত্তিশগড়ের এই সহজ-সরল, প্রাণবন্ত, অতিথি-বৎসল মানুষজনের কাছে এই হিম্মৎ দেখিয়েছে, সে যেন এ দেশের সব মানুষকে চমকে দিয়েছে।

তাঁর পথ খোঁজার নেশায় পথভোলা পথিকের মত তিনি নানা পথ ঘুরে মাধুকরী সংগ্রহ করতে করতে খড়কুটোর মত এই দল্লী-রাজহারার পাহাড়ের ঠিকানায় এসে আটকে পড়েছিলেন। নতুন সূর্য গড়তে গিয়ে এই আজ রাজনন্দগাঁওয়ের আকাশে তিনি যেন অনেক বড় হয়ে সম্পূর্ণ আকাশটা ছেয়ে ফেলেছেন।

ছত্তিশগড়ের মানুষ আজও বিশ্বাস করে, কোন এক চাঁদনী রাতে ঘোড়ায় চড়ে এক বীরপুরুষ এসে তাদের এই অন্ধকূপ থেকে উদ্ধার করবে, মুক্তি দেবে।

ব্রিটিশরা ডাকাত আখ্যা দিলেও স্বাধীনতা যুদ্ধে এই মানুষটি এসেছিলেন বীর নারায়ণ সিং-এর রূপ ধরে, আর আজ তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছেন বাইগা শঙ্করলাল ঠাকুর। তাঁকেও প্রায় ডাকাত গালাগালিই শুনতে হয়েছে।

কিন্তু ছত্তিশগড়ের মানুষ উপলব্ধি করেছে, বাংলা, ভারতবর্ষকে শুধু যোগী-ঋষি সন্ত দিয়ে সন্তুষ্ট থাকেনি। তার সঙ্গে এই দেশে অন্য ধরনের মানুষ গড়ার কারিগরও পাঠিয়েছে। আজ দুর্ভাগ্য এ দেশের, এ সমাজের, তাদেরই সেই আপন মানুষটা আর তাদের শোভাযাত্রার সামনে এসে দাঁড়িয়ে হাঁকবেন না, "লুঠেরা কী রাজ নেহি, ছত্তিশগড় হামারা হ্যায়।"

ছত্তিশগড় মানে, এ অঞ্চলটা নাকি ছত্তিশটা দুর্গ দিয়ে ঘেরা আর সুরক্ষিত অঞ্চল ছিল রতনপুরের 750 সালের হাইহায়া রাজবংশে। দেশের মধ্যে থেকেও এই দেশ ছিল মূল ভূখণ্ড থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, শাপগ্রস্ত অহল্যার মত। ব্রিটিশরা প্রথম এখানে সভ্যতার আলো ফেলে এই অঞ্চলকে বানায় চোদ্দটা দেশীয় রাজার 'ইস্টার্ন স্টেট এজেন্সি', রায়পুর ছিল এর রাজধানী। এই সবই অভী শুনেছে নিয়োগীজীর কাছে।

ভিলাই এখানকার একমাত্র শিল্পনগর, ইস্পাত কারখানা, এ যা দিয়েছে, নিয়েছে তার থেকে অনেক গুণ বেশি। ছত্তিশগড়ের জমি, বনাঞ্চল, নদীর জল, মানুষের সস্তা শ্রম সমস্ত কিছু নিংড়ে নিয়ে ছড়িয়েছে পরিবেশের দূষণ, সংস্কৃতির দূষণ — গুণ্ডারাজ, মাফিয়ারাজ, জুয়া-মদের অবাধ রাজত্ব।

এই বিশাল দেশের তুলনায় কতটুকু এই ছত্তিশগড়!

তবু নিয়োগীজীর কাছে এই মাটি যেন ছিল জন্মভূমির মত। মহানদীর ওপরের বেসিনে ছত্তিশগড় প্রায় একশো মাইল চওড়া। এর উত্তরে রয়েছে ছোটনাগপুরের পাহাড়, পশ্চিমে মাইকালা পর্বতশ্রেণী, উত্তরপূর্বে রায়গড় পর্বতমালা, দক্ষিণপূর্বে রায়পুর আর দক্ষিণে বস্তারের মালভূমি অঞ্চল। এখানে এই বিশাল কুমারী মাটিতে বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মত অসংখ্য ছোট ছোট আদিবাসীদের গ্রাম, বনজঙ্গল, ফসলের মাঠ, অনেকগুলি ক্ষীণস্রোতা নদী আর চারটে বড় শহর — বিলাসপুর, রায়পুর, রায়গড়, দুরগ্।

নিয়োগীজী যেন এই কুমারী মাটির ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিয়ে গেলেন।

চারপাশে অনেক দূরে দূরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আদিবাসীদের গ্রাম, অনুর্বর জমির কৃষক ক্ষেতমজুরের গ্রাম। খরা-শুকায় হয়তো জলের দামে তারা জমি বিকিয়ে দিয়েছে বাইরের

মহাজন-ফড়েদের কাছে। তাই তারা পেটের দায়ে লোহা-পাথর খনির শ্রমিক।

তাদের একটা পা হয়তো এখনও জমিতে আটকে আছে। তাতে বছরে উত্তপ্ত পেটের শান্তি হয় না, তারপর আছে ভুখমারি। তাই তারা ঠিকাদারের হেফাজতে খাদানে কাজ করতে যায়। আর নিদারুণ দুর্দশার মধ্যে পড়ে অকালে প্রাণ হারায়! এখানকার লালমাটি শোনাবে ঐ সরল মানুষজনের জীবনের দুঃখের কাহিনী।

এইসব কথা ভেবেই এ মাটির সবুজ ও ফসলের সবুজ রঙ আর লোহার লাল রঙ দিয়ে শ্রমিক কৃষককে একত্রে বাঁধতে চেয়েছিলেন নিয়োগীজী। তাঁর সেই স্বপ্ন সফল হতে এখনও দূর অস্ত। কত শত বছরের সাধনার পর কত মানুষের আত্মদানে এই লড়াইয়ের ফয়সালা হবে তা কেউ জানে না। কিছু মানুষের লোভ আর হিংসার বিরুদ্ধে হয়তো অনন্তকাল চলতে থাকবে এই লড়াই।

কতদিন ধরে ছত্তিশগড় ধীরে ধীরে সৃষ্টি হয়েছে তার এই নিজস্ব প্রকৃতির ইতিহাস নিয়ে। আদিকালে প্রকৃতির কোন খেয়ালে একসময় এখানে হয়তো উদ্গীরণ হয়েছে পৃথিবীর অন্তরের আবেগ, এক অবিশ্রান্ত গলিত লাভার স্রোত। তা ঠাণ্ডা হতে কত শত বছর লেগেছে।

তারপর প্রকৃতি যখন ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হয়েছে তখন শুরু হয়েছে একে সাজিয়ে তোলার পালা। জল হাওয়া বাতাসকে সাক্ষী রেখে ফিরে এসেছে প্রাণের স্পন্দন, মাটির সবুজ। ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে এই প্রকৃতির জগৎ, প্রাণের জগৎ — জীব-জড়ের ইতিহাস। কত লক্ষ বছর ধরে প্রকৃতির আহ্নিক আর বার্ষিক গতির আবর্তনে বছর বছর নিরবচ্ছিন্নভাবে চক্রাবর্তে ঘুরে তৈরি করেছে আজকের এই ছত্তিশগড়, নিষাদের দেশের প্রাণের এই বিপুল বৈচিত্র্য।

আজ কিছু নিষ্ঠুর মানুষজনের দাপাদাপিতে তার আঁকাড়া প্রাকৃতিক রূপ নিঃশেষিত, এখন তা অবাধ লুণ্ঠন আর শিকারের ক্ষেত্র। মানুষ যেন তার আপন দর্পে এই প্রকৃতিকে ছেঁচে আর এক প্রকৃতি বানাতে চায়। তাই চতুর্দিকে তার অহম আর ঔদ্ধত্যের ছাপ স্পষ্ট।

আজ আর সেই কুমারী ছত্তিশগড়ে বনের পরীরা উড়ে এসে বসে না, আজ আর ঝর্ণার কলতানে পাখির গুঞ্জনে এর আকাশ-বাতাস মুখরিত হয় না। শুধু ভিলাই আর তার আশেপাশের কলকারখানায় শোনা যাবে পাহাড়ের বুক বিদীর্ণ করার বীভৎস আওয়াজ, যা শ্রমিকদের বধির করে তোলে। কারখানার ঘিঞ্জি বসতির নোংরা ময়লায় এ দেশের নির্মল বাতাস যেন ক্রমশ দূষিত কলুষিত হয়ে উঠছে। সভ্যতার কী অদ্ভুত দান!

একবার একটা হিসাব করে নিয়োগীজী দেখিয়েছিলেন, ভিলাই না তৈরি করে যদি ছত্তিশগড়ের মানুষদের কথা ভেবে ছোট ছোট কল-কারখানা গড়ে উঠত, তাহলে শুধু এ দেশের জলে যা ফসল হত তাতে ভিলাইয়ের থেকে তিন গুণ সম্পদ উৎপন্ন হত, সমস্ত মানুষের কষ্ট লাঘব হত।

হয়তো দেশের প্রয়োজনে, সভ্যতার প্রয়োজনে ইস্পাতের প্রয়োজনে ভিলাই চাই; কিন্তু তা বলে এ দেশের অসংখ্য মানুষকে এইভাবে কষ্ট দিয়ে! তারা তাদের জন্মের অধিকার

নির্মল বাতাস, মুখের জলটুকুও পাবে না!

অভীর ভাবনার তাল কেটে যায়। একজন রোগী অসুস্থ, হাসপাতালের ডাক এসেছে।

সে উঠে গায়ে জামা গলায়। একটি ছেলের মুখ থেকে একটা লম্বা কৃমি বেরিয়েছে। ঘর থেকে বেরুবার সময় পরসাদী বাঈর সঙ্গে দেখা। সে হাসিমুখে জানায় তার ভাতিজাকে নিয়ে এসেছে ডাক্তারসাবকে দেখাবে বলে। তাকে সঙ্গে নিয়েই অভী হাসপাতালে হাঁটে। যাবার পথে সে নানা কথা বলে যায়, রোগের কথা, সম্মেলনের কথা, অভী কেন সেখানে গেল না এই কথা, তাদের কাজ করতে কোথায় অসুবিধা হচ্ছে — এসব কথা। কিন্তু অভী এসব কথায় হুঁ, হ্যাঁ উত্তর ছাড়া আর কোন মনোযোগ দেয়নি।

সে ভেবে চলেছে অন্য কথা। যখন এখানে হাসপাতাল ছিল না তখন এখানকার মানুষরা কী করত! অধিকাংশই রোগে ভুগত, গাঁয়ের ওঝা-গুনিনদের ঝাড়ফুঁক নিত, তবু যারা নিজেদের ক্ষমতায় বেঁচে যেত তারা টিকে থাকত আর অন্যরা রোগে ভুগে বা পথ্যের অভাবে মারা যেত। আর যাদের সামর্থ্য থাকত তারা হয়তো এদিক ওদিক যেত। এখন হাতের কাছে হাসপাতাল, প্রতিদিন যেন এদের চাহিদা বাড়ছে। নিত্য নতুন রোগী, সমস্যাও নতুন নতুন — এটাই স্বাভাবিক।

কিন্তু মানুষগুলো বড় ভাল, সহজ-সরল। কতদিনের চাহিদা ছিল এখানে একটা হাসপাতালের। এই গরিব মানুষদের মুখে কথা ফোটে না। এখন এখানে হাসপাতাল হবার পর ভিলাই কর্তৃপক্ষের টনক নড়েছে। তাদেরও এখানে এবার হাসপাতাল, স্কুল, বিদ্যুৎ এইসব ব্যবস্থা করা দরকার। নইলে তাদের শোষণের ব্যবস্থাটা টিকিয়ে রাখতে পারবে না। তাহলে নিয়োগীজীর কথাই সত্যি। চাপের কাছে সবাই সোজা হয়!

হাসপাতাল থেকে ফিরে এসে অভী ঘরেই ছিল। হঠাৎ তার আনমনা গুন্‌গুন্ গানের তাল কেটে দিয়ে, প্রায় ছুটতে ছুটতে এসে ধানিরাম হাঁপাতে হাঁপাতে খবর দেয়, সম্মেলন চলতে চলতে একজন মহিলা কমরেড খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছে, এক্ষুনি অভীকে যেতে হবে।

প্রায় জোর করে নিজেকে একটা কাজে মন দিতে বাধ্য করেছিল অভী, তাই একটু বিরক্তও হয়। মুখ তুলে সে ধানিরামের দিকে তাকায়, বুঝতে পারে এ ব্যাপারে কমরেডের কিছু করার নেই, সে কিছুই জানে না।

আসলে সামনাসামনি যে আসে ক্ষোভের প্রথম ধাক্কাটা তাকেই সামলাতে হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে অভী চট করে বুঝে ফেলে এই কমরেড এখানে শুধু সংবাদ-বাহক। হয়তো সে আশেপাশে কোথাও কাজ করছিল, তাই হাতের কাছে পেয়ে তাকে দিয়েই খবরটা তারা

পাঠিয়েছে। লাল ময়দান থেকে শহীদ হাসপাতাল ঢিলছোঁড়া দূরত্ব।

অভী ইঙ্গিতে জানিয়ে দেয় সে যাচ্ছে, তা শুনে আশ্বস্ত হয়ে ধানিরাম চলে যায়। সুতরাং এখন সব কাজ পণ্ড। এইবার এলোমেলো কাগজগুলো গুছিয়ে ফাইলটা অভী বাঁধতে শুরু করে। নিজের মনেই বলে ওঠে, এ কাজ আর হল না।

এই অঞ্চলে কী কী ধরনের রোগ হয় তার একটা হিসাব তৈরি করার কথা সে বহুদিন ধরে ভাবছে। তাই নিয়ে সে আজ বসেছিল। কাজটা যতখানি সহজ সে ভাবছিল অত সহজে হবে না, এখন সে বুঝতে পারছে। এই নিয়ে কাজ করার জন্য যখনই বসেছে তখনই মনের মধ্যে কেমন যেন একটা বাধা তৈরি হয়েছে। যেমন এখন মনে হচ্ছিল তার আগের ভাবনা পরিবর্তন করতে হবে। ফলে নিজের ওপরেই সে বিরক্ত হয়।

এমন হলে এর দ্বারা কোন বিজ্ঞান তৈরি করা যাবে! কখনো না, ওসব শিল্প-সাহিত্যে চলে — সত্য তাই যা রচিবে তুমি। কিন্তু বিষয়টাকে বিশ্বাসযোগ্য মানে বিজ্ঞানসম্মত করতে হলে অনেক খাটতে হবে। এ ব্যাপারে এখানে কোন কাজ হয়নি।

শুধু রক্তাল্পতা নিয়েই একটা চমৎকার কাজ হতে পারে। কিন্তু এই কাজের জন্য অখণ্ড মনোযোগ চাই। সেই বুদ্ধদেবের সিদ্ধিলাভের সাধনার মত। বাবা বলত, কানের কাছে হাজার ঢাক বাজলেও কানে তা প্রবেশ করবে না। কী ভাবে সে এর ব্যবস্থা করবে?

কল্পনায় মোর্চার হলঘরটা তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। নারী জাতি যেন সেখানে জেগে উঠেছে। তাই সেখানে ব্যস্ত মানুষজনের চলাফেরা। অনেকদিন পর বড় সংসারের হাল ধরার একটা কাজ পেয়ে ওরা যেন নিজেদের নেশার ঘোরে ঘুরপাক খাচ্ছে। তা হোক, মনের অন্দরে নিজের ছোট সংসারে ঘোমটা টানা মুখ আজ বাইরে বেরিয়ে এসে বড় সংসার আলো করে দিক।

অভী আবার আপন কাজের ভাবনায় ফিরে আসে, আসল সমস্যাটা হচ্ছে পদ্ধতিতন্ত্রের। লাইনটা ঠিকমত ধরতে না পারলে বাবা তুমি যতই হাতড়াও তা ঐ খ্যাপার পরশপাথর খোঁজার মত অবস্থা হবে। আবার মাঝে মাঝে মনে হয় সমস্যাটা জ্ঞানতত্ত্বের নয়তো। কোন্ সত্য সে খুঁজতে চায়?

তাছাড়া আরও সমস্যা হল, যত দিন যাচ্ছে অভী উপলব্ধি করছে, চিকিৎসার সঙ্গে শুধু বিজ্ঞান নেই শিল্পও আছে। ঐজন্য এক একজন চিকিৎসকের এত নাম-ডাক হয়। শুধু বিজ্ঞান দিয়ে বোধহয় চিকিৎসা করা যায় না। বিজ্ঞান তো লাগবেই, প্রতিমুহূর্তে লাগবে; কিন্তু কাজ যে করতে হবে পীড়িত মানুষের জন্য। সেই মানুষকে জানা গেছে কতটুকু!

কিন্তু চিকিৎসা করতে চেয়ে চিকিৎসক তার জীবনশিল্পটাকে বিজ্ঞানের সঙ্গে মিশিয়ে দেবেন, এটা বোধহয় সব থেকে কঠিন কাজ। চিকিৎসার বিজ্ঞান যুগ যুগ ধরে স্থায়ী হয় স্থিতি পায়; কিন্তু চিকিৎসক মারা যাবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চিকিৎসা করার শিল্পটা চলে যায়। তখন সমগ্র মানুষটিই যেন একটি নিটোল তত্ত্ব হয়ে দাঁড়ান। আবার তথ্য যেন 'আমাকে দেখো', 'আমার দিকে তাকাও' বলতে বলতে এগিয়ে যায়।

একটা ছোট, হতকুচ্ছিত অথচ খাঁটি তথ্য, কোন ভুবনমোহন তত্ত্বকে এক লহমায় খতম করে দিতে পারে। সুতরাং তথ্য আর তত্ত্বের এই যে ভয়ঙ্কর টানাপোড়েনের ব্যাপার তা কী কোনদিন মানুষ সমাধান করতে সক্ষম হবে?

হাসপাতাল ছাড়া অন্য কোথাও গিয়ে রোগী দেখার ব্যাপারে অভীর ভারী আপত্তি। তাই যখন অন্যত্র থেকে কোন রোগী দেখার ডাক আসে সে সরাসরি জানিয়ে দেয়, রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে আসতে হবে। এতে যে সবাই খুশি হয় এমন নিশ্চয়ই নয়। অনেকেই আশা করে, একবার ডাক্তারসাব এসে নিজের চোখে দেখে যাক রোগীর অসুস্থতা কতখানি গভীর। তারপর কোন ব্যবস্থার কথা ভাবা যাবে।

কিন্তু এটাতেই অভীর আপত্তি, সে রোগীকে নিয়ে যে ভানুমতীর খেলা দেখাবে তা এই হাসপাতালের চৌহদ্দির মধ্যে। সে তো আর হাসপাতালকে রোগীর কাছে তুলে নিয়ে যেতে পারবে না। তখন এই দুটো হাত সম্বল করে সে রোগীর কাছে গিয়ে শুধু দাঁড়িয়ে থেকে কী করবে?

অনেক সময় সে দেখেছে, রোগীর জন্য অনেক জরুরি কাজ করার রয়েছে। সেই কাজ হাসপাতালে এনেই তাকে করতে হবে, আর তখন এই যাতায়াতের মধ্যে অনর্থক অনেকটা মূল্যবান সময় নষ্ট হয়ে যাবে। তাছাড়া সে দেখেছে, অনেক সময় রোগীকে শেষ সময়ে পাওয়া যায়। তখন কিছু করার থাকলেও চিকিৎসকদের হাত কামড়ানো ছাড়া উপায় থাকে না!

এই তো কয়েকদিন আগে একটা সাপে কাটা রোগীর এমন হাল হল। ঝাড়ফুঁক, ওঝা — এই করতে করতে সব শেষ! এই নিয়ে কর্মীদের মধ্যে কত আলোচনা, কত মিটিং হয়েছে; কিন্তু অভ্যেস বদলানো যায়নি।

এক্ষেত্রে অবশ্য ব্যাপারটা একটু আলাদা। বাইরের একজন প্রতিনিধি তাও আবার মহিলা প্রতিনিধি, তার কী অসুস্থতা কে জানে? তেমন কিছু হলে বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া ছাড়া কোন রাস্তা নেই। কারণ এখন কাটাছেঁড়া করতে হলে অজ্ঞান করার ডাক্তার কোথাও পাওয়া যাবে না। পাশের মিশনারিদের পুষ্পা হাসপাতালের একজনকে দিয়ে এই কাজটা অভীরা চালিয়ে নেয়।

এইসব সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে সে গায়ে জামাটা গলায়। চশমা পরে, যন্ত্রপাতি নেয়, হাতে ঘড়ি পরে, পকেটে কলম গোঁজে, লেখার প্যাড নেয়, দরজায় তালা লাগায় এবং সবশেষে পা বাড়ায়।

আবার এ কথাও তার মনে হয়, এরাও তো অসহায়, এরাই বা কী করবে! সম্মেলনে এত মানুষ আসছে বাইরে থেকে। তিনদিন ধরে তারা সম্মেলন করছে, কারো কোন অসুস্থতা

হতেই পারে। তখন সম্মেলনের কাজ করবে, না তারা রোগীর সেবা শুশ্রূষা করবে।

মোর্চার হলঘরে তখন বেশ ব্যস্ততা পড়ে গেছে। অন্যদিকে নিয়োগীজীর মৃত্যুকে ঘিরে নারী মোর্চার সারা ভারতে আন্দোলন গড়ে তোলার কর্মসূচি গ্রহণ করা হচ্ছে। হাততালির মধ্যে তার ঘোষণাও শোনা যাচ্ছে।

অভীকে দেখে কমরেডদের একটা অংশ তাকে ঘিরে ধরে। এতগুলি মহিলা পরিবেষ্টিত হয়ে একটু কষ্ট আর অস্বস্তির মধ্যে শুধু মুখটা ঝুঁকিয়ে অভী প্রথমে রোগীকে দেখে দূর থেকে তার রোগটিকে বুঝে ফেলার চেষ্টা করে। কিন্তু রোগীর মুখ দেখেই তাঁর মাথায় প্রায় বজ্রাঘাত পড়ার উপক্রম হয়।

একজনের কোলে মাথা রেখে সোমা শুয়ে আছে, তার প্রবল শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। সোমাও তাকে দেখেছে; কিন্তু চিনতে পেরেছে কিনা অভী বুঝতে পারে না। তবু অভী অল্পক্ষণ ভেবে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয়, তাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে, অক্সিজেন দেওয়া জরুরি। এই কথাটা সে নিয়োগীজীর স্ত্রী আশোজীকে বুঝিয়ে বলে, অন্যদের আশ্বস্ত করে।

অভী এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে তার ব্রিগেড তৈরি হয়ে যায়, স্ট্রেচার সে আগেই আনিয়ে রেখেছিল।

হাসপাতালে কর্মীরা কেউ অসুস্থ হলে তাদের থাকার জন্য একটি কেবিন আছে, সেখানে অভী সোমাকে রাখে, চিকিৎসা শুরু হয়।

সে একটু উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে তা তার চোখেমুখে ঘাম জমা দেখে যে কেউ বুঝতে পারবে। যদিও সব ধরনের রোগীই সে এখানে চিকিৎসা করে থাকে, তবু সোমার এই জরুরি অবস্থায় চিকিৎসা করতে গিয়ে শুরুতে তার দ্বিধা কাটতে চায় না। শুধু ঘটনার আকস্মিকতায় তার মাথা থেকে আর সব ভাবনাচিন্তা সেই সময়ের জন্য যেন উধাও হয়ে যায়। শুধু মাথায় ঘোরে আর কী করা দরকার, আর কী বাদ পড়ে গেল, আর কী করলে সোমার কষ্ট দ্রুত লাঘব হবে।

ক্রমশ সময়ের সঙ্গে তাল রেখে সোমার কষ্ট কমতে থাকে। সে হাঁপরের মত শ্বাস টানে বটে; কিন্তু বোঝা যায় শুরুর কষ্টটা তার কিছুটা কমেছে।

এই ধরনের জরুরি সময়টুকতে অখণ্ড মনোযোগে কাজ করার অভ্যাস প্রায় সব চিকিৎসকেরই থাকে, এটা অভীর ক্ষেত্রেও নতুন কিছু নয়। তাছাড়া এখানকার হাসপাতালের কর্মীরা অভীকে এতদিন ধরে দেখছে, তারা তাকে জানে চেনে। অনেকে এরা অভীদের হাতেই তৈরি, তাই কাজের জন্য অভীর যা দরকার, তাই সে তৎক্ষণাৎ পায়।

এইরকম কাজের পরিবেশটুকুতেই অভীর তৃপ্তি। এ তার অহঙ্কারও। কারণ সে সোমার কমরেডদের বোঝাতে পারছে, এমন পরিবেশে শহীদ হাসপাতালে তারা কাজ করে। এ

পরিবেশ তারাই অনেক সংঘর্ষের পর নির্মাণ করেছে।

তাছাড়া অভী সচেতন যে সে একজন বাইরের কমরেডের চিকিৎসা করছে। এর মধ্যে এখানকার মান-মর্যাদার প্রশ্নও জড়িত। কাজ ভাল হলে এর নাম প্রতিনিধিদের মুখে মুখে চতুর্দিকে সাগরের ঢেউয়ের মতো ছড়িয়ে পড়বে।

অভীর আচরণে কর্মীরা, আশেপাশের অন্যরা বুঝতে পারে, এই রোগিণী অভীর পূর্বপরিচিত; তাই তারা আশ্বস্তও হয়। ফলে অভী আশ্বাস দিতেই প্রায় সবাই সম্মেলনে ফিরে যায়। অভী তাদের কাছে এমন একটা ভাব দেখায় যে এটা আমার দায়িত্ব আপনারা নিশ্চিন্তে আপনাদের কাজ করুন। আপনারা সম্মেলনের কাজের জন্য এখানে এসেছেন, সুতরাং এই ব্যাপারে অযথা সময় নষ্ট করবেন না।

বাইরে তখন সময় তীরের মত বয়ে গেছে। কখন সন্ধ্যে নেমেছে। জীবজগৎ যেন ধীরে রাত্রির প্রস্তুতি নিচ্ছে। ঘন অন্ধকারের মাঝে চারপাশে ছোট ছোট আলোকবিন্দুগুলি রাত্রির আগমনবার্তা জানিয়ে দিচ্ছে। চারিদিকে প্রাণের কোলাহল-কলরব শান্ত হয়ে এসেছে। এবার আপাতত অভী ঘরে ফিরতে পারে। তবু ঘরে ফেরার আগে সোমাকে একবার অন্তত দেখে যাওয়া দরকার।

ইতস্তত পায়ে সে কেবিনে ঢোকে, সোমার কাছাকাছি আসে। সোমা তখনও পেছনে হেলান দিয়ে দেহটাকে মেলে ধরে শ্বাস টানার প্রবল চেষ্টা করে চলেছে। ওর কষ্ট দেখে অভীর খারাপ লাগে।

নিশ্চল, নিশ্চুপ হয়ে কিছুক্ষণ তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকে। আপন মনেই ভাবে, শাস্ত্রে একেই নাকি বলে, প্রাচুর্যের মধ্যে দারিদ্র্য। বাইরে এত অকৃপণ বাতাস সবাই অনায়াসে টানছে; কিন্তু সোমার ভাগে তাও জুটছে না। এ যেন সেই সমুদ্রের বুকে তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাওয়ার মত। চতুর্দিকে জল অথচ এক ফোঁটা তৃষা হরানোর জল কোথাও নেই।

শ্বাসকষ্ট যে কী কষ্ট তা যার না হয়েছে তাকে বোঝানো যায় না। মানুষ সারাদিনে কত হাজারবার শ্বাস নেয়, ঠিক তত হাজারবার তার কষ্ট হয়।

এখন সোমাকে অনেক কষ্ট করে, জোর করে বাইরের বাতাস বুকের হাঁপরে টানতে হচ্ছে। আর তা করতে গিয়ে ওর অবস্থা কাহিল হয়ে পড়ছে। কেননা বার বারই ওর আশঙ্কা হচ্ছে, যদি আর শ্বাস না নিতে পারি, যদি এইভাবে শ্বাস বন্ধ হয়ে যায়!

সোমার শিরায় লাগানো নল পরীক্ষা করতে করতেই হঠাৎ অভীর মনে হয়, কত মানুষ তো প্রতিদিন এমন কষ্ট পায়, তাদের সবাইকে দেখে কী অভীর এমন ছটফটানি হয়!

না, তা হয় না। এখানে সোমা অতি পরিচিত ঘনিষ্ঠজন বলেই তার বোধহয় এমনটি হচ্ছে। এটা সূর্যের আলোর মত পরিষ্কার আর রাতের অন্ধকারের মত সত্য।

ডাক্তার হলেও সেও তো মানুষ, সুতরাং সে সবার জন্য এতখানি দরদী মরমী হবে কী করে? শুধু অসুস্থতার জন্য সারাদিন যে পরিমাণ মানুষের দুঃখকষ্ট ডাক্তারকে দেখতে হয়

তাতে সবার জন্য দরদী হতে হলে তার ব্যক্তিগত জীবন বলে কিছু থাকে না।

তাহলে ডাক্তাররা যখন রোগীকে দেখান যে তিনি রোগীর পীড়নের জন্য অনেক কষ্ট পাচ্ছেন, তখন তাহলে তিনি নিশ্চয়ই ভান করেন।

সেই মুহূর্তে একজন সহকর্মী কিছু বলায় অভীর ভাবনার তাল কেটে যায়। তার রোগীর জন্য সমস্ত ব্যবস্থাটি বুঝে ফেলার জন্য একবার সে চারপাশে চোখ বুলিয়ে নেয়।

না, ডাক্তারদের কষ্টের বহিঃপ্রকাশের সবটা নিশ্চয়ই ভান নয়, একটা তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া তার নিশ্চয়ই হয়। তারপর আর সেটার রেশ হয়তো থাকে না।

অনেক সময় রোগীর অত্যধিক চাপে এইসব অনুভূতি মনে রাখার অবস্থা হয়তো চিকিৎসকের থাকে না। তবে রোগীর দুঃখকষ্ট লাঘব করার জন্য ডাক্তার তার জ্ঞান-অভিজ্ঞতা দিয়ে একটা যুক্তিবুদ্ধি খাটায়। তখন মায়া-মমতাটা চিকিৎসাবিজ্ঞানের ঘরে ঢুকে পথ হাতড়ায়, দ্রুত একটা সমাধানের পথ খোঁজে।

অভীর একথা স্বীকার করতে লজ্জা নেই, সোমার ব্যাপারে চিকিৎসাশাস্ত্র ছাড়াও অতিরিক্ত কিছু আগ্রহ তার মনে কাজ করছে। এ ব্যাপারে কে কী ভাবছে তা নিয়ে অভীর বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই।

হঠাৎ অভীর মনে পড়ে, একদিনের একটা ঘটনার কথা। এখানে আকুপাংচার করেন যে ভদ্রলোক তার সঙ্গে একটি রোগীকে নিয়ে কথা হচ্ছে। ভদ্রলোক, রোগীর বাম হাঁটুতে হাত দিয়ে বললেন, এখানে ওর প্রচণ্ড ব্যথা।

অভীর হঠাৎ একটু দুষ্টুমি করার ইচ্ছা হল, আপনি কী করে জানলেন? খুব স্বাভাবিকভাবে ভদ্রলোক উত্তর দিলেন, প্রথমত ও বলছে, তাছাড়া এই ধরনের বাতে এইরকমই ব্যথা হয়। অভী তার দিকে তাকিয়ে বলল, আপনার কখনো হয়েছে, ওর ব্যথা আপনি বুঝবেন কী করে? ভদ্রলোক হেসে মাথা চুলকে বললেন, সবাই বলে। অভীও হাসে, সবাই বলে এইজন্য আপনিও বলছেন, এই তো!

ভদ্রলোক আর কোন উত্তর না করে হাঁ করে কিছুক্ষণ অভীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। অভী হেসে তার পিঠ চাপড়ে বলে, আসল কথাটা হল একের ব্যথা অন্যে বুঝবে কী করে? আমরা অনুমান করে নিই, সহমর্মী হয়ে তাকে বিশ্বাস করি।

আস্তে আস্তে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত সোমা চোখ তুলে তাকায়, একবার অভীকে তাকিয়ে দেখে। সে কী কিছু বলতে চায়, কোন কষ্টের কথা!

অভী তার মুখটা আরও একটু কাছে নিয়ে জিজ্ঞাসা করে, "কিছু বলবে? কোথাও খবর দিতে হবে? এখন একটু ভাল লাগছে?" সোমা মাথা নাড়ে। অভী চশমাটা নাকের কাছে তুলে কিছুটা ইতস্তত করে বলে, "আর একটা কাজ বাকি আছে। তোমার কষ্টটা আরও একটু কমলে বুকের একটা ছবি করতে হবে। তোমাকে আর একটু ধকল সইতে হবে, আমি সব ব্যবস্থা করে ফেলেছি।"

সোমা মাথা নেড়ে চোখ বন্ধ করে। অভীর সব দেখেশুনে মনে হয় তার এই ব্যবস্থার মধ্যে সোমাকে সে আশ্বস্ত করতে পেরেছে। এই কারণে তার কিছুটা হালকা বোধ হয়। বুক থেকে একটা ভার বোধ যেন কিছুটা নেমে গিয়ে এক দমকা শীতল হাওয়া বুক জুড়িয়ে দেয়।

তখন সে তার সহকর্মীদের আরও দু'একটা জরুরি কাজের কথা বুঝিয়ে দিয়ে ধীর পায়ে বাইরে বেরিয়ে আসে।

এদিকে বাইরে কয়েকজন তাদের রোগীর খবর জানার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল। ডাক্তারসাবকে হাতের কাছে পেয়ে তারা ঘিরে ধরে।

অভী কোন অজ্ঞাত কারণে এখন অনেক স্থির। ধীরগলায় সে তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে কথা বলে। তাদের প্রত্যেকের রোগীর ভূত-ভবিষ্যৎ জানিয়ে দেয়। সবাই একসঙ্গে কথা বলতে গিয়েও অভীর কাছে তিরস্কৃত হয় না। সকলে একটু অবাক হয়, সারাদিনের শেষে এই সময়ে এত নরম মেজাজ তো মানুষটির দেখা যায় না!

কিন্তু আশেপাশের অতিপরিচিতরাও এ বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করতে সাহস করে না। শুধু মণিরাম ড্রাইভার এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করে, রোগীকে বাইরে পাঠানোর দরকার হবে কিনা, নইলে সে বাড়ি চলে যাবে। অভী তাকেও আশ্বস্ত করে। সে সদ্য বিয়ে করেছে। একটা অর্থপূর্ণ হাসি হেসে অভী তাকে বিদায় দেয়, "জলদি যাও, বাঈ একেলী ঘরমে!"

ফিরবার পথে চত্বরে কয়েকজন কর্মী তাকে ঘিরে ধরে। হাসপাতালের নোংরা আবর্জনাগুলোর ব্যবস্থা করা দরকার। এটা বহুদিনের একটা বকেয়া কাজ।

মানুষজনের অভ্যাস এখনও তারা শোধরাতে পারেনি। এরা যত্রতত্র নোংরা ফেলে, খাবারের উচ্ছিষ্ট ফেলে। ফলে এখন কুকুর বিড়ালের থেকেও বেশি উপদ্রব তৈরি করেছে ধেড়ে ইঁদুরগুলো। এমনকি তারা অবাধে হাসপাতালের ভেতরে যাচ্ছে। প্রকৃতি তো আর চুপচাপ বসে থাকবে না।

এ ব্যাপারে অভী কর্মীদের সঙ্গে মিটিং করেছে। এক্ষুনি একটা ব্যবস্থা করতে হবে হাসপাতালের পিছনের দিকে। তারই একটা পরিকল্পনা এরা করে এনেছে। ঐসব কাগজগুলো তারা একে একে অভীর চোখের সামনে মেলে ধরে। অভী দাঁড়িয়ে তাতে মনোযোগ দেয়, কিছুক্ষণ সেসব দেখে। তারপর কাগজগুলো পকেটে পুরে ইশারায় জানিয়ে দেয় এসব কাল হবে। আজ আর তার মাথা কাজ করছে না।

তবু ঘরে ফিরে, জল খেয়ে অভী স্বস্তি পায় না। একবার মনে হয়, সব কিছু ঠিকঠাক করা হয়েছে তো! ভেতর থেকে তেমন আশ্বাস পেলেও তার ভেতরটা যেন কেমন আনচান করে।

এতক্ষণ বাইরে যে স্থির ভাবটা ছিল তা থেকে অভী উপলব্ধি করতে পারেনি, ভেতরে সে

এমনভাবে আলোড়িত হয়ে চলেছিল।

এখন ঐ অস্থিরতা যেন ঘরে তাকে একা পাওয়ার সুযোগ নিয়ে বাইরে ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

এর মধ্যে কত জন কত কাজে এসেছে, অভী অন্যমনস্ক হয়ে ইতস্তত পায়চারি করতে করতে তাদের কাজ করেছে, কথার উত্তর দিয়েছে বা হয়তো দেয়নি, জল খেয়েছে, সিগারেট খেয়েছে।

যারা তাকে চেনে, তারা বুঝেছে ডাক্তারসাব যে কোন কারণে হোক এখন চঞ্চল, হয়তো কোন খারাপ খবর এসেছে। এখন এখানে খারাপ সময়। আর অভী তো এখানে শুধু ডাক্তার বা সার্জেন নয়, সে তাদের কমরেড। সে এখানকার মানুষদের ঘনিষ্ঠজন।

কিন্তু তার এখনকার এই কথাগুলির মধ্যেই সকলে বুঝতে পারে এর মধ্যে অন্যমনস্কতা আছে, যান্ত্রিকতা আছে, চঞ্চলতা আছে। তাই তার কাছে যে যা ব্যবহার আশা করে এসেছিল তা না পেয়েও তারা সবাই সন্তুষ্ট হয়ে চলে গেছে। ফিরে যাবার সময় মন্তব্য করেছে, "বহুত থক গয়ে হোঙ্গে।"

তারা অনেকে জানে, চা অভীদের অত্যন্ত প্রিয় বস্তু, তাই কেউ হয়তো এগিয়ে এসে বলেছে, "চায়ে বনাবে।" তাতেও অভী হাত নেড়েছে, এখন চায়েও তার রুচি নেই। তখন তারা হয়তো ভেবেছে, মানুষটাকে একলা থাকতে দেওয়াই ভাল।

শুধু এরই মধ্যে সোমার বন্ধুদের কয়েকজন দু'বার ডাক্তারসাবের কাছে এসে খোঁজ নিয়ে গেছে — তাদের কমরেড কেমন আছে, তাকে বাইরে পাঠাতে হবে কিনা, আর কিছু করতে হবে কিনা? ওকে নিয়ে তারা অনেক দুশ্চিন্তার মধ্যে পড়েছে।

মুখে তাদের আশ্বস্ত করলেও, অভীর ভেতরটায় টেনসনের আনচান করার অভিজ্ঞতাটা যেন আবার শুরু হয়েছে —। সোমার যদি গুরুতর কিছু হয়ে থাকে, যদি সে এই অবস্থাটা ঠেকাতে না পারে!

এরই মধ্যে একবার ফাগুরাম তাকে ডাকতে এসেছে। কারণ মোর্চার অফিস তখন জমজমাট, বাইরের প্রতিনিধিদের কাছে তারা গান-বাজনা করবে, এই সময় ডাক্তারসাবকে তাদের চাই। এই গৌরব প্রদর্শনের সময়টিতে তাদের প্রিয় কমরেড না থাকলে কী করে চলে। কিন্তু জরুরি কাজের অজুহাতে অভী ফাগুরামকে ফিরিয়ে দিয়েছে। ইচ্ছে হলেও আর সে সোমাকে দেখতে যায়নি। কোন খবরের জন্য কান পেতে রয়েছে।

এর মাঝে সোমার এক্স-রে হয়েছে। অভী আরও হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে, এক্স-রে তে কোন দোষ নেই।

কিন্তু এক অনর্গল ভাবনা যেন অভীকে এই সময়ে তন্ময় করে রাখে।

সে কী এখন সোমার মুখোমুখি হতে কুণ্ঠাবোধ করছে। তাহলে সে এত চঞ্চলই বা কেন! এতদিন পর দেখা, সে বুঝে উঠতে পারছে না, সোমা তাকে কেমনভাবে গ্রহণ করবে!

কিন্তু তাতে এত ভাবনার কী আছে! সে চিকিৎসক, এখানে চিকিৎসকের দায়িত্ব-কর্তব্য সে তার ক্ষমতামত পালন করার চেষ্টা করেছে। সেই ভাল, সে আর কিছু ভেবে নিজেকে বিব্রত করবে না।

কিন্তু কেমন হঠাৎ করে একটা অভাবনীয় কাণ্ড ঘটে গেল, এই ভর সন্ধ্যেবেলায়। এমন অবস্থা যা সে কখনো কল্পনাতেও আনতে পারেনি। ব্যাপারটা এখনও সে ঠিকমত হৃদয়ঙ্গম করতে পারছে না। তাহলে এমনও কিছু ঘটতে পারে! পৃথিবীটা সত্যিই কত ছোট, আর কী অদ্ভুত যোগাযোগ! এই জীবনে কোনদিন সোমার সঙ্গে দেখা হবে কিনা — অভী জানতো না। কেমন অদ্ভুতভাবে দেখা হয়ে গেল!

সম্পর্কটা ছিন্ন হবার পর অভী সোমার আর কোন খবর রাখেনি।

সে শুনেছিল সোমা এখন শিলিগুড়িতে নেই, তার অফিস থেকে কোথাও ট্রেনিং নিতে পাঠিয়েছে। যাই হোক, এসব শোনার পর বাস্তবিক সে আর কোন আগ্রহ দেখায়নি। কারণ তখন অভী নিজের নেশার ঘোরে ঘুরপাক খেয়ে চলেছে, নিজের জীবনে সে নানা বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে ছুটে চলেছে।

তবু কখনো হয়তো জীবনটাকে নিয়ে ভাবার অবকাশ পেলে হঠাৎ হঠাৎ দু'একবার সোমার কথা মনে হয়েছে, এমনি কোন কারণ ছাড়াই, ব্যস ঐ পর্যন্ত। এর কোন স্থায়ী রেশ ছিল না। সোমা কী করছে, কোথায় আছে, একথা ভাবার আবশ্যকও তার কখনো হয়নি।

আজ আকস্মিকভাবে সে এই অবস্থার সম্মুখীন। সোমা একেবারে সশরীরে তার সামনে হাজির হয়েছে। অভীর হাসি পায়, মা'রা যেমন বলে, ঠাকুরের লীলা তাই দেখা করিয়ে দিলেন।

হয়তো সোমারও এমন মনের অবস্থা। অসুস্থতার ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে তার আর কিছু প্রকাশ করার মত সুযোগ নেই।

অভী আরও আশ্চর্য হয়, এই দু'দিন সে মোর্চা অফিসে হাঁটেনি!

তাদের যেসব কাজের দায়িত্ব ছিল অভীর ওপর, তা সব সে করে দিয়েছে। কিন্তু একবারের জন্যেও যাবার কথা তার মনে হয়নি।

অথচ সে জানত, দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এখানে মহিলা প্রতিনিধিরা আসছেন। এর মধ্যে অনেক বিশেষ মহিলা আছেন। এই নির্জন দ্বীপে, ঐসব নারীদের, বিশেষত বুদ্ধিজীবী নারীদের সঙ্গ পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা অভীর মনের মধ্যে কোন আকর্ষণ জাগায়নি! অভী কী এতটাই পাল্টে গেছে!

ওখানে গেলেই সোমার সঙ্গে দেখা হয়ে যেত। সে ব্যাপারটা আবার হত অন্যরকম।

কত কথা তার মনের মধ্যে উঁকি দিয়ে যায়। স্মৃতির পটে আঁকা ছবিগুলি যেন পর পর ভেসে আসে শরতের মেঘের মত। একে একে তারা যেন শোভাযাত্রার মত এসে দাঁড়িয়ে পড়ে, আবার চলে যায়।

পুকুর পাড়ের নোয়ানো বাঁশগাছ থেকে শুকনো পাতা পড়ে তা কখনো দ্রুত বাতাসের ঢেউয়ে সরে যায়, আবার ফিরে আসে।

অভী চেষ্টা করেও এসবকে মন থেকে সরাতে পারে না —।

এর কোনটা আনন্দের, কোনটা দুঃখের, কোনটা বেদনার, কোনটা বিস্ময়ের, কোনটা বিহ্বলতার, কোনটা বিরক্তির, কোনটা পালানোর, কোনটা লড়াইয়ের, কোনটা জয়ের, কোনটা পরাজয়ের, কোনটা দুশ্চিন্তার, কোনটা বিষণ্ণতার, কোনটা ভয়ের, কোনটা গৌরবের, কোনটা অপমানের, কোনটা অভিমানের, কোনটা মরমে মরে যাওয়ার, কোনটা চূড়ান্ত বোকামির, কোনটা চূড়ান্ত দায়িত্বজ্ঞানহীনতার, কোনটা কৌতুকের, কোনটা সব পেয়ে যাওয়ার, কোনটা সব হারিয়ে যাওয়ার, কোনটা তিরস্কারের, কোনটা মাধুর্যের, কোনটা সংকটের, কোনটা একাত্মবোধের, কোনটা একান্ত গোপনীয়তার, কোনটা প্রকাশ্যের, কোনটা দুহাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ওঠা কান্নার, কোনটা নিষ্ঠুরতার — এমনই আরও কত কী।

আশ্চর্য হয় অভী, এত বছর পরেও তার এত কিছু অবশিষ্ট আছে, কিছুই হারিয়ে যায়নি! সব যেন অদ্ভুতভাবে জ্বলজ্বল করে চোখের সামনে ভেসে উঠছে। মনে হচ্ছে এই তো সেদিনের কথা!

নারীর এক মোহিনী রূপ আছে যাকে অস্বীকার করা বোধহয় অসম্ভব, অভীর অভিজ্ঞতাও তাই।

নিশ্চয়ই কেউ কেউ তা চোখের সামনে দেখেও সংযমী হয়ে থাকতে পারেন। হয়তো অনেকেই পারেন; কিন্তু অভী সেই ব্যতিক্রমী মানুষ হতে পারেনি। পারলে হয়তো তার জীবনপ্রবাহ অন্য কোন খাতে বয়ে যেত।

এ ব্যাপারে নিজেকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে সে অনেক কিছু ভেবেছে; কিন্তু শেষ পর্যন্ত সমস্তটা হেঁয়ালিই থেকে গেছে, এর সমাধান কিছু করতে পারেনি। কারণ লোভ ছাড়া আর কোন কারণ সে এ ব্যাপারে দেখতে পায়নি; কিন্তু ব্যাপারটা শুধুই লোভ, এটা তার কেমন যেন মনে হয়েছে!

কেন সে এই মোহিনী রূপে এমনভাবে ভুলে গেল। আর শুধু ভুলে যাওয়া নয় নিজেকে তছনছ করে দিল।

এমন চমৎকারভাবে সে নিজেকে গড়ে তুলছিল; কিন্তু কী একটা আকর্ষণে সে নিজেকে প্রায় শেষ করে দিতে বসেছিল। মান-মর্যাদা, শিক্ষা, রুচি, জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সমস্ত যেন সে তছনছ করে দিল। এ কোন্ অমোঘ শক্তি তার জীবনটাকে বাদল বাতাসের মত একেবারে এলোমেলো করে দিল!

এমনই হল যে অভীর সেই দুর্জয় আত্মবিশ্বাস, মনোবল, সাহসে ধাক্কা লাগল। অভীর

চেতনার জাহাজ যেন সেই মোহের ধাক্কায় ক্রমশ ডুবতে থাকল।

সেদিনের সে ঘটনা সামান্যই; কিন্তু তার প্রস্তুতি অভীর মনে মনে চলেছিল অনেকদিন ধরে।

কলেজের হলঘরে রবীন্দ্রজয়ন্তীর আসর বসেছে সন্ধ্যাবেলায়। তার আগে সেবারই প্রথম কলেজে মে-দিবসের অনুষ্ঠান হয়েছে। তার জন্য অভীকে জোর করে অনেক বাধা ঠেলে এগুতে হয়েছে। অনেক বাধা। শেষ পর্যন্ত তার বন্ধুরাই প্রশ্ন করেছে, মে-দিবস তো শ্রমিকদের দিন ভাই, এখানে এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মে-দিবস কেন?

অভী কঠোর হাতে সে সব সমালোচনা সামলেছে। অবশ্য তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুরাও তাকে এ লড়াইয়ে সাহায্য করেছিল।

কিন্তু একটা সফল অনুষ্ঠান করা মুখের কথা নয়। এও ছিল অভীর কাছে প্রায় চ্যালেঞ্জের মত। অক্লান্ত পরিশ্রম করে অভী এ কাজ করেছে। তার জয়-জয়কার হয়েছে। সকলে স্বীকার করেছে, এমন জিনিস সচরাচর দেখা যায় না।

অভী এইসব করেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, তাছাড়া এই কারণে তার আত্মবিশ্বাস বাড়ার বদলে অন্তরের সুপ্ত অহঙ্কারটা মাস্তুলের পতাকার মত উঠে দাঁড়াল। এই অহঙ্কার ক্রমে অভীকে গ্রাস করল। পরে তার সঙ্গে যোগ হল লোভ।

এরপর এল রবীন্দ্রজয়ন্তীর অনুষ্ঠান। তা হবে প্রতিবারের মত সেই একঘেয়ে। তাই অভী এখান থেকে একটু সরে দাঁড়াতে চাইছিল। এ ব্যাপারে অনেকেই উৎসাহী ছিল। তারা হয়তো নিজেদের ঠিকমত প্রকাশ করতে না পারার জন্য অভীর ওপর ক্রোধে ফুঁসছিল। তাই অভী চাইছিল, যা করার এবার ওরাই করুক।

শুধু মানসীর একটা গান গাওয়ার অনুরোধ সে উপেক্ষা করতে পারেনি। সে তার কলেজে অনেক নিচু ক্লাসে পড়ে। সে অভীর মে দিবসের অনুষ্ঠানে গান গেয়ে এটাকে সফল করেছে। তাছাড়া অগ্রজ হিসাবেও সে সম্মত হয়েছে যে গানটা সে গেয়ে দেবে। ঐ গানের ওপর মানসী তার নাচটা তৈরি করেছে। এইটুকুই কথা।

ঐরকম চারপাশে উত্তেজনার মুহূর্তে মানসীর ক্লাসের মেয়েটি অভীর কানের কাছে এসে ফিস্‌ফিস্ করে বলে, "আপনাকে মানসী একবার ডাকছে।"

তখন অনুষ্ঠান চলছে, পরিচালনায় ব্যস্ত সে। এতে না থাকলেও সমালোচনা শুনতে হবে। তাই সে একটু বিরক্তও হয়। আবার কী হল? মনে মনে বলে, এদের বায়নাক্কির আর শেষ নেই!

ওদিকে এবার মানসীর নাচের পালা। তাকে এবার তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হয়ে স্টেজে উঠতে হবে। এক্ষুনি ঘোষণা হবে। স্টেজে আলোর নির্দেশটা ঠিকমত দিতে হবে। এইসব নিয়ে অভী একটু অন্যমনস্কই ছিল।

ঠিক এই মুহূর্তেই মানসী তাকে ডাকছে।

হয়তো তার অভীকে আবার কিছু সতর্ক করার কথা মনে হয়েছে। একবার সে বলে দিয়েছে, "ঐ ঘাসে ঘাসে পা ফেলেছি" জায়গাটা যেন অভী দুবার গায়। নইলে মানসী ব্যাপারটা স্টেজে ঠিকমতো ফুটিয়ে তুলতে পারবে না। এই ব্যাপারটা অভী বার বার ভুল করে, তাই সে বার বার মনে করে নিজেকে সতর্ক করেছে। এইসব ভাবতে ভাবতে সে স্টেজের পর্দার পিছনে যায়।

আবছা আলোয় মানসী দাঁড়িয়ে, নাচের পোশাক পরে।

অভী সামনে যেতেই সে অভীকে একটা প্রণাম করে। অভিভূত অভী তাকে হতচকিত হয়ে আশীর্বাদ করে। হাসিমুখে মানসী বলে, "স্টেজে নামার আগে আমরা গুরুকে প্রণাম করে উঠি।"

অভী অল্পক্ষণ অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

এই কী নারীর রূপ!

নির্জন বনানীর ফাঁক দিয়ে উজ্জ্বল হয়ে ওঠা কোজাগরী পূর্ণিমার চাঁদ। অভী যেন চোখের সামনে উর্বশীকে দেখছে!

কিন্তু নৃত্যরতা উর্বশী কেমন ছিলেন তা তো সে বইয়ে পড়েছে। তিনি ছিলেন কল্পনায়। আর এখন এটা বাস্তব।

বিহ্বল দৃষ্টিতে অভী চিন্তামগ্ন হয়, এই রূপ সে তার এতদিনের জীবনে কখনো দেখেছে বলে তো মনে পড়ে না। হোক কালচার, তবু প্রকৃতি নারীকে এই রূপটাও তো দিয়েছে!

ব্যস, সব ভেঙ্গেচুরে তছনছ হয়ে গেল। ফিরে এসে অভী গানে বসল; কিন্তু তার কী যেন একটা গোলমাল হয়ে গেছে।

আজ এই নিস্তব্ধ রাত্তিরে সেইসব স্মৃতিগুলি যেন বার বার উঁকি দিয়ে যায়।

অভী যে এসব চাইছে তাও নয়। তবে সে এদের মন থেকে তাড়িয়ে দেবার কথাও ভাবছে না। শুধু দূর আকাশের দিকে তাকিয়ে চেষ্টা করছে একটু অন্যমনস্ক হতে।

অভী অনুভব করে, হয়তো আরও অনেকের মত এই নক্ষত্রখচিত, এই চন্দ্রোদয়ের তিমির রাত্রির এক বিশেষ আবেদন আছে তার হৃদয়-মনে।

কেননা যখনই সে একা একা আনমনে বিভোর হয়ে এই অবস্থায় নিজেকে ছেড়ে দিয়েছে, তখন যেন এই রাত্রির তিমিরপট বার বার তার কাছে এক গভীর রহস্যের, মহাকাশের কোন এক অজানা মহাবাণীর আভাস হয়ে দেখা দিয়েছে। তার আপন অতি ক্ষুদ্র তুচ্ছ অস্তিত্ব নিয়ে সে তোলপাড় হয়েছে এই বিশালত্বের প্রাঙ্গণে।

কখনো মনে হয়েছে যেন ছুটে চলে যায় ঐ নক্ষত্রলোকে, ঐ মহাবিশ্বের দিগন্ত অভিসারে। বার বার মনে হয়েছে, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অপার রহস্য যেন ঐ অন্ধকারের ছায়ায় প্রচ্ছন্ন হয়ে

রয়েছে। তাকে খুঁজে বার করার জন্য তার মনটা ছটফট করে উঠেছে।

কারণ এই উত্তেজনার মধ্যে যেন রয়েছে এক অসীম অশেষ অপার আনন্দ। জীবনের সমস্ত অশুভ, সমস্ত গ্লানি হরণ করা বুক জুড়িয়ে যাওয়া তৃপ্তি।

আর সেই অন্ধকারে জেগে থাকা তারকার অসংখ্য আলোকবিন্দু যেন সেই তিমিররহস্যের নিগূঢ়-আভাসময় অভিব্যক্তি। মনে হয় তারাগুলি যেন নির্বাক রহস্যমগ্ন অন্ধকারের ভাষা; অন্ধকারের গভীর বাণী যেন তাদের মধ্যে আভাসিত।

ভাবতে ভাবতে ক্রমশ ধ্যানমগ্ন হলে অভীর যেন মনে প্রশ্ন জাগে — এই নক্ষত্রখচিত তিমিররজনীর বিচিত্র রূপটি কী আমাদের অন্তরে ক্ষণে ক্ষণে ফুটে ওঠে রহস্যময় বাণীসত্তা রূপে?

কিন্তু কী তার বাণী, কী তার অন্তর্নিহিত নির্দেশ?

এর মধ্যে কী কোথাও মিশে আছে সেই মানবীয় উষ্ণ উত্তাপ? ভাবতে ভাবতে অভী কোথায় যেন ভেসে চলে যায়; কিন্তু হঠাৎ তার মনে হয় বিশ্বপ্রকৃতির এই অপূর্ব বিচিত্র বিহ্বল করে দেওয়া লীলায় আমার প্রেম কই ?

তাহলে আমার প্রেম কী এতই অকিঞ্চিৎকর যে কোন ছাপ ফেলতে পারে না ভূমার ঐ কঠিন হৃদয়ে!

তাহলে প্রকৃতি কী এতখানি নির্লিপ্ত, উদাসীন, দয়াহীন, মায়াহীন, মমতাহীন, এমনই নিষ্ঠুর — এখানে রয়েছে হয় অসীমকালের এক অপার রহস্যময় ডিজাইনের হিমশীতল করা অন্ধকার, নয়তো প্রাণের বিচিত্র অপূর্ব অমোঘ নিয়তির মাঝে শুধুই দাঁত আর নখের রক্তাক্ত রাজত্ব!

তার কোথাও কোন প্রেম নেই, কান্না নেই, ভালবাসা নেই, কোন গান নেই।

তাহলে মানুষ এই প্রেমের উৎস পেল কোথা থেকে? কোথা থেকে এল এই বিচিত্র মানবীয় সুর, সমস্ত প্রতিরোধকে ছিঁড়ে ফেলে চুরমার করে ছুটে চলা এই টান-ভালবাসা — কখনো ফুলে-ফলে পল্লবিত সুরের মত, ঝর্ণাধারার মত, কখনো দু'কূল প্লাবিনী স্রোতস্বিনীর মত?

আচ্ছা, এই প্রেম ছাড়া এই ভালবাসা ছাড়া নিয়োগীজীর মূল্যই বা কী? একে বাদ দিয়ে তিনি কী এই কমরেডদের নিয়ে সামান্য পথও অতিক্রম করে যেতে পারতেন? আর প্রেম ছাড়া কী মানুষ জীবন উৎসর্গ করতে পারে? আমাদের সমস্ত আদর্শের কেন্দ্রবিন্দু কী আমাদের প্রেম নয়, আঁতের টান নয়?

অভীর সংশয় হয়, এই আকাশ-পৃথিবী কী মানুষের কোন বেদনা বোঝে, কোন যন্ত্রণায় সাড়া দেয়?

কখনই না, আসলে আমাদের এই প্রাণাধিক প্রিয়া পৃথিবী মূক ও বধির!

মাঝে মাঝে অভী এইসব বুঝতে চেয়ে যখন কিছু খুঁজতে চায় তখন মনে হয়, নিউটনের

পোষা কুকুরের মত তার প্রভুর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে, আর ভাবছে সে প্রভুর মন বুঝতে পেরেছে। তখন মনে হয়, আমাদের এই বিচার-বুদ্ধি নিয়ে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অপার রহস্য কোনদিনই উপলব্ধি করা সম্ভব নয়।

তবু এই বোবা প্রকৃতি যেন একগুচ্ছ কঠিন সূত্রের বাঁধনে বাঁধা! সে শুধু সবাইকে সাবধান বাণী জানায় — যত খুশি তুমি খেলা কর আমার বুকে; কিন্তু জেনে রেখো একনিষ্ঠ বাধ্য ছাত্রের মত আমার খেলার ঐসব সূত্র মেনে তোমায় চলতে হবে, আর কখনো এসব তোমার খুশিমত তুমি ছিঁড়তে চাইলে এক ভয়ঙ্কর বিপদ ঘটে যেতে পারে! যেমন আমরা হেলমেট ছাড়া বাইকে চড়ে মস্তিষ্কের আঘাতের কবলে পড়ে প্রাণ হারাই।

অভী নড়েচড়ে বসে, বেশ তাহলে এতসব জেনেবুঝেও আমরা প্রকৃতিকে জয় করার কথা ভাবি! আর তার জন্যেই না কত অসংখ্য মানুষ যুগে যুগে নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়েছেন! তবু অনেক জয় যে মানুষ করেছে এও সত্যি।

কিন্তু সেসব ঐ সূত্র মেনে, আপন খেয়ালখুশিতে নয়। আর তা করতে চাইলে হয় প্লিনির মত ভিসুবিয়িসের কোলে গলিত লাভার স্রোতে সমাধি হতে হবে, নয়তো বেকনের মত নিউমোনিয়ায় মরতে হবে।

আকাশের দিকে মুখ তুলে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে অভী! কত অসহায় এই মানুষ! তবু তার কী দুর্জয় আকাঙ্ক্ষা!

আবার যখন এই মাটির পৃথিবীতে আমরা ফিরে আসি, তখন মানুষের দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণা, কান্না-ব্যথা-বেদনা আমাদের যারপরনাই উদ্বেলিত করে তোলে। তাই বা ঘটে কেন? কোথাও এতটুকু শান্তি দেয় না কেন?

আরও তো বহু মানুষ আছেন এ দেশে তবু নিয়োগীজীই বা কেন এই ছত্তিশগড়ের দুঃখ-কষ্ট দেখে এত কাতর হয়ে পড়লেন!

আমাদের এই শ্বাস-প্রশ্বাসের জগৎ কত ছোট, তবু এই প্রতিদিনকার জগৎই যেন চক্ষুষ্মান হয়ে অনেক বেশি বাস্তব আর সত্য হয়ে ওঠে! তখন আমাদের সমস্ত মন জুড়ে সেই-ই থাকে, আর কিছু ভাববার সুযোগ দেয় না!

হঠাৎ অভীর মনটা চঞ্চল হয়ে ওঠে। পাশের ঘরে শুয়ে রয়েছে অসুস্থ সোমা। সে কেমন আছে তাই সে দেখতে চেয়ে নিঃশব্দ পদচারণা করে এগিয়ে যায়।

সোমার দিকে চুপটি করে সে চেয়ে থাকে কিছুক্ষণ। বুকে ঘর্‌ঘর্‌ কোঁ কাঁ এইরকম বিচিত্র আওয়াজের মধ্যে পরম শান্তিতে সে ঘুমিয়ে পড়েছে — যেন মায়ের কোলে ছোট্ট মেয়েটির মত। নিশ্চিন্ত হয়ে অভী বেরিয়ে আসে, মনে মনে বলে, তাহলে আজ রাত্তিরের মত ঠিক থেকো। কাল সকালে আমি বুঝে নেব। দিনে আমি বীরপুরুষ আর রাত্তিরে আমি কাপুরুষ।

পোষা কুকুরের মত তার প্রভুর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে, আর ভাবছে সে প্রভুর মন বুঝতে পেরেছে। তখন মনে হয়, আমাদের এই বিচার-বুদ্ধি নিয়ে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অপার রহস্য কোনদিনই উপলব্ধি করা সম্ভব নয়।

তবু এই বোবা প্রকৃতি যেন একগুচ্ছ কঠিন সূত্রের বাঁধনে বাঁধা! সে শুধু সবাইকে সাবধান বাণী জানায় — যত খুশি তুমি খেলা কর আমার বুকে; কিন্তু জেনে রেখো একনিষ্ঠ বাধ্য ছাত্রের মত আমার খেলার ঐসব সূত্র মেনে তোমায় চলতে হবে, আর কখনো এসব তোমার খুশিমত তুমি ছিঁড়তে চাইলে এক ভয়ঙ্কর বিপদ ঘটে যেতে পারে! যেমন আমরা হেলমেট ছাড়া বাইকে চড়ে মস্তিষ্কের আঘাতের কবলে পড়ে প্রাণ হারাই।

অভী নড়েচড়ে বসে, বেশ তাহলে এতসব জেনেবুঝেও আমরা প্রকৃতিকে জয় করার কথা ভাবি! আর তার জন্যেই না কত অসংখ্য মানুষ যুগে যুগে নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়েছেন! তবু অনেক জয় যে মানুষ করেছে এও সত্যি।

কিন্তু সেসব ঐ সূত্র মেনে, আপন খেয়ালখুশিতে নয়। আর তা করতে চাইলে হয় প্লিনির মত ভিসুবিয়িসের কোলে গলিত লাভার স্রোতে সমাধি হতে হবে, নয়তো বেকনের মত নিউমোনিয়ায় মরতে হবে।

আকাশের দিকে মুখ তুলে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে অভী! কত অসহায় এই মানুষ! তবু তার কী দুর্জয় আকাঙ্ক্ষা!

আবার যখন এই মাটির পৃথিবীতে আমরা ফিরে আসি, তখন মানুষের দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণা, কান্না-ব্যথা-বেদনা আমাদের যারপরনাই উদ্বেলিত করে তোলে। তাই বা ঘটে কেন? কোথাও এতটুকু শান্তি দেয় না কেন?

আরও তো বহু মানুষ আছেন এ দেশে তবু নিয়োগীজীই বা কেন এই ছত্তিশগড়ের দুঃখ-কষ্ট দেখে এত কাতর হয়ে পড়লেন!

আমাদের এই শ্বাস-প্রশ্বাসের জগৎ কত ছোট, তবু এই প্রতিদিনকার জগৎই যেন চক্ষুষ্মান হয়ে অনেক বেশি বাস্তব আর সত্য হয়ে ওঠে! তখন আমাদের সমস্ত মন জুড়ে সেই-ই থাকে, আর কিছু ভাববার সুযোগ দেয় না!

হঠাৎ অভীর মনটা চঞ্চল হয়ে ওঠে। পাশের ঘরে শুয়ে রয়েছে অসুস্থ সোমা। সে কেমন আছে তাই সে দেখতে চেয়ে নিঃশব্দ পদচারণা করে এগিয়ে যায়।

সোমার দিকে চুপটি করে সে চেয়ে থাকে কিছুক্ষণ। বুকে ঘর্‌ঘর্‌ কোঁ কাঁ এইরকম বিচিত্র আওয়াজের মধ্যে পরম শান্তিতে সে ঘুমিয়ে পড়েছে — যেন মায়ের কোলে ছোট্ট মেয়েটির মত। নিশ্চিন্ত হয়ে অভী বেরিয়ে আসে, মনে মনে বলে, তাহলে আজ রাত্তিরের মত ঠিক থেকো। কাল সকালে আমি বুঝে নেব। দিনে আমি বীরপুরুষ আর রাত্তিরে আমি কাপুরুষ।

না; কিন্তু আরও ভাল কী কিছু করা যেত না! আর এখানে যারা অভীর কাজকর্মে গভীর আস্থাবান তারা ভাববে, যা সব থেকে ভাল হতে পারে ডাক্তারসাব তাই করেছেন। কিছু মানুষ নিশ্চয়ই বলবেন, অভীর বাহাদুরির জন্য সোমার এই পরিণতি হল!

কিন্তু এখন এই মুহূর্তে অভীর উপলব্ধি কী?

অভী এই সার কথাটা বোঝে, জীবনের আর পাঁচটা চ্যালেঞ্জের মত তার কাছে রোগীর রোগ-নিরাময়ও একটা চ্যালেঞ্জ, বিশেষত তার এই গরিব দেশে, এই অপ্রতুল ব্যবস্থায়।

সে ভীরু কাপুরুষ নয়। জীবনে এই চ্যালেঞ্জ নেবার জন্য সে নিজেকে এতদিন ধরে প্রস্তুত করেছে, সে সবার জন্যেই এমন করে। আগে আরও বেশি করত, ঝাঁপিয়ে পড়ত, পরিবেশ-পরিস্থিতির শিকারে এখন একটু কম করে।

কেন জানি মনে হয়, মানুষ যদি নেবার জন্য প্রস্তুত না থাকে তাহলে তাকে নেবার জন্য প্রস্তুত করা দরকার, নইলে সে যা পায় তা সে ধরে রাখতে পারে না। তাই মানুষের চাহিদা তৈরি হওয়া অব্দি অপেক্ষা করতেই হয়। কিন্তু এই চাহিদাও তো আপনা থেকে হয় না, এটাও তো একটা প্রক্রিয়া।

তবু নিজেকে নায়ক প্রমাণ করার জন্য নিশ্চয়ই সে সোমার ব্যাপারে এই চ্যালেঞ্জ নেয়নি। চিকিৎসাবিজ্ঞানের অগ্রগতি আজ তার সহায়সম্বল।

পরিবর্তে এই চ্যালেঞ্জ না নিলে সোমাকে পাঠিয়ে দিতে হত দূরবর্তী হাসপাতালে। ও হয়তো রাস্তার ধকলেই শেষ হয়ে যেত। আর যদি তখন ওর কিছু অবশিষ্ট থাকত, ওখানে গিয়ে কোন ব্যবস্থা পেতে পেতে অনেকখানি মূল্যবান সময় চলে যেত। আরও একটা বড় ভরসার জায়গা, সোমার এই রোগ তার পরিচিত।

অভী ভাবতে থাকে, বাকি রাতটুকু সে কোথায় থাকলে সেটা উপযুক্ত হবে।

হাসপাতালের কেবিন থেকে সে সোমাকে একরকম জোর করেই ঘরে নিয়ে এসেছে। যুক্তিটা ছিল, সে সর্বক্ষণ তাকে দেখতে পারবে।

আসলে সোমা তার এত ঘনিষ্ঠজন যে তাকে হাসপাতালের কেবিনে রাখা যায় না। এই কথাটা সে কাউকে বলতে পারলো না।

তবু যা সে মনে করে তাই করে থাকে, করলও তাই। বলার সঙ্গে সঙ্গেই কাজ হল। সহকর্মীরা অতি যত্নে তাকে এখানে পৌঁছে দিয়ে গেল। অক্সিজেনটাও তারা এখানে টেনে আনতে চেয়েছিল। অভী আপত্তি করে। ওর অবস্থা তুলনায় ভাল, আর অক্সিজেন লাগবে না। হাসপাতালে এই একটি সিলিন্ডারই পুঁজি।

তাদের আছে মোট পাঁচটা সিলিন্ডার, তার মধ্যে একটা অপারেশন থিয়েটারে, তিনটে খালি তাই ভর্তি হতে গেছে। অক্সিজেনের আকাল চলছে, রায়পুরে নগদ পয়সা নিয়ে ঘুরে

বেড়িয়ে অনেক সময় অক্সিজেন পাওয়া যায় না।

প্রয়োজনীয় ওষুধের ক্ষেত্রেও এমন আকাল হয়। তাই অভীর মাঝে মাঝে মনে হয়, সব চুলোয় যাক্। সে একটা ক্ষুদ্র মানুষ, আর এইসব ঠিক করার ঠিকেদারি সে নেয়নি।

বারান্দায় একটা ভাঁজ করা খাট আছে। সেটা নিয়ে অভী বারান্দায় পড়ে থাকবে। তাহলে হাসপাতাল থেকে ডাক এলেও সে শুনতে পাবে আর সোমার কিছু হলে —। অতি সন্তর্পণে সে শোবার ব্যবস্থা করে।

তারপর সে জলের বোতল নিয়ে বাইরে আসে, জল খায়, সিগারেট ধরায়। এই সিগারেট বস্তুটি সে উত্তেজনার সময় মাঝে মাঝে খেয়ে ফেলে, বিশেষত রাত্রে। হয়তো তাতে কিছু ভাবমোক্ষণ হয়।

একবার সে হাসপাতালের দিকে তাকায়, নিথর সুপ্তিতে সবাই যেন ঢলে পড়েছে। এ পাশে হঠাৎ তার চোখে পড়ে কী একটা যেন সামনে দেখা যায়। না, ওটা কিছু না। এমন কত কিছু রাত্তিরের অন্ধকারে সত্যি মনে হয়। আসলে এ সবই মনের ভুল। এসব ভয় থেকে আসে। মনে ভয় থাকলে এসব বেশি দেখা দেয়। তাছাড়া রাতের অন্ধকারে এই ভয়টা যেন আরও বেড়ে যায়।

অন্ধকারে বাচ্চারা মাকে দেখতে পায় না, ভয় পেয়ে কেঁদে ওঠে। ওরাও বুঝতে পারে, অন্ধকার মানে ভয়ের কিছু আছে। ভয় মানে মৃত্যুভয়।

ভয় পেয়ে মনে ভেবে চলেছি, আমার শত্রু হয়তো কোথাও ঘাপটি মেরে রয়েছে, সুযোগ বুঝেই আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। অতএব আমায় সতর্ক থাকতে হবে। তার থেকে ভেতরে একটা টান টান অবস্থা তৈরি হয়। কারণ শত্রু কতটা শক্তিশালী আমি জানি না। নিজেকে বাঁচাবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

তাছাড়া এমনিভাবেও তৈরি হয় হরেক রকমের রঙবেরঙের ভয় — জমি হারানোর ভয়, কারখানায় কাজ চলে যাবার ভয়, অত্যাচারের ভয়, উচ্ছেদ করার ভয়, কেউ ধর্ষণ করতে পারে সেই ভয়, প্রাণে মেরে দিতে পারে এই ভয়, নইলে রোগের ভয়।

সারা জীবন আমাদের এই ভয় টেনে নিয়ে চলতে হয়, কারো কম আবার কারো বেশি।

চিত্তকে ভয়শূন্য করা বোধহয় এই জীবনে একটা হাস্যকর প্রচেষ্টা। রবীন্দ্রনাথের বোধহয় এমন ভয় তাড়ানো গান কবিতা আছে শত খানেক।

আবার অন্য রকমের ভয়ও আছে, যেমন মার্কসের নামে সবাইকে হিংসার অত্যাচারের ভয় দেখানো হয়। যেন তিনি এক ভয়ঙ্কর দানব। প্রচারের এমনই মহিমা, জিরাফ বললেই যেমন তার লম্বা গলাটার কথা মনে আসে, তেমনি মার্কস-লেনিন বলতেই হিংসা আর রক্তাক্ত পরিবেশের কথা প্রথমে মনে আসে।

এইরকম 'কমিউনিস্ট'এই ভয় দেখিয়ে, এমন একটা পরিবেশ তৈরি করে রাতের অন্ধকারে নিয়োগীজীকে গুলি করে মেরে দিল।

দিলখোলা মানুষটা জানলা খুলে শুয়ে ছিল। আর তাঁর সব থেকে বড় ভুল হয়েছিল তিনি মানুষকে বড় বিশ্বাস করতেন। এর আগেও তাঁকে মারার চেষ্টা হয়েছে। তাতেও তিনি ভয় পাননি! তাঁকে কেউ এমনভাবে মারতে পারে, তা তাঁকে বললেও বিশ্বাস করতেন না।

তাহলে এমনও ঘটে। এইভাবে অন্যায় যুদ্ধে তাঁকে হারিয়ে দেওয়া হল, তাঁকে খতম করে দেওয়া হল। তারপর কী ভেবে অভী দীর্ঘশ্বাস ফেলে — না, যুদ্ধে ন্যায় অন্যায় বলে কিছু নেই, প্রেমেও নেই। যার যা ক্ষমতা লড়ে নাও।

বিশ্বপ্রকৃতিতেও কী ন্যায়-অন্যায় বলে কিছু আছে! তাহলে অন্তত এই ব্যাপারে মানুষ বিশ্বপ্রকৃতির এই ধারা বহন করবে না কেন!

আমরা আমাদের ন্যায়নীতি, মূল্যবোধ অনেক সময় এই প্রকৃতির ওপর চাপিয়ে দিই। যেমন নিয়োগীজী তাঁর মূল্যবোধ দিয়ে ঐ পাষগুগুলোর সঙ্গে কত লড়াই করেছেন। তাদের বোঝাবার চেষ্টা করেছেন, ছত্তিশগড়ের এই গরিব মানুষগুলির প্রতি তারা অন্যায় করছে।

নিয়োগীজী ওদের গড়ে ওঠা শ্রেণীস্বার্থের প্রকৃতি পরিবর্তন করতে চেয়েছিলেন। সেই বোবা প্রকৃতি।

বাইরের বারান্দায় বসে দূরের নক্ষত্রখচিত আকাশের দিকে একদৃষ্টে অভী তাকিয়ে থাকে। ভাবে, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কত সুন্দর, তাকে কত সুখ দেয়।

হঠাৎ সোমার অসুস্থ মুখটা তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। তখনই সে ওঠে পড়ে, আগামী কালের কাজগুলো ভেবেচিন্তে সাজাতে আরম্ভ করে। অনেক কাজ, অনেক কাজ। তার দুশ্চিন্তাও হয়, রাত্রে একটু ঘুম না হলে সারাদিন এইসব কাজ করতে পারবে তো! তাহলে এক্ষুনি শুয়ে পড়া উচিত, অন্ততপক্ষে ঘুমের চেষ্টা করা উচিত। এখন সোমা অনেক ভাল আছে।

সন্তর্পণে সমস্ত কাজ নিখুঁতভাবে করেও অভীর কাজে ভুল হয়ে যায়। শুয়েই মনে পড়ে। কেশে ফেলার জন্য ফিনাইল জলের একটা গামলা ঠিক সোমার খাটের নিচে রেখেছে সে। রাত্রে উঠে বাথরুমে যাবার জন্য ওতে পা পড়লেই পা পিছলে যাবে। তাই আবার নিঃশব্দে উঠে অন্ধকারে গুড়ি মেরে অভী সেটার ব্যবস্থা করে। এককোণে চাঁদনী কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে।

অভী ফিরে এসে দেহটা বিছানায় মেলে ধরতেই কয়েকটা পাখি ডেকে ওঠে। হয়তো ওরা ভোরের পাখি; কিন্তু ওদের ঘড়ি ভুল সময় জানিয়েছে। অভী হাতঘড়ি দেখে, এখনও ভোর হতে অনেক বাকি। হতে পারে নিশাচরের ভয়ে ওরা একে অপরকে সতর্ক করছে।

আচ্ছা পাখি যে এত ভাল গান করে, শুনতে বড় ভাল লাগে; কিন্তু ঐ পাখি তো অসংখ্য পোকামাকড় আর ফলের বীজ খেয়ে প্রকৃতির ক্ষতি করে! কাউকে বললে বলবে, এতে প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা হয়।

কিন্তু শুলেই যে অভীর ঘুম আসবে এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। আজকের এই উত্তেজনাটা

মাথায় থাকার জন্য ঈর্ষাকাতর ঘুম আজ আর হয়তো তাকে জড়িয়ে ধরবে না। ঘুম — জিলাস মিসট্রেস, না চাওয়াই মঙ্গল।

এই হাঁপানি-শ্বাসকষ্ট নিয়ে একটা কাজের কথা অভীর মনে পড়ে যায়। জলপাইগুড়ির আকুপাংচার সেন্টারের একজন কর্মী একবার খবর দিল, ময়নাগুড়ির কাছে একটা কুমোরদের গ্রাম আছে সেখানে লোকজনদের মধ্যে শ্বাসকষ্ট আর হাঁপানির রোগী অস্বাভাবিক ধরনের বেশি। শুরুতে বিষয়টা নিয়ে অভী ততখানি গুরুত্ব দেয়নি; কিন্তু ঐ কর্মীটি শেষে কয়েকজন রোগীকে জলপাইগুড়ির সেন্টারে হাজির করতেই অভী তাদের কথা শুনে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে এই নিয়ে একটা সমীক্ষা করবে।

অভী কলেজের মাইক্রোবায়োলজি ডিপার্টমেন্টে যখন এ সম্পর্কে আলোচনা করছে তখন বোধহয় মানসী ঐসব কথা শুনে থাকবে। রাস্তায় দেখা হতেই আব্দার করে, "আমি আপনার সঙ্গে সমীক্ষা করতে যাব।"

কথাটা শুনে অভী একটু থমকে যায়, একটা অদ্ভুত অনুভূতি হয় তার, কী যেন ভাবে তারপর অন্যমনস্কভাবে বলে, "বেশ চল; কিন্তু তোর ক্লাস কামাই হবে না?"

মানসী যেন ভেবেই রেখেছিল, "রবিবার চলুন।"

অভী ইতস্তত করে, রবিবার তার অন্য কাজ আছে তবু সে মেনে নেয়, হেসে বলে, "আচ্ছা তাই হল।"

যাবার রাস্তাটায় অভীর কী যে হল। সে খুব অন্যমনস্ক ছিল। আপ্রাণ চেষ্টা করেও মানসীর সঙ্গে সহজভাবে কথা বলতে পারছিল না। অথচ মানসী বেশ সহজ মনে স্ফূর্তিতে রয়েছে। তারপর জাতীয় সড়কে যেখানে বাসটা নামিয়ে দিল সে জায়গাটা ভারি সুন্দর। হঠাৎ অভীর মনে হয় তার কাঁধের ব্যাগটার ভার আছে।

মানসী তার পাশাপাশি হাঁটছে, কথা বলছে। তবু অস্বস্তির ভাবটা অভীর কাটছে না। তখন সে নিজেকে শাসন করতে শুরু করে। প্রায় কুড়ি মিনিট রাস্তা হাঁটলে তবে সেই কর্মীটিকে পাওয়া যাবে, সে একটা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে অপেক্ষা করছে।

রাস্তার দুপাশে বড় বড় গাছ — শিশু, অর্জুন, দেবদারু, কৃষ্ণচূড়া আরও কত কি। ডালে ডালে পাখি ডাকছে, রোদের তেমন তেজ নেই। পাশাপাশি চলতে চলতে অভী মানসীকে পড়াতে থাকে।

হাঁপানি মানে শ্বাসনালীর 'সংবেদনশীলতা'। একথা বলেই সে মানসীর দিকে তাকায়। মানসী অনুগত ছাত্রীর মত অভীর কথা শোনে আর মাঝে মাঝে এটা ওটা জানতে চায়। প্রায় সারাক্ষণই অভীর মনে হয়েছে, ও অন্য কিছু ভাবছে না তো। না, তা হবে না। কারণ ও তো আর অভীর মনের মধ্যে ঢুকতে পারছে না।

আবার পরক্ষণেই তার মনে হয়, ও অন্য কিছু ভাবছে না কেন!

কারণ অন্য কিছু ভাবার মত কোন ঘটনা ঘটেনি। মানসী জানে, একজন সিনিয়ার দাদার সঙ্গে সে শ্বাসকষ্টের রোগীদের ওপর একটা সমীক্ষা করতে বেরিয়েছে। তাতে ওর কাজটুকু ওকে ভাল করে করতে হবে। সেই কাজের দায়িত্ব ও বুঝে নিয়েছে, অভীকে বার বার জিজ্ঞাসা করে নিঃসংশয় হয়েছে।

তাকে এলার্জির রোগ-ইতিহাসটা খুঁটিয়ে নিতে হবে, সমীক্ষাপত্রটা ভালভাবে পূরণ করতে হবে, হাঁপানি কিসে কমে কিসে বাড়ে এটা ঠিকমত জানতে হবে,অন্তত পঞ্চাশটা স্যাম্পেল হবে, রক্তটানায় সাহায্য করতে হবে — এই তো কাজ।এর মধ্যে তার কী আর ভাবনার আছে। তার মনে ভরপুর আনন্দ। নতুন পরিবেশে একটা নতুন কাজ সে দেখবে, জানবে, বুঝবে, যা জানার সুযোগ তার সহপাঠীরা পাচ্ছে না।

কিছুক্ষণ পর অভী খেয়াল করে সে বড্ড অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে। এই অভিযোগ করে মানসী তার হাতটা ঝাঁকিয়ে বলে ওঠে, "আমি তখন থেকে এটপি এটপি বলে চেঁচাচ্ছি, আপনি আমার কথা শুনছেন না।"

ঠ্যালা খেয়ে অভী গড় গড় করে বলতে শুরু করে, "হ্যাঁ, জগতের সব সমাজে একই পরিমাণে এই রোগ হয় এবং অল্পবয়েসীদের বেশিমাত্রায় এই রোগ হয়। পুরুষদের দ্বিগুণ হয়; কিন্তু বয়স বাড়লে স্ত্রী ও পুরুষের সমান হারে হয়। নানা কারণে এই রোগ হতে পারে তাই এর শ্রেণীবিভাগ করা বৃথা।" মানসী হাঁ করে তার দিকে তাকিয়ে, দাঁড়িয়ে পড়ে।

অভী তার দিকে তাকিয়ে আরও বিহ্বল হয়ে পড়ে।

মনে পড়ে, ছেলেবেলায় হয়তো কোনদিন প্রবল দিবানিদ্রার তোড়ে রাতে ঘুম আসছে না। কোলের ছেলে অভী, মায়ের পাশে শুয়ে উসখুস করছে। তখন মা বলছে, এ ছোঁড়ার ঘুম চটকেছে। মায়ের সেই ক্লান্ত দেহে ঘুম জড়ানো গলায় আধো অন্ধকার ঘরে বলার ভঙ্গিটা যেন অভী সারা দেহে অনুভব করে। মায়ের মুখটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

গতবছর মা মারা গেছে। অভী তখন এখানে, অনেক দেরিতে সে খবর পেল। মা নাকি তাকে খুব দেখতে চেয়েছিল। অথচ অভী কত নির্মম!

বাবা অনেক আগেই গত হয়েছেন, সুতরাং অভী এখন মুক্ত ইলেকট্রন।

অভীর সম্পর্কে কেউ কোন অভিযোগ মায়ের কাছে নিয়ে গেলে মা তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলবে, "ছেলেবেলায় শুনেছি পাড়ায় তিন ধরনের বদ্যি থাকতেন। এক বদ্যি ওষুধ দিয়েই খালাস, কোনদিন খোঁজও নেন না রোগী ওষুধ খায় কী খায় না। আর এক বদ্যি মধ্যম, তিনি তবু খোঁজখবর করেন। আর এক জাতের বদ্যি রোগীকে চিৎ করে ফেলে জোর করে ওষুধ খাইয়ে তবে ছাড়তেন। অভী আমার সেই রকম বদ্যি, ও কী বসে থাকার ছেলে। পাঁচজন

মানুষের কথা যারা ভাবে তারা কী ঘরে চুপচাপ বসে থাকতে পারে।"

মায়ের জন্য অভীর মনটা কেমন করে।

একটা কথা এখনও ভাবলে অভীর আশ্চর্য লাগে। ছেলেবেলায় মায়ের কাছে **বর্ণপরিচয়** দিয়ে পড়াশোনার হাতেখড়ি হয়েছে। মা রান্না ঘরে তাকে বসিয়ে সামনে একটা লাঠি রেখে দুরন্ত অভীকে সামলাত। কিন্তু এক ঘা মারও কোনদিন খেয়েছে কিনা অভীর মনে পড়ে না। লাঠি তুললেই ব্যস, অভী ভ্যা করে কেঁদে দিত। দিদিরা রাগাতো 'ছিঁচকাঁদুনে ছোঁড়া' বলে।

সেই মা'কে অভী বড় হয়ে হাজার যুক্তি দিয়েও বোঝাতে পারেনি যে বিদ্যাসাগর মায়ের ডাকে দামোদর সাঁতরে পেরোননি। ওটা নিছক গল্প। অভী যত যুক্তিই দিক না কেন শেষ পর্যন্ত মা বলে বসবে, "শোন, মায়ের ডাকের কাছে অমন নদীও ছোট হয়ে যায়।" অভী তখন কেবলই হেসেছে।

এখন ভাবে, মানুষের কী অদ্ভুত বিশ্বাস!

বিদ্যাসাগর, ভগবতী দেবীর কথা বলতে মা অজ্ঞান। অমন মা না হলে কী অমন ছেলে হয়!

বিদ্যাসাগরকে নিয়ে কত রোমহর্ষক গল্প অভী ছেলেবেলায় মায়ের কাছে শুনেছে। তার কিছু কিছু সে নিয়োগীজীকেও বলত। নিয়োগীজী মুগ্ধ হয়ে শুনতেন, তাঁর ছেলেমেয়েদের শোনাতেন।

আসলে অভীর মায়ের মামার বাড়ি ছিল সুখিয়া স্ট্রীটে, সেখানে ছেলেবেলায় কুল পাড়তে বেল পাড়তে গিয়ে এক থুরথুরে বুড়োর কাছে নাকি মা'রা দয়ার সাগরের এইসব গল্প শুনত। এমন এমন গল্প যা কোথাও কখনো শোনা যায় না, আর তা বাস্তবেও অসম্ভব। তবু মায়ের কাছে গল্প শুনে ছেলেবেলায় বিদ্যাসাগর যেন অভীর মনে কোথায় একটা স্থায়ী জায়গা করে নিয়েছিলেন।

আশ্চর্য, অভীর এখন শুধু মায়ের কথা মনে হচ্ছে। অথচ ছেলে হয়ে মা'কে সে দেখেনি। এটাও কী এক ধরনের নিষ্ঠুরতা, নাকি জীবনের ওপর অভিমান করে অভী সব কিছু থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে!

তবু মায়ের কাছে অভীর কোন নিন্দা করা চলবে না। মা'দের কী অসম্ভব দেহের শক্তি ছিল, মনের জোর ছিল — ভাবলে অবাক লাগে। কোন রাগ, দুঃখ, অভিমানের বালাই নেই, কিছুই যেন শরীরে নেই। দিদিরা রাগ করলে বলত, "ও আবার কী, পরের ঘর করতে যাবি, তোদের ওসব সাজে নাকি! সংসার মানেই হাতের আঙ্গুলের মত পাঁচটা পাঁচরকমের মানুষ থাকে।"

মা'দের শরীর কোন ধাতু দিয়ে তৈরি কে জানে!

দিনরাত অফুরন্ত পরিশ্রম করার ক্ষমতা ছিল মায়ের। তারা পাঁচ ভাইবোন, তার পর জেঠতুতো খুড়তুতো, কত বড় সংসার। মা কোন কাজ পারবে না বা পারছে না — এমনটি

সে কখনো শুনেছে বলে মনে পড়ে না। সকলকে দিয়ে-থুয়ে সবার শেষে যা উচ্ছিষ্ট পড়ে থাকবে তাই তার প্রধান খাদ্য। কিছু বললে মা বলবে, "যা ভাগ্য করে এসেছি বাবা!" এই ভাগ্য, কপাল মা'দের বাঁচিয়ে দিয়েছে।

কী চমৎকার রাঁধত মা, এখনও অভীর মুখে লেগে আছে। ঝাল তেল মশলা কিছু নেই অথচ কী অপূর্ব স্বাদ! সব ছেলেমেয়ের কাছেই বোধহয় তার মায়ের রান্না এমন অপূর্ব।

আরও একটা কথা ভেবে অভী আশ্চর্য হয়, এতগুলি ছেলেমেয়ে প্রসব করার জন্য মা'দের দেহের ওপর দিয়ে কী ধকল গেছে, কী ঝড় বয়ে গেছে। হয়তো তার প্রতিরোধেই মা'দের আয়ু বেড়ে গেছে। তখন মনে হয় প্রকৃতি কী দয়াময়ী!

ঘুম যেন একবার আসছে আবার চলে যাচ্ছে। চুলোয় যাক্।

বড়দি একবার কী একটা সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড ঘটিয়েছিল!

পেনেটি থেকে দিদিমা এসেছে তার মেয়ের সংসার পরিদর্শন করতে। দু'চারদিন এপাশ ওপাশ নেড়েচেড়ে দেখেশুনে দিদিমা মন্তব্য করেছে, শেফালীর সব ভাল; কিন্তু ওর মেয়েগুলোর পোশাক-আশাক একটু ঢাকাঢুকি হলে ভাল লাগে। মা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তার অসহায়তা প্রকাশ করেছে, ওরা সব লেখাপড়া জানা বাইরে ঘোরা মেয়ে, কথা বললে কী শোনে!

বড়দি এইসব শুনে এক ষড়যন্ত্র করে। ছোটদিকে সঙ্গে করে দিদিমাকে **বিল্বমঙ্গল** সিনেমা দেখাতে নিয়ে যায়। কিন্তু সেটা **বিল্বমঙ্গল** ছিল না, ছিল সেই সময়কার একটা গরম হিন্দি ছবি। ব্যস, সিনেমা হলে সমস্ত সময় ধরে দিদিমা ছটফট করেছে; কিন্তু দিদিরা বুঝিয়েছে এখন বেরুতে দেবে না, তারপর পয়সা দিয়ে টিকিট কাটা হয়েছে।

কোনক্রমে বাড়ি এসে মা'কে সামনে পেয়ে দিদিমা অভিযোগে ফেটে পড়ে। শেফালী তোর মেয়েরা এত বজ্জাত, মাগো ন্যাংটো ন্যাংটো ধিঙ্গি মেয়েগুলো পর্দায় ছুটে বেড়াচ্ছে, ঐসব ছেলেবুড়ো সবাই দেখছে —। দিদিমার সেই মূর্তিটা অভীর চোখের সামনে এখনো ভাসছে।

মা তো দিদিকে এই মারে সেই মারে। দিদি তত বোঝায় তার দোষ নেই, ঐদিনই সিনেমাটা পাল্টে গেছে, সে জানত না। তখন দিদিমাকে আর পায় কে! কথাটা ভেবে এখনও অভীর হাসি পায়। দিদিমার অবস্থা যেন সেই নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণকে লুকিয়ে মুরগির মাংস খাওয়ানোর মত।

কখন চোখটা লেগে গিয়েছিল অভীকের, সারাদিনের ক্লান্তি আর পরিশ্রমে তার চোখদুটো যেন আপনা হতেই বুজে এসেছিল। হঠাৎ খুটখাট কিসের শব্দে ঘুমটা ভেঙ্গে যায়, সে ধড়মড় করে উঠে বসে। হাতঘড়িতে দেখে সাতটা। ত্বরিতে সে পাশের ঘরে চলে আসে। এসে দেখে বালিশে কাৎ হয়ে আধশোয়া সোমা জানলার পর্দাটা তুলে দিয়ে দূরের দিকে তাকিয়ে।

হয়তো রাস্তার যাওয়া-আসা মানুষজনের ইতস্তত চলাফেরা তাকে কোন কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। তাই সে দূরের দিকে তাকিয়ে হয়তো নির্দিষ্টভাবে কিছুই দেখছে না। একটা সমগ্রতার মধ্যে রাজনন্দগাঁওয়ের সকালটাকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করছে। একে মিলিয়ে দেখছে তার প্রতিদিনের সকালের সঙ্গে। হয়তো মনে পড়ছে তার প্রিয়জনদের কথা। কে জানে, অনেক পুরানো দিনের কথাও তার মনে পড়ে যেতে পারে। সেটাই স্বাভাবিক।

তাছাড়া কতদিন পর সে আবার নতুন করে অন্য অভীককে দেখছে। অন্য অভীক অন্য মানুষ।

এই সঙ্গে পর্দার ফাঁক দিয়ে তেরছাভাবে অকৃপণ নরম সূর্যের আলো এসে পড়েছে ঘরে। অবিন্যস্ত চুল আর শুকনো মুখ নিয়ে ঢুকে পড়া অভীককে সোমা খেয়াল করেনি। হঠাৎ কাশতে গিয়ে নড়ে উঠে সে অভীকে দেখতে পায়, তাড়াতাড়ি কাপড় ঠিক করে উঠে বসার চেষ্টা করে। তার কষ্ট দেখে অভী বলে, "আহা থাক্ না, শুয়েই থাকো, কেমন আছে শরীর, শ্বাসকষ্ট আছে আর।"

অভীককে দেখে বোঝা যায় সে ঈষৎ উত্তেজিত কিন্তু আড়ষ্ট; তাই শান্ত গলায় সোমার উত্তর শোনার আগেই অনেকগুলি প্রশ্ন করে বসে, "মুখ ধুয়েছো, সকালে কী খাও তুমি? এখনও কী সব খাবার এলার্জিতে ভর্তি? রাত্রে ঘুম হয়েছিল? এখানে ওষুধগুলো আছে, তোমায় বুঝিয়ে দেবো নিয়ম করে খেতে হবে, একটু ভাল লাগছে এখন?"

সোমা গায়ে চাদরটা জড়িয়ে নিয়ে কষ্টের মধ্যে মুখে হাসি ফুটিয়ে বলে, "ভালই লাগছে।"

অভীর বুকটা যেন কিছুটা হালকা হয়ে যায়, চটপট একটা টুল টেনে নিয়ে সে বিছানার পাশে বসে। হাতের যেখানটায় রাত্রে শিরায় লবণ-জল চালানো হয়েছিল সেখানটায় সোমা হাত বোলায়, অভী চশমার কাচটা মুছতে মুছতে বলে, "কী ব্যথা হচ্ছে, দাঁড়াও অয়েন্টমেন্ট লাগিয়ে দিই।" একথা বলেই সে আলমারি খুলে ওষুধ বার করে আঙ্গুলে নিয়ে সোমার হাতে লাগাতে শুরু করে।

সোমা রুগ্ণ গলায় ক্ষীণকণ্ঠে হেসে ওঠে, "না না, কিছু ব্যথা নেই, তুমি ব্যস্ত হয়ো না। হাসপাতালে যাবে তো, যাও তৈরি হও, আমি ঠিক আছি।"

সোমার লম্বা হাই তোলা দেখে অভী হাসিমুখে তাকায়, "এখনো তোমার চোখে ঘুম আছে, আর একটু ঘুমিয়ে নাও, তাহলে শরীরটাও তাজা হবে।"

যেন এই কথাটির জন্য সোমা অপেক্ষা করে ছিল, "রাত্রে কী ঘুমের ওষুধ দিয়েছিলে?" এই বলে সে লম্বা হয়ে চাদর মুড়ি দিয়ে সারা গায়ে আয়েস জড়িয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ে।

অভী উঠে দাঁড়ায়, "আমি তাহলে হাসপাতাল থেকে ঘুরে আসি। একটি মেয়ে আছে এখানে আমাদের ফরমাশ খাটে তোমাকে ও দেখভাল করবে, আমি বলে যাচ্ছি।"

সোমা আধবোজা চোখে তাকিয়ে মাথা নাড়ে, পরেই বলে, "তোমায় খুব বিপদে ফেলেছি না!"

অভী দেয়াল থেকে জামাকাপড় টানে, "কী যে বলো, তুমি তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠো। কাল খুব টেনসনের মধ্যে কেটেছে!"

বলতে বলতে ঘাগরা পরা একটি বাচ্চা মেয়ে ঘরে ঢোকে, অভী তাকে ইশারায় কী সব বোঝায়। তারপর হেসে সোমার দিকে তাকিয়ে বলে, "ও মূক-বধির তাই তোমাকেও একটু কসরৎ করতে হবে। তবে বেশ বুদ্ধি ধরে, তোমার তত অসুবিধা হবে না।"

অভী ভেবেছে, কয়েকদিন যদি সোমা থাকে তাহলে তার জন্য কিছু ব্যবস্থা করা দরকার। এ বাড়িতে অতিথি সৎকারের কোন ব্যবস্থা নেই। বন্ধুরা থাকলে তারাই সব ব্যবস্থা করত; কিন্তু অভী এইসব বিষয়ে একেবারে আনাড়ি। তাই অন্যদের সঙ্গে পরামর্শ করার জন্য সে একবার কাছের মেসে ছুটে যায়, যেখান থেকে তাদের দু'বেলা খাবার আসে। তারপর দ্রুত ফেরার পথে কাছের বাজারে যায়।

ফিরে এসে ঘরে ঢুকতেই অভী দেখে এক প্রমীলা বাহিনী সোমাকে ঘিরে বসে-দাঁড়িয়ে। এরা সবাই গত দিনের নারীমুক্তি মোর্চার সম্মেলনের প্রতিনিধি। নানা চেহারার, নানা পোশাকের, নানা বয়েসের তবু তাদের যেন কোথায় একটা সাদৃশ্য আছে।

এরই নাম কী কালচার, লামার্কের বিবর্তনের স্থানীয় অভিযোজন!

তবু সোমা এদের মধ্যে অনেকদিন থেকেও তেমন পাল্টায়নি তো। বোধহয় ছেলেবেলা থেকে বলা আর না-বলা বাণীর মধ্যে দিয়ে এই পরিবর্তনের পর্বটি ধীর লয়ে ঘটে চলে।

অভী এদের কয়েকজনকে কাল দেখেছে, তাই তারাও তার কিছুটা মুখচেনা। অভীকে দেখে সবাই একযোগে কলকল করে বহুবিধ প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ করে চলে।

এরই ভিতর একজন মাঝবয়েসী ভদ্রমহিলা ভারিক্কি গলায় ওকে অভিবাদন জানানোর ভঙ্গিতে বলে, "আইয়ে ডক্তরসাব, আপকা বহুত বহুত সুক্রিয়া —।" অভী যে তাদের এই কমরেডটির 'জান' বাঁচানোর জন্য অনেক কিছু করেছেন তার জন্য তাদের কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

এখন তারা ডাক্তারসাবের কাছে জানতে চাইছে, কী ভাবে তাদের কমরেডটিকে তারা ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারে। তারা একটু এদিক ওদিক খাদান দেখতে যাবে দানীটোলায়, তারপর ফিরে এসে যেভাবে হোক বন্ধুটিকে গাড়ি করে নিয়ে যাবে। তাই তারা জানতে চায়, এর মধ্যে তাদের বন্ধুটি নিশ্চয়ই যাবার জন্য তৈরি হতে পারবে।

অভী স্বাভাবিক ভঙ্গিতে তাদের দিকে তাকিয়ে বলে, "আপলোগকা নাস্তা হো গিয়া?"

সঙ্গের একটি মেয়ে হাত নাড়ে, আর একজন এগিয়ে আসে, "সব বন্দোবস্ত হো গিয়া, আপ কুছ চিন্তা মত কিজিয়ে, হামলোগ আ রহী হ্যায় —।" এ কথা বলে প্রায় সবাই ব্যস্ত হয়ে কলকাকলিতে চারপাশ মুখরিত করে বেরিয়ে পড়ে, অভীর উত্তরের অপেক্ষা না করে। যেন তাদের সব প্রশ্নের সকল উত্তর সোমার কাছেই তারা পেয়ে গেছে। অভীর অনুরোধ

সত্ত্বেও চা খাবার জন্য তারা অপেক্ষা করতে পারে না। তাদের তাড়া আছে বোঝা যায়।

অভী হাসপাতালে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে হাসিমুখে একটু আড়ষ্টভাবে সোমার কাছে এসে দাঁড়ায়। সোমা অল্পক্ষণ কেশে ধীর গলায় বলে, "তুমি কখন ফিরবে।"

অভী ঘড়ি দেখে, "কোন ঠিক নেই। তুমি কী যাবার কথা ভাবছ?"

সোমা সম্মতিসূচক মাথা নাড়তেই অভী চিন্তিত হয়, "এই শরীর নিয়ে এতখানি রাস্তা পাড়ি দেবে! পারবে? আমার তো সন্দেহ হচ্ছে!"

সোমাও এ ব্যাপারে খুব নিশ্চিত নয়, অনেকদিন পর তার এই ধরনের খারাপ অবস্থা তৈরি হল, "আসলে এরা সঙ্গে রয়েছে এটাই ভরসা, এদের সঙ্গে চলে যেতাম, নইলে আবার কে আসবে, চিঠি দিয়ে শেষতক প্রদীপকে ডাকতে হবে।"

সোমার কুণ্ঠা দেখে অভী হাসে তারপর এক নিশ্বাসে বলে যায়, "আর তাতে প্রদীপ মোটেই খুশি হবে না, এই তো ভাবছো। ভাববে কী সব বাজে খরচা। তা সে তোমাকে নির্বিঘ্নে পৌঁছে দেওয়া কোন সমস্যা হবে না। তুমি বরং ওদের হাতে একটা চিঠি দিয়ে দিন দুয়েক দেখো। যদি প্রদীপ না জ্বলে, কোন আলো দেখা না যায়, তাহলে একটা ব্যবস্থা করা যাবে। কাল তোমার যে রকম শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল, আমি তো বেশ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম, ঠিক সেই আগের বারের মত। তবে বুকের ছবিতে কোন গোলমাল নেই। সব মিলিয়ে ভাবছি, রাস্তায় যদি আবার অসুস্থ হয়ে পড়, অনেকখানি রাস্তা তো।"

সোমা দুর্বল দেহে হেসে ওঠে, "আগের বারের কথা তোমার এখনো মনে আছে দেখছি? এখানে তোমাকে দেখে আমিও কিছুটা নিশ্চিন্ত হলাম। নইলে এত তাড়াতাড়ি আমার কষ্ট কমতো না। থ্যাঙ্ক য়্যু। অনেকদিন পর এমন হল।"

অভী নিঃশব্দে তার হাত ব্যাগটায় কিছু কাগজপত্র গোছায়, সোমাও নিরুত্তর থাকার পর হঠাৎ কী ভেবে উঠে বসে, "চলেই যাই বুঝলে।"

অভী হাসে, "ভাবছো অশান্তি হবে, বেশ যদি যাও তাহলে ঐ মেয়েটাকে দিয়ে আমাকে হাসপাতালে একটু খবর দিও, তোমার ওষুধগুলো ঠিকঠাক মত খেয়ো। ইনহেলারটা ঐখানে আছে।" তারপর হঠাৎ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, "আমাদের খাবার এখানকার সাধারণ রান্নাঘর থেকে আসে।"

হঠাৎ ঘরের ভিতরের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বলে, "আর এপাশে একটা ছোট রান্নাঘর আছে, আমরা চা বানাই আর খাবার গরম করে খাই।"

সোমা নিঃশব্দে মাথা নাড়তেই ঘড়ি দেখে অভী, আর অপেক্ষা করার ভরসা পায় না, বেরিয়ে পড়ে। দুজনেই দ্বিধাগ্রস্ত তবু সোমার চলে যাবার ব্যাপারে আর কোন কথা কেউই বাড়াতে চাইছিল না।

হাসপাতালে সারাক্ষণ অভীর নানা কথা মনে ভেসে উঠেছে, অনেক সময়ই তার মনটা চঞ্চল ও অন্যমনস্ক ছিল। উৎকর্ণ হয়ে সে আশা করেছে, এই বোধহয় ঘর থেকে ডাক এলো। সোমা কী চলে যেতে পারবে?

এখানকার সফর এত-লম্বা যে তা যেন শেষই হতে চায় না।

প্রথম প্রথম অভীর তো সাহারা মরুভূমি মনে হত। সামান্য কোথাও বেরুলেই সারাদিন লেগে যায়। শুধু মনে হত, এ পথের যে কোথায় শেষ, কখন যে আসবে গন্তব্যস্থল। বাইরের চলমান প্রকৃতির দৃশ্যও তখন আর ভাল লাগত না। শুধু মনে হত, কখন গিয়ে পৌঁছাব আমার আশ্রয়স্থলে।

আর এখন গা-সওয়া হয়ে গেছে। অনেক সময় গাড়িতে উঠে সে ঘুমিয়ে পড়ে। লম্বা সফরে লম্বা ঘুম। কিন্তু রাস্তা তোমায় জানান দিতে ছাড়বে না — সর্বক্ষণ বলতে থাকবে, আমার ওপর দিয়ে যাচ্ছিস, আমার কষ্ট হচ্ছে না!

এই রাস্তার ওপর দিয়ে এতখানি সময় ধরে সোমা যাবে। অনেকটা যাবার পর পাবে রেলের রাস্তা।

কিন্তু ফিরে আসার সময় পর্যন্ত যখন অভী ঘর থেকে কোন ডাক পেল না তখন সে একটু আশ্চর্যই হল, হতাশও হল। তাহলে সোমা না বলে চলে গেল। হয়তো ওদের তাড়া ছিল, কোনভাবে যোগাযোগ করতে পারেনি। তবু অভীকে হাসপাতালে অনেক কাজ করতে হয়েছে, তাই তার ফিরতে দেরি হল।

ফিরে দেখে দরজা খোলা, পর্দা সরিয়ে উঁকি দিতেই চোখে পড়ে বিছানায় শুয়ে নিবিষ্ট মনে সোমা বই পড়ছে।

এক অভূতপূর্ব আনন্দে অভীর সারা দেহ-মন যেন পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে, উদ্বেলিত হয়ে ওঠে সমস্ত শরীর।

সে আনন্দ কিসের তা অভী কাউকে বোঝাতে পারবে না, সারা দেহে কৃতজ্ঞতার ভাষায় তাই সে প্রকাশ করে ফেলে, "ও তুমি তাহলে যাওনি? আমি ভাবলাম চলে গেছো!" জলের জগটার দিকে অভী হাত বাড়ায়।

সোমা হাসিমুখে তাকায়, "এতটাই অকৃতজ্ঞ ভাবছো।"

অভী অপ্রস্তুতে পড়ে যায়, "না, আসলে তোমার ওখানকার অবস্থাটা তো ঠিক জানি না। এখন বুঝতে পারি, আমাদের মেয়েদের অনেক কিছু সামলে চলতে হয়। ঘরে-বাইরে তাদের সমস্যার শেষ নেই। আমাদের এখানে মহিলা কর্মীদের মধ্যেই দেখি। এখনো পুরুষরা তাদের কাজে বেরুতে দিতে চায় না।"

তারপর ব্যস্ততা দেখিয়ে অভী বলে, "নিশ্চয়ই তুমি খাওনি। দাঁড়াও খাবারটা গরম করি।"

সোমা বই থেকে মুখ তুলে তাকায়, "গরম করে আমি বাচ্চাটাকে খাইয়ে দিয়েছি। ও কোথায় গেল?"

অভী কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে, "আহা! এই অসুস্থ শরীরে তোমার এসব করার কী দরকার ছিল! ও, চাঁদনী চলে গেছে। হ্যাঁ, ওর কতকগুলি ছাগল আছে ও চরায়, তারপর দর্জির কাজ শিখতে যায়। তাহলে আমি শুধু হাতমুখ ধুয়ে বসে পড়ব। বেশ ভাল কথা। কী বই পড়ছ তুমি, দেখি। ও, গৌরীদার বই।"

বোঝা যায় সোমার শরীরটা এখনও দুর্বল, সে ধীর লয়ে বিছানা ছাড়তে ছাড়তে বলে, "অপূর্ব।" তারপর চুলটা হাত দিয়ে এলোখোঁপায় জড়িয়ে নেয়, "তোমায় খুব স্নেহ করেন, না?"

কী যেন ভাবতে ভাবতে অভী তাকায়, "খুবই, মানে আমার হয়তো ততখানি পাওনাই নয়।"

তারপর দূরে দাঁড়িয়ে অভী মিটিমিটি হাসে, "একটা কথা বলব, কিছু মনে করবে না।"

সোমা অবাক হয়ে তাকায়, "বল না, কী কথা।"

অভী বেশ গম্ভীর মুখে তাকায়, "ঘরে ঢুকেই একটা পরিচিত স্মৃতি আমায় অনেক কথা মনে করিয়ে দিল। সেটা তোমার গায়ের গন্ধ।"

সোমা লজ্জায় লাল হয়, "বিচ্ছিরি, ওটা তো আমার সঙ্গে মৃত্যুর আগে অব্দি ঘুরবে। ওটাকে কোথায় ফেলে দেব বলো।"

অভী প্রসঙ্গ পাল্টায়, "আচ্ছা, খাওয়া হয়ে যাক্, তারপর তোমায় একটা জিনিস দেখাবো।"

খেতে গিয়ে খাবার বস্তুগুলির দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে অভী অনর্গল কথা বলে, "এইসব তোমার খেতে খুব কষ্ট হবে, তাই না?" সোমা একটা গ্রাস মুখে তুলে মাথা ঝাঁকায়।

অভী বলে, "আসলে এদের খাবারই এমনি। তাও জানবে অনেক সংস্কৃত করা হয়েছে। আগে তো ছিল এক হাঁড়ি পান্তা আর তার পচানো জল। সঙ্গে তুমি একটু নুন পাবে — ব্যস। অবশ্য ঐ পান্তার জলই ছিল খাদানে এদের তৃষা হরানোর একমাত্র পানীয়। পানীয় জলের এত সমস্যা ছিল। জল না পেয়ে কত লোক মারা যেত। এই কিছুদিন আগেও বস্তারে কলেরায় পাঁচ হাজার লোক মারা গেছে। এই আমাদের সভ্য দেশ!"

সোমা চুপ করে শুনে যায়, কী ভাবছে বোঝা যায় না।

অভী প্রসঙ্গ পাল্টায়, "নিয়োগীজী এসে এদের শাক-সবজি খেতে শিখিয়েছেন, এখন তুমি সর্বত্র এদের বস্তির আশে-পাশে সবজির ছোট ছোট ক্ষেত দেখতে পাবে।"

তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে অভী আবার শুরু করে, "নিয়োগীজী নতুন নতুন রান্না খুব ভালবাসতেন, নিজে করতেনও। একবার ঝিঙে পোস্ত নিয়ে খুব বিভ্রাট হয়েছিল। যেখানে যেতেন একটা নতুন রান্না শিখে আসতেন আর তাই নিয়ে আমাদের গল্প হত। কেমন করে সেটার ব্যবস্থা করা হবে, কোথায় হবে, কতজন তাতে থাকবে — এইসব নিয়ে নানা পরিকল্পনা

হত; কিন্তু সে আয়োজন আর কোনদিনই হয়ে উঠত না।"

হঠাৎ সোমার দিকে তাকিয়ে সে বলে, "আরে, তুমি তো কিছুই খাচ্ছো না? একটু কিছু না খেলে তো দুর্বল হয়ে পড়বে। দেখি, ওবেলা অন্য কিছু ব্যবস্থা করা যায় কিনা!"

সোমা জল খেতে গিয়ে বিষম খায়, ঢোক গেলে, "না না, কোন ব্যবস্থা করার দরকার নেই। তুমি একেবারে এই নিয়ে ভাববে না। এমনিতে তুমি সারাদিন নানা কাজে ব্যস্ত থাকো তার মাঝে এসব, ঐ জন্যেই আমি থাকতে চাইছিলাম না। এখানে থাকা মানেই তোমার ঝক্কি বাড়ানো।"

সোমা সহজ হয়ে এই কথাগুলো বলছে এটা দেখে অভী হাসিমুখে তাকায়, "আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি যা পার একটু খাও, না খেলে দুর্বলতা কমবে না।"

সোমা বাঁ হাত দিয়ে মুখের ওপর এসে যাওয়া চুলগুলো সাবধানে সরায়, "আসলে এখানে আসার কয়েকদিন আগে জ্বর হল। শরীরটা এমনিতেই দুর্বল ছিল। প্রদীপ চাইছিল না আমি বেরোই, ওর বোনের বিয়ের তারিখ ঠিক করার জন্য লোকজন আসবে। আমি থাকলে সবটা সামলাতে পারব। কিন্তু আমার একেবারে ভাল লাগছিল না। প্রায় জোর করেই বেরিয়ে এসেছি। সম্মেলনে কী যে হল, শুধু মনে হচ্ছিল চারপাশে একটা দমবন্ধকর পরিবেশ। ঠিকমত শ্বাস নিতে পারছিলাম না। ভাগ্যিস, তুমি এখানে ছিলে নইলে আমার কী যে কষ্ট হত!"

অভী হাসে, "ভাগ্যিস এমনটি হল তাই আবার দেখা হল।"

সোমা সে কথায় কান না দিয়ে জানলার দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবে, "তোমার কথা প্রদীপ জানে, আমি বলেছি ওকে, থেকে গেলাম। এর প্রতিক্রিয়া হয়তো পরে হবে। কী ভাববে, কী জানি — বাদ দাও তো যা হয় হবে। তুমি এসব নিয়ে একেবারে ভাববে না।"

দরজায় কড়া নাড়ার শব্দে অভী উঠে দাঁড়ায়, পর্দা সরিয়ে উঁকি মারে, ফিরে এসে বলে, "হাসপাতাল যেতে হবে, ডেলিভারি কেস, আটকে গেছে।"

সোমা যেন একটু অবাক হয়ে তাকায়, "তুমি কী করবে, এখানে সিজার কর নাকি!"

অভী মুখ তুলে সোমার দিকে তাকায়, বুঝতে পারে, সোমা অনেক সহজ হয়ে এসেছে তাই সে সহজভাবে হাসে, "সব সবই এখানে করতে হয়, জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ। সিজারটা বন্ধুদের কাছে ইডেন হাসপাতাল থেকে ভাল করে শিখে এসেছি। এই প্রসবের ঝামেলা থেকেই তো এখানকার হাসপাতালের উদ্যোগ। এখানকার একজন নেতৃস্থানীয়া প্রসব হতে গিয়ে মারা যান। তখন শ্রমিক কমরেডরা প্রতিজ্ঞা করে যে এখানে হাসপাতাল বানিয়ে ছাড়বে।"

তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করতে চায় অভী, তার খাওয়ার দিকে সোমা একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে, "তোমার পেট ভরল!" মাথা নেড়ে অন্যমনস্ক অভী খেয়ে যায়।

মুখে হাত চাপা দিয়ে সাবধানে ঢেকুর তুলে সোমা বলে, "এই হাসপাতালটা কী তোমরা চালাও, এই হাসপাতালের নামে অনেক কিছু কাগজে পড়েছি, অনেকের কাছে শুনেছি।"

অভী খুশি মনে হেসে ওঠে, "কিন্তু এখানে যে আমি আছি তা তুমি জানবে কী করে। না, এটা আমরা চালাই বললে খুব বাড়াবাড়ি করা হয়। প্রথমত এটা একশ' ভাগ শ্রমিকদের

টাকায় তৈরি। দ্বিতীয়ত, এর প্রতিটি ইট কোথায় গাঁথা হবে তা নিয়োগীজী ঠিক করেছেন। তুমি বলতে পার, এখনও এখানে ডাক্তারটা বাংলা সাপ্লাই দেয়। বাংলা বললে ভুল বলা হয়, কলকাতা সরবরাহ করে; আত্মম্ভরী, ভাগ্যান্বেষী, পল্লবগ্রাহী, সবজান্তা কলকাতা।''

সোমা হাসে, "একেবারে ঠিক বলেছো, কলকাতার লোকেরা তো অন্যদের মানুষ বলেই গণ্য করে না।"

অভী যেন সে কথায় মন না দিয়ে অন্যমনস্ক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে, "একবার সল্টলেকে মেজদার বাড়িতে বসে আছি। শুনি বৌদি স্কুল ফেরত ভাইপোকে বকাবকি করছে, হাতিবাগানের স্কুল থেকে জল আনেনি বলে।"

সোমা অবাক হয়ে তাকায়, "কেন?"

অভী মাথা নিচু করে উত্তর দেয়, "ওখানকার জলে ডাল সেদ্ধ হয় না। তাই পুরানো কলকাতার জল চাই।" সোমা হেসে ওঠে।

অভী তার দিকে বড় বড় দৃষ্টি মেলে বলে, "বাঙালি কমিউনিস্টদের এখন নতুন নাম কী হয়েছে জান, ভ্যাঙ্গালি কামিয়েনিস্। মানে ঐ মার্কসটা বাদ পড়ে গেছে।"

সোমা তার দিকে তাকিয়ে বলে, "আগে কী এর থেকে ভাল কিছু ছিল?"

অভী বেশ আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে বলে, "তা ছিল বৈকি, এমন ডজন খানেক মানুষের নাম এক্ষুনি তোমায় বলতে পারি যাঁদের দেখে যে কেউ সসম্ভ্রমে মাথা নত করত।" বলে সে থালা তুলতে যায় সোমা তাকে বাধা দেয়, অভী অবাক হয়ে তার দিকে তাকায়। সোমা বলে, "হ্যাঁ ঐ ডজন খানেক লোককে তুলে নাও, তাহলেই কলকাতা হয়ে যাবে বৌবাজারের মোড়ের 'বাঙালি পাঁঠার দোকান'।"

হাসপাতাল থেকে ফিরে ঘরে ঢুকতেই সোমা বলে ওঠে, "কী এত তাড়াতাড়ি চলে এলে?"

অভী জল খায়, "বুঝতে পারছ না, মনটা এখানে পড়ে আছে। না, সিজারের দরকার হল না, আমি যেতে যেতেই কাজ শেষ। তবে সবাই প্রস্তুত হয়ে ছিল।"

একটু ঘুরে দাঁড়িয়ে সন্ধানী দৃষ্টিতে অভী তাকায়, "আচ্ছা, একটা কথা মনে যখন হচ্ছে, বলব?"

সোমা তার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়তেই অভী হঠাৎ বলে বসে, "কেন গেলে না?"

সোমা যেন একটু অপ্রস্তুত হয়, সেটা কাটিয়ে ধীর গলায় বলে, "কী উত্তর পেলে তুমি খুশি হবে।"

অভী হাসিমুখে তাকায়, "যাতে আমার আত্মবিশ্বাস বাড়ে।"

সোমা বইয়ে মন দেয়, "ধর তাই।"

অভী যেন জয় করার হাসি হাসে, "তবু এই কথাটা তোমার গলায় শোনার একটা আলাদা

মাধুর্য আছে।"

তারপর অভী আলমারির কাছে এগিয়ে গিয়ে বলে, "না, ভাবছিলাম এইজন্য তোমাকে আবার ভুগতে না হয়।"

সোমা দীর্ঘশ্বাস ফেলে গায়ের চাদরটায় মৃদু চাপড় দেয়, "কী আর হবে? কারো খাইও না, পরিও না।"

অভী জ্বলজ্বলে চোখে তাকিয়ে বলে, "গুড, কিন্তু কারো সঙ্গে সংসার তো কর।" তারপর যেন তার হঠাৎ কিছু একটা মনে পড়ে যায়, সে উঠে দাঁড়ায়, "দাঁড়াও গৌরীদার চিঠিটা তোমায় পড়াই।"

আলমারি খুলে একটা কাগজ বার করে সেটা সোমার হাতে দেয়। সোমা তাতে একবার চোখ বুলিয়ে বলে, "বাঃ তোমার গৌরীদার হাতের লেখা তো চমৎকার।"

দীর্ঘশ্বাস ফেলে অভী বলে, "হ্যাঁ মানুষটি সব কাজই করেন এমনি খুব যত্ন নিয়ে। তুমি ওটা পড় তাহলে আমারও একবার শোনা হবে।"

সোমা একটু কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিচু স্বরে পড়তে শুরু করে। অভী তাকায়, "দাঁড়াও তোমার এখনও শ্বাসকষ্ট রয়েছে, ওষুধ খেয়েছো, পড়তে কষ্ট হলে দাও আমি পড়ি।" সোমা হাত নাড়ে —

কল্যাণীয়েষু,

তোমার পর পর কয়েকটি চিঠির উত্তরে অনেক কিছু লিখব ভেবে উত্তর দিতে দেরি করছিলাম। কিন্তু এখন লিখতে গিয়ে মনে হচ্ছে — সব মানসিক আঘাতে সান্ত্বনার প্রলেপ দেওয়া চলে না। নৈর্ব্যক্তিকভাবে দু'একটা কথা লিখছি। এই কথাগুলো বোধহয় সেদিন সবই তোমাকে বলেছিলাম। তা হোক, পুনরুক্তিতে বরং তোমার ভাবনাচিন্তার সুবিধাই হবে।

রোমান্টিক প্রেম বুর্জোয়া সভ্যতার একটা অবদান। প্রেম চিরকালই একই রূপে ছিল না। মেয়েরা রামায়ণ-মহাভারত-ইলিয়াড-ওডিসির যুগ থেকেই সম্পত্তি হিসেবে পুরুষের কাছে মূল্যবান ছিল। রোমানদের স্ত্রী ছিল সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র আর ভালবাসা ছিল পুরুষ প্রেমিকদের জন্য। রোমান্টিক প্রেম রোমান্টিক সাহিত্য-শিল্পের সমসাময়িক।

এই প্রেম খুবই ক্ষণস্থায়ী, তাই এত মহার্ঘ। তাই কাব্যে, শিল্পে-সাহিত্যে এর এত স্তব, এত কদর। সূর্যোদয়, সূর্যাস্তের মত বর্ণাঢ্য; কিন্তু স্থায়িত্ব খুবই কম। প্রেমকে চিরস্থায়ী করা যায় না; তবে ধরে বেঁধে আইনসম্মত করা যায়। সেটা তাড়াতাড়ি না করলে এইরকমই ঘটে। এটাই স্বাভাবিক; অন্তত আমি অনেক এই ধরনের ঘটনা জানি। এটা তবু ভাল। বিয়ের পর প্রেমসমাপ্তি এবং বিবাহবিচ্ছেদের চেয়ে এটা বরং ভাল।"...

চিঠিটা পড়া হয়ে গেলে সোমা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চিঠিটার দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর স্বগতোক্তির মত বলে, "এই পরিণতি!"

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতার পর অভীক মুখ খোলে, "এই প্রেম, রোমান্টিসিজম, বিপ্লব —

এইসব নিয়ে গৌরীদার সঙ্গে আরও অনেক কথা হয়েছে। কারণ আদপে তিনিও রোমান্টিক; কিন্তু আমার মত উদ্‌ভ্রান্ত নন। তিনি ভিক্টোরিয়ান যুগের মানুষের মত নিজের গোপন ভাবনাচিন্তাগুলিকে যতখানি সম্ভব অপ্রকাশ্য রাখতে পারেন।"

অভীকের বলার ধরনে সোমা হেসে ফেলে, "আবার উদ্‌ভ্রান্ত বলেই তুমি এত বিচিত্ররঙা।"

"হ্যাঁ দ্রুতসঞ্চরণের অধীরতা যেন আমার অস্থিতে মজ্জায়। কোথাও সুস্থিরে থাকতে পারি না। তখনই মনে হয় এটা করি, আবার মনে হয় এটা করা হল না।"

তাকে থামিয়ে দিয়ে সোমা বলে, "এখানে কতদিন আছো?"

অভীক হিসাব করে, "তা ভোপাল আর এখান মিলিয়ে প্রায় সাত বছর।"

সোমা হাসে, "তোমার চরিত্র অনুযায়ী এটা একটা বলার মত কথা নিশ্চয়ই।"

অভী চশমার কাচ মোছে, "তা বলতে পার। তবে একটা পরিবর্তন নিজের মধ্যে বুঝতে পারি। এখন যেন মনটা কেমন একটা স্থিতি খোঁজে।"

সোমা কৌতূহলের দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকায়, "ঘর বাঁধার কথা মনে হয়?"

"দাঁড়াও তার আগে গৌরীদার কথাটা বলেই নিই, নইলে রেশটা কেটে যাবে।"

তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, অসম্ভব পণ্ডিত মানুষ আর নিঃসঙ্গ। নিজে যা মনে করেন প্রায় সেটাই চূড়ান্ত। কারো সঙ্গে তর্ক করবেন না, নীতি-আদর্শ নিয়ে কারো সঙ্গে কোন উচ্চবাচ্য করবেন না। যদি তোমার সঙ্গে মিলে গেল তো ভাল, তুমি হয়ে যাবে অত্যন্ত কাছের মানুষ। তখন তোমার ভুল-ত্রুটিও তিনি দেখতে পাবেন না। কিন্তু যদি তুমি তর্ক শুরু করে দাও তাহলে তোমার কাছ থেকে তিনি সরে গেলেন; তবু কখনো তর্ক করবেন না। ভাবতে পারো, তোমার কথা উনি চুপ করে শুনবেন; কিন্তু উনি তর্ক করবেন না।"

দু' হাত আকাশে তুলে বলে, "এই হচ্ছে আমাদের গৌরীদা — সত্তর সালের আগুনখেকো বিপ্লবী, যাঁকে পুলিস ঠিক করেছিল গুলি করে মেরে দেবে, যাঁর বাড়ি ছিল বিপ্লবীদের জন্য অবারিত দ্বার। প্রয়োজনে ঘুঁষি মেরে একটা দশাসই জোয়ানকে ফেলে দেওয়া তাঁর কাছে কিছুই না। আর এখন জীবনের অর্থ খোঁজার জন্য তিনি রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ প্রমুখের ধর্মতত্ত্বের দিকে ঝুঁকেছেন।"

সোমা আগ্রহী হয়ে অভীর দিকে তাকায়, "বেশ অন্য ধরনের মানুষ তা তোমার কথা শুনে বোঝা যায়; কিন্তু তোমার সঙ্গে আলাপ হল কী করে?"

অভী হাসে, "সেটা দুর্ঘটনাই বলতে পার। আমাদের বার্নাল-বিশেষজ্ঞ, বারেন্দ্র আশীষের সঙ্গে হঠাৎ একদিন কলেজ স্ট্রীটে কথাশিল্প বইয়ের দোকানে দেখা। ওখানেই ওদের আড্ডা, **অন্বেষা** নামে ওরা একটা বিজ্ঞান-পত্রিকা চালায়। আমায় দেখে সে তো ছাড়বে না। তারপর বলল, আসুন গৌরীদার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দি-ই। ওরই ভেতরের দিকে **ফ্রন্টিয়ার** কাগজের একটা লেখা নিয়ে কার সঙ্গে গৌরীদা আলাপ করছিলেন। আশীষ আমার সঙ্গে তাঁর আলাপ করিয়ে দিল। কথা বলে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম, এই হচ্ছে সম্পর্ক-সূত্র।"

তারপর একটা ফাইল থেকে অভী কয়েকটা পুরানো কাগজ বার করে, "হুঁ হুঁ, এই লেখা দুটো চিনতে পারো।" উত্তেজিত হয়ে বিছানায় আধশোয়া সোমার চোখের কাছে একটা কাগজ তুলে ধরে।

সোমা দুর্বল চোখ দুটো খুলে তাকায়, ঈষৎ জীর্ণ কাগজ দুটো কাঁপা কাঁপা হাতে ধরার চেষ্টা করে, চিনতে পারে। সোমা ম্লান হাসে, "আচ্ছা পাগল, এসব তুমি আবার যত্ন করে রেখে দিয়েছো।"

অভী জ্বলজ্বলে দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে, "এ আমার পরম ধন।" কথাটা শুনে যেন সোমা একটু খুশি হয়, "পড়।"

অভী পাশে বসে পড়তে শুরু করে, "... মন দিয়ে মন পেতে চাহি, ওগো কেন মিছে এ দুরাশা।। ... Speak ! though this soft warm heart once free to hold ... Than a forsaken bird's-nest fill'd with snow..." .

তারপর উদাস হয়ে অভী কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে, চোখদুটো হাত দিয়ে রগড়ে পরিষ্কার করে বলতে শুরু করে, "জানো আমি কতদিন ভেবেছি, তুমি কেমিস্ট্রি নিয়ে পড়াশোনা করে ওয়ার্ডসওয়ার্থের খবর পেলে কী করে!"

সোমা দুর্বল স্বরে হাসে, "হল কালেকশন।"

অভী মাথা নাড়ে, "না, এ জিনিস হল কালেকশন করে হয় না। আমি গৌরীদার কাছে পরে শুনেছি এই সনেটটির নামকরণ করেন পলগ্রেভ, *To A Distant Friend* — এও এক মজার ঘটনা।"

অভী হেসে বলে, "আমি গৌরীদার কাছে কবি জীবনানন্দের মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে গেছি, 'পাখির নীড়ের মত চোখ তুলে' এইসব বলে। তখন গৌরীদা আলমারি থেকে একটা বই টেনে নিয়ে বললেন, তাহলে এর উৎসটা শোন। আমি তো শুনে অবাক, এই বস্তুটি আমায় সোমা লিখে দিয়েছিল। একথা তো আর গৌরীদাকে বলতে পারি না; কিন্তু মনে মনে ভেবেছি সোমা তখন এত পরিণত হয়ে উঠেছিল!"

সোমার মুখটা লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে।

অভীক বলে চলে, "সত্যি তারপর আমি ভেবেছি, টীকা-ভাষ্য ছাড়া প্রেম-ভালবাসা উপলব্ধি করার ক্ষমতাও আমাদের নেই। ঐ কারণে মার্কসবাদেরও এত দুর্দশা। সর্বত্র আমাদের মধ্যস্থতাকারী লাগে, টীকা-ভাষ্য লাগে।"

হঠাৎ হেসে উঠতে গিয়ে কাশির দমকে সোমা বিষম খায়, অভীক দু'হাত দিয়ে তার ডানা দুটো ধরে ফেলে। তারপর তাকে বিছানায় সাবধানে শুইয়ে দিয়ে সোমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে।

সোমা স্বাভাবিক হয়ে এলে অভী সরু গলায় প্রায় স্বগতোক্তির মত বলে, "অবশ্য টীকা-ভাষ্য থাকলেই যে আমরা এই গণ্ডমূর্খরা সব বুঝতে পারি, এমন ভাবারও কারণ নেই।

তাহলে আমরা এতদিনে নিয়োগীজীকেই বুঝতে পারতাম।"

বাইরে কড়া নাড়ার আওয়াজ হয়।

বাইরে কথা বলে ফিরে অভীক একটু অন্যমনস্ক হয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে চেয়ারে বসে থাকে।

সোমা জিজ্ঞাসা করে, "কিছু সমস্যা হয়েছে?"

অভী তার দিকে তাকিয়ে থাকে, "না তেমন কিছু না, এমন সমস্যা তো আমাদের নিত্যদিনের সঙ্গী, প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে লড়াই করে টিকে থাকতে হয়, তেমন কিছু না।"

তারপর সোমার আগ্রহ দেখে বলতে শুরু করে, "নতুন একটি ডাক্তার এসেছে ভোপাল থেকে এখানে কাজ করার জন্য। ও আবার নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের সঙ্গেও যুক্ত। ফলে তার হাতে-কলমে লড়াই করার অভিজ্ঞতা আছে। তাকে নিয়ে একটু সমস্যা হয়েছে। হবেই, আমরা এক একজন এক এক পরিবেশে কাজ করতে অভ্যস্ত, ফলে মানিয়ে নিতে, পরস্পরকে বুঝতেও সময় লাগে।" এই বলে কাগজ-কলম টেনে লিখতে শুরু করে।

হঠাৎ মুখ তুলে বলে, "আমি কেন, এখানে আমরা কেউই সাধারণত কারো কাজে নাক গলাই না; কিন্তু যখন দেখি রোগীর অসুবিধা হবে তখন মাথা ঘামাতেই হয়। এই ব্যাপারটা সবাই ঠিকমতো অনেক সময় মেনেও নেয় না।"

তারপর সোমার দিকে আঙুল তুলে বলে, "আর একটা কথা মনে রাখবে চিকিৎসকরা এক অদ্ভুত জাত। তাদের অহঙ্কার এত বেশি যে অনেক সময় তারা কোন কথা শোনার মত অবস্থাতেও থাকে না। রোগীর রোগ সারছে পাশাপাশি চিকিৎসকের অহঙ্কার বাড়ছে। এটা কোথায় হবে বিজ্ঞানীর আত্মবিশ্বাস, তার বদলে হয়ে দাঁড়ায় গগনচুম্বী আত্মম্ভরিতা। আবার ভাবি, চিকিৎসকরাও তো এই সমাজেরই মানুষ, সুতরাং চারপাশের খারাপ জিনিসগুলোও তার মধ্যে ঢুকবে এবং তাকে কলুষিত করবে। অবশ্য এর জন্য সময় দিতেই হয়। সুতরাং ...।"

এই কথা বলে সে একবার কাগজ-কলম টেবিলে রাখে। তারপর আবার কী কথা মনে হয়, সেটা টেনে নেয় মুখ নিচু করে বলে, "দ্বিধাগ্রস্ত চরণবিক্ষেপ।"

তারপর তাতে কিছু লিখে, মুখ তুলে সোমার দিকে তাকিয়ে বলে, "ধর, এই চিকিৎসার ব্যাপারে কেউ একটা ভুল জিনিস এতদিন ধরে জেনে বুঝে এসেছে। কিন্তু তুমি তার সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে বুঝতে পারছ পদে পদে অসুবিধা হচ্ছে। এখন যদি তাকে তুমি তার ভুলটা সংশোধন করতে যাও, তাহলে তাকে আঘাত দিলে তো চলবে না।"

সোমা যোগ করে, "ধীরে-সুস্থে তাকে বোঝাতে হবে। পাঁচজনের কাজের নিয়মই তাই।"

অভী মাথা নাড়ে, "এখানে সব থেকে বড় সমস্যা হল, শহীদ হাসপাতালের কর্মীরা চিকিৎসকদের কাজের কৈফিয়ৎ চায়, সামনাসামনি। এই পরিবেশটা আমরাই এখানে তৈরি করেছি। প্রত্যেককে বলা আছে, কাজ করতে গেলে ভুল হবে; কিন্তু যত তাড়াতাড়ি সম্ভব

ভুলটা সংশোধন করতে হবে। কারণ আমরা এখানে কেউ নিজের ব্যক্তিগত কাজ করছি না। সবাই মানুষের জন্য কাজ করতে এসেছি। ঠিক এইরকম অবস্থা নতুন কোন ডাক্তারের পক্ষে মেনে নেওয়া বেশ কষ্টকর। কারণ সে এইভাবে কাজ করতে অভ্যস্ত ছিল না।"

সোমা এতক্ষণ ধৈর্য ধরে শুনছিল, এবার জিজ্ঞাসা করে, "সমস্যাটা কী হয়েছে?"

অভী হাসে, "তোমায় কী করে বোঝাই। ধর, এখানে চিকিৎসকরা কী কী ওষুধ ব্যবহার করবেন তার একটা তালিকা করা হয়েছে, তা করা হয়েছে সবার সঙ্গে আলোচনা করেই। কারণ এটা নিশ্চয়ই জানো, আমাদের দেশে সম্ভবত সব থেকে আজেবাজে ওষুধ বাজারে চলে, তা প্রায় ষাট হাজার ধরনের। অথচ খুব বেশি হলে তিনশো ধরনের ওষুধ হলেই আমাদের চলে যায়। কোন চিকিৎসক নতুন কিছু ওষুধ লিখলেই কর্মীরা প্রশ্ন করবে, তাই নিয়ে অবধারিত গোল বাধবে। কারণ চিকিৎসকের ধারণা, তিনিই একমাত্র এই বিষয়ে বিচার করার অধিকারী।"

সোমা কী চিন্তা করে বলে, "সে তো ডাক্তারদের বিচারের তফাত হবেই।"

অভী হাসে, "যাক্ এ আমাদের চিকিৎসকদের নিয়ে অনন্তকালের লড়াই, অত সহজে মেটবার নয়। এই ডাক্তার ছেলেটি একজন রোগীর এমন কিছু ল্যাবরেটরি পরীক্ষানিরীক্ষা করতে বলেছে, তাই নিয়ে যথেষ্ট সংশয় তৈরি হয়েছে। দাঁড়াও যে কথা তোমায় বলছিলাম।" সে কাগজটায় লেখা শেষ করে বাইরে অপেক্ষারত কাউকে দিয়ে আসে।

ফিরে এসে সোমার দিকে তাকিয়ে বলতে শুরু করে, "হ্যাঁ, ঠিক ঘর বাঁধার কথাই যে মনে হয় তা নয়। এখনও জানি না, এ জীবন লইয়া কী করিব? জীবনের তো একটা লক্ষ্য থাকে, উদ্দেশ্য থাকে। আমি মাঝে মাঝে ভাবি, আমার জীবনের উদ্দেশ্য কী! এই সমাজে বঞ্চিত, দুঃস্থ, নিপীড়িত মানুষদের জন্য কাজ করা এবং তার সঙ্গে নিজের মত করে সারাজীবন বেঁচে থাকা — এই কথা দুটিকে আপন জীবনে মেলানো বড় সহজ কথা নয়। বয়েস কম থাকার ফলে আগে হয়তো গায়ের জোরে সব কিছুকে অস্বীকার করতাম। কিন্তু এখন আর নিজেকে বিশ্বাস হয় না।"

সোমা গালে হাত দিয়ে জিজ্ঞাসা করে, "আগে কী এইরকম করে ভাবতে?"

অভী একটু চুপ করে বলে, "ভাবতাম, হয়তো এতখানি গুছিয়ে নয়। এখন ভাবি, সংশয় হয়, এইভাবে সারাজীবন কাটিয়ে দিতে পারব তো! পরে মনে হবে না তো, এতদিন যা করেছি ভুল করেছি। বিশেষ করে নিয়োগীজী মারা যাবার পাঁচ মাস পর এই ভাবনাচিন্তাগুলো যেন আরও প্রবল হয়ে উঠছে। প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতি করব না, এটা ঠিক করে নিয়েছি। কিন্তু নিয়োগীজী থাকাকালীন এটা বুঝতাম যে তিনি আমার, আমাদের সাহায্য চান, সাহচর্য চান। এখন তো সেটা চাওয়ার কেউ নেই। এখানকার চাহিদা হল সম্পূর্ণভাবে নেতৃত্বের হাল ধরা। কিন্তু তা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।"

সোমা তাকায়, "সম্ভব নয় কেন? তোমরা তো ওতপ্রোতভাবে এখানকার প্রতিদিনের কাজের সঙ্গে যুক্ত আছো।"

অভী গামছায় মুখ আর চশমার কাচটা মোছে, একটু সময় নেয়, "আসলে কোন একটা ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর সেটা থিতিয়ে যেতে সময় লাগে। এখন এই ব্যাপারে আমি যেভাবে বুঝি তোমায় বলতে পারি। কিছুদিন আগেও হয়তো এইভাবে বুঝতাম না। তাছাড়া এখানে আমরা যারা আছি তারা সবাই যে একইরকমভাবে ব্যাপারটা বুঝি, তাও নয়। যাই হোক নিয়োগীজীকে দিয়েই শুরু করি। উনি ভিলাই-এ কাজ করতে গিয়ে শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনে সংশোধনবাদীদের কাছে ধাক্কা খেলেন।"

সোমা তাকায়, "কোন্ সালে এটা?"

অভী হিসাব করে, "উনসত্তর-সত্তর সাল ধর। তারপর তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন নিজে স্বতন্ত্রভাবে স্বাধীনভাবে কিছু একটা গড়ে তুলবেন। তখন মাও-এর কৃষিবিপ্লবের হাঁকে ভিলাই ছেড়ে গাঁয়ে ঘুরে বেড়ালেন, ফলে তাঁর ছত্তিশগড় সম্পর্কে তখন থেকেই অল্প অল্প ধারণা তৈরি হল। দেখলেন অসম্ভব পিছিয়ে পড়া একটা জনজাতি এবং এদেরকে এ দেশের অন্য জাতিগুলির সমকক্ষ করে তুলতে না পারলে এরা সমমর্যাদায় দাঁড়াতে পারবে না।"

সোমা শান্ত গলায় জিজ্ঞাসা করে, "আচ্ছা এই ছত্তিশগড়ের ভাবনাটা কী তাঁর নিজস্ব?"

অভী হাসে, "একেবারে নিজস্ব; কিন্তু উনি হাড়ে হাড়ে বুঝতেন যে উনি ছত্তিশগড়ী নন। এর জন্য তাঁকে নানা অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়তে হয়েছে। কিন্তু তাঁর একনিষ্ঠ ও প্রবল জেদের থেকে এই অঞ্চলকে উনি কাজের জায়গা হিসাবে মজবুতভাবে গড়ে তুলতে চেয়েছেন। তাই এখানে বিয়ে করে, এই মানুষদের এই পরিবেশ-পরিস্থিতিকে সম্পূর্ণ আত্মস্থ করে এদের সঙ্গে তিনি মিশে যেতে চাইলেন। উনি এখানে বাঙালিদের সঙ্গেও হিন্দিতে কথা বলতেন।"

সোমা হাসে, "এটা আমাদের ওখানেও দেখেছি!"

অভী যুক্তি দেয়, "নিজের একটা স্বচ্ছ একাত্মতা বজায় রাখার জন্য উনি এটা করতেন। আমাদেরও উৎসাহিত করতেন যা কিছু ছত্তিশগড়ী তাকে মন দিয়ে ভালবেসে আয়ত্ত করার জন্য। এ ব্যাপারে অনেক কিছু করার তাঁর বাসনা ছিল। কতদিন তিনি আক্ষেপ করেছেন, এখানকার ছেলেমেয়ে বুড়োবুড়ি চাঁদনী রাতে সারারাত ধরে মাদল বাজিয়ে নাচগান করে, এই কৃষ্টি নষ্ট হয়ে যাবে।" দেয়ালে ঠেস দিয়ে গভীর আগ্রহ নিয়ে সোমা শুনে যায়।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে অভী বলে যায়, "যদিও নানাভাবে তাঁকে এখানকার মানুষজনের থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবার চেষ্টা হয়েছে; কিন্তু তা সফল হয়নি। তার কারণ এখানকার মানুষজন তাঁর সততা, আন্তরিকতা অন্তরে অনুভব করে তাঁকে নিজেদের করে নিয়েছিল। আর তিনি স্বয়ং তাঁকে বিচ্ছিন্ন করে দেবার কোন সুযোগ দেননি। ভেবে দেখো, আমাদের কারো পক্ষে এই বিশ্বাসযোগ্যতা এখানে তৈরি করা এই মুহূর্তে সম্ভব কী? এটা তৈরি করতে হলে যতখানি সময় আর একনিষ্ঠার প্রয়োজন তা আমাদের কারো আছে কিনা আমি জানি না। অন্তত পক্ষে

আমার তা নেই এ কথা আমি হলফ করে বলতে পারি।"

সোমা দৃঢ় গলায় বলে, "নিশ্চয়ই অন্যদের কারো আছে!"

অভী চশমার ডাঁটি দুটো ঠোঁটের কাছে নিয়ে ভাবুক গলায় বলে, "হতে পারে, তাছাড়া একটা যোগ্যতার প্রশ্নও থাকে। যাই হোক, তিনি দীর্ঘদিন কাজ করে এই ছত্তিশগড় গড়ে তোলার আন্দোলন আর ভিলাইয়ের শ্রমিক আন্দোলনকে নিজের মত করে বুঝেছিলেন, একটা হিসাব করে নিয়েছিলেন। যেমন এরপর এই হতে পারে, তখন এই করতে হবে। এর পরের ধাপে এটা করতে হবে। এ ব্যাপারে তিনি কী ভাবতেন তিনিই জানেন। পরবর্তী সময়ে দেখা যাচ্ছে, কেউ এ ব্যাপারে তার ধারে-কাছে আসতে পারছেন না।"

সোমা হাই তুলে জিজ্ঞাসা করে, "এ সম্পর্কে তাঁর তেমন কোন লেখা — ?"

অভী চিন্তামগ্ন হয়ে বলে, "তেমন কিছু নেই, যা আছে যৎসামান্য, তা দিয়ে কোন কিছু উদ্ধার করা বেশ মুশকিল!"

সোমা উঠে দাঁড়ায়, "দাঁড়াও আলোচনাটা বেশ জমে উঠেছে, আমি একটু চা করে নিয়ে আসি।"

অভী খুশি হয় তা তার মুখচোখ দেখে বোঝা যায়, "গুড, দুনিয়ার সব বোকাদের চাহিদা এক। বেশ তাহলে এর অর্থ দাঁড়ায় রান্নাঘরের দখলটা তুমি নিয়ে ফেললে।"

রান্নাঘরে এসে অভী সোমাকে টুকটাক জিনিস এগিয়ে দিয়ে সাহায্য করে, মাঝে মাঝে নির্দেশও দেয়। তার বলার ধরনে সোমা হাসে, "কে বলে তুমি এসব কাজ কিছু জানো না? এই তো দেখছি অনেক কিছু জানো। আচ্ছা, এইসব তুমি আমার জন্য সংগ্রহ করে এনেছো, না আগেই ছিল।"

অভী তার কোন ভাবনায় মগ্ন ছিল হঠাৎ সোমার দিকে তাকিয়ে বলে, "আচ্ছা তুমি আমায় ভয় পাচ্ছো না কেন?"

সোমা হেসে তার দিকে তাকায়, "ভয় পাবোই বা কেন, তুমি বাঘ না ভালুক!"

অভী বিচক্ষণের মত মাথা নাড়ে, "মানুষ তো তার থেকেও খারাপ, পশুদের তো তবু একটা নির্দিষ্ট প্রাকৃতিক নিয়ম মেনে চলতে হয়।"

সোমা মাথাটা উঁচু করে বলে, "অভী, তুমি মানবে কিনা জানি না, এই একটি বিষয় বোধহয় মেয়েরা জন্ম থেকে শিখে ফেলে। আমাদের ভুল হয় না বলব না; কিন্তু সেখানেও হয়তো একটা কোথাও অবহেলা, বলতে পার বিশ্বাসভঙ্গতার ব্যাপার থাকে। আর তোমাকে ভয় পেতে বলছো —!"

অভী লজ্জা পেয়ে হেসে ওঠে, "বিশ্বপিতা আমাদের মঙ্গল করুন — 'আমেন আমেন'।"

চায়ে চুমুক দিয়ে সোমা জিজ্ঞাসা করে, "নিয়োগীজীর লেখাপত্র তেমন নেই বোধহয়!"

অভী দুদিকেই মাথা নাড়ে, "আছে, একেবারে কিছু নেই আবার তাও নয়; কিন্তু সে না থাকাই। নিজে যা পারতেন পড়তেন। সময়ও কম পেতেন, কাজের চাপ ছিল অসম্ভব। তবে মাও সে তুং যদি প্রতিদিন লঙ্ মার্চ শেষ করে দ্বন্দ্ব প্রসঙ্গে লিখতে পারেন, তাহলে এ ব্যাপারে আমাদের কোন যুক্তিই খাটবে না।"

কিছুক্ষণ চুপ করে এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলে চলে, "এ শুধু নিয়োগীজী কেন, ভারতবর্ষের সব কামিয়েনিসদেরই এই দশা। কেন এই কথাটা বলছি জানো, নিয়োগীজী নিজেকে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিপ্লবী বলে পরিচয় দিতেন। তাহলে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, এ ব্যাপারে তাঁকে গুরুত্বপূর্ণ কোন সংগঠন গড়ে আপন মতামতকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এই ব্যাপারটাই সর্বক্ষণ তাঁর মনে হয়েছে। ফলে তাঁর মনের ওপর একটা চাপ পড়ছিল যে, যা কিছুই আমি করি না কেন তা শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে করতে হবে। কিন্তু এই কাজ শুধুমাত্র এই দল্লী-রাজহারার খাদানের শ্রমিকদের দিয়ে হবে না। এর জন্য তাঁকে ভিলাই ধরতেই হবে।"

সোমা প্রশ্ন করে, "তুমি শ্রমিকদের মধ্যে এমন ভেদ করছ কেন?"

অভী হাসে, "আমি কিছু করিনি এসব যাঁদের তত্ত্ব-কর্ম তাঁরাই করেন। যাক্ যা বলছিলাম, ভিলাই কোন ছোট জায়গা নয়। আর সেখানকার মানুষের মধ্যে এখানকার মত মজবুত সংগঠন নেই। নেতার মুক্তির জন্য এগারোজন শহীদ হবে — এ কাজ সেখানে তাঁকে গড়ে তুলতে হবে। আর তা গড়ে তুলতে গেলেই যারা সেখানে লুঠে খাচ্ছে তা সে মদের ঠিকাদার হোক কী অন্য মার্কসবাদী পার্টি হোক, সবাই তাঁকে শত্রু বিবেচনা করবে। এই প্রবল শত্রুতার মধ্যে থেকে তাঁকে বাঁচাবে কে — মানুষ। কিন্তু শুধু মানুষ বললে ভুল বলা হয়, এমন মানুষ তো অনেক আছে আমাদের চারপাশে।"

সোমার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করার জন্য একটু চুপ করে আবার বলে, "এর জন্য চাই অন্য মানুষ — সুসংগঠিত, মানবিক, শ্রেণীসচেতন, আত্মবলিদানে প্রস্তুত মানুষ। রুশ বিপ্লবে, চীন বিপ্লবে, ভিয়েতনাম বিপ্লবে, কিউবার বিপ্লবে আত্মবলিদান দেবার জন্য প্রস্তুত মানুষ। কিন্তু এ মানুষ তো আকাশ থেকে পড়ে না, এ মানুষ তো গড়তে হয়। ঐই মানুষ গড়ে তুলে সেই মানুষের নেতৃত্ব দেওয়া আমাদের দ্বারা সম্ভব বলে তোমার মনে হয়?"

সোমা জেদীর মত বলে যায়, "কেন সম্ভব নয়?"

অভী যেন একটু বিরক্ত হয়, "আরে এটা একটা সর্বক্ষণের কাজ, এর জন্যেই লেনিন পেশাদারি বিপ্লবী তৈরি করার কথা বলেছিলেন। তাহলে আমাদের সব কাজ বাদ দিয়ে মনেপ্রাণে ঐ নিয়ে পড়ে থাকতে হয়।"

অভীর কাছে ধমক খেয়ে সোমা হাসে, "আচ্ছা একটা কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করি, এই অন্য মানুষ কী তৈরি করা যায়, না তারা জন্ম থেকেই ভাল হয়ে জন্মায়, শুধু প্রয়োজনে এক জায়গায় এসে জড়ো হয়।"

অভী তার মাথার চুলে হাত বোলায়, "বাব্বা, তুমি একেবারে হেডকোয়ার্টারে কামান

দেগে দিয়েছো। এসব প্রশ্নের উত্তর দেবার ক্ষমতা কী আমার মত একটা পাতি মানুষের আছে। এসব গৌরীদা, রামকৃষ্ণদার মত মানুষজনকে জিজ্ঞাসা করতে হয়। দু'চারটে কথায় তোমায় বিশ্বরূপ দর্শন করিয়ে দেবে।''

সোমা জেদ করে, ''তাঁদেরকে তো আর হাতের কাছে পাচ্ছি না, তোমাকে পেয়েছি তাঁদের চেলা, তুমিই বল না।''

অভী চুপ করে কিছুক্ষণ বসে ভাবে, সোমা তাকে সময় দেয়, তখন অভী গম্ভীর চোখে বলে, ''দেখো আমার যা মনে হয় আমি বলতে পারি। এখানে একটা কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, আমরা সাধারণ কতকগুলো নমনীয় গুণ বা বৈশিষ্ট্য যেমন ভাল হবার, মানুষের ভাল করার ক্ষমতা মায়ের পেট থেকেই নিয়ে আসি।''

সোমা যেন বোঝার চেষ্টা করে, ''অর্থাৎ তুমি সহজাত ক্ষমতার কথা বলছ।''

অভী সায় দেয়, ''হ্যাঁ, কেননা আমাদের মধ্যে ঐরকম একটা ক্ষমতা অন্তর্নিহিত না থাকলে বোধহয় চেষ্টা করে ভালমানুষ হওয়া সম্ভব নয়। এর জন্য বুদ্ধিও লাগে আবার আবেগও লাগে। তবে আবেগের ব্যাপারটাতে আমরা জোর দি-ই। কারণ করেকম্মে খাবার পাটোয়ারী বুদ্ধি আমাদের অনেকেরই থাকে; কিন্তু তাকে আমরা সমষ্টির প্রয়োজনের তুলনায় নিজেদের প্রয়োজনেই বেশি কাজে লাগাই। এই কারণে একে আমরা বলি বুদ্ধিজাত আবেগ।''

সোমা অভীকে থামিয়ে গা ঝাড়া দেয়, ''তাহলে তোমার কথা অনুযায়ী দাঁড়াচ্ছে, বিশেষ বিশেষ গুণপনা যা আমরা কারো কারো মধ্যে দেখি, মানে যা দিয়ে একটা আদর্শবোধ তৈরি হয়, সেটা তাদের সমাজ পরিবারের পরিবেশের গুণে তৈরি হয়।''

অভী সায় দেয়, ''অন্তত আমার তাই মনে হয়। সুতরাং এক্ষেত্রে তুমি বলতে পার আমাদের সাধারণ গুণগুলো আমরা জন্ম থেকে পাই, আর বিশেষ গুণ-দোষ আমরা পরিবেশ থেকে সংগ্রহ করি। মাটি ভাল না হলে কী শিল্পী ভাল মূর্তি গড়তে পারে?''

সোমা হাঁ করে তাকিয়ে থাকে, ''একটু ব্যাখ্যা করে বল।''

অভী নড়েচড়ে বসে, একটু সময় নিয়ে বলে, ''ধর একজন ধর্ষণকারীর আবেগসংক্রান্ত যে সমস্যা আছে তা সে সহজাতভাবেই পেয়েছে; কিন্তু সে যে ক্রমশ ধর্ষণকারী হয়ে উঠল এটা তার পরিবেশ থেকে পাওয়া। তার একটা সমস্যা নিশ্চয়ই আছে; কিন্তু সেই সমস্যা থেকে সে ধর্ষণকারী না হয়ে অন্য অপরাধীও হতে পারত আবার ভালও হতে পারত।''

তারপর জানলার দিকে উঠে গিয়ে অভী দাঁড়ায়, ''আসলে আমাদের সমস্ত ক্ষমতা রয়েছে আমাদের মস্তিষ্কে, আর তা আমরা জন্ম থেকে যা পাই তাই মৃত্যু অব্দি চলে। যাকে বলে নিওটেনি। এখানে নমনীয়তাই হচ্ছে আসল কথা। এর অর্থ কতটুকু আমার পরিবেশ থেকে, অর্থাৎ মানবসভ্যতার জমে ওঠা রত্নভাণ্ডার থেকে কেমনভাবে আমি আমার মাথায় ঢোকাতে পারছি, এটাই সার কথা হয়ে দাঁড়ায়। এইজন্য ছেলেবেলাটা আমাদের কাছে এত গুরুত্বপূর্ণ।''

সোমা চুপ করে শুনে যায়, কোন উত্তর করে না, ভেবে চলে, ভারি ভারি কথাগুলো হজম করে। তাই দেখে অভী থেমে যায়।

কিছুক্ষণ পর আবার অভী শুরু করে, "আবার দেখা যাচ্ছে, ভাষা শেখার মত এমন বহু ক্ষমতা যেমন খেলাধুলা, গানবাজনা, অঙ্ক কষা এইসব পৃথিবীর সব মানুষের মধ্যেই কম-বেশি রয়েছে। তাহলে নিঃসন্দেহে এসবের জৈবিক ভিত্তি রয়েছে। আবার পরিবেশ-পরিস্থিতি মানুষই তৈরি করে, সেই পরিবেশই আবার মানুষকে বদলায়। তেমনি উপযুক্ত পরিবেশ না থাকলে অনেক ভাল মানুষও এই নিয়োগীজীদের মত বোকা বনে যায়।'

সোমা অবাক হয়ে তাকায়, "বোকা বনে যাওয়া মানে!"

অভী যেন গলা চড়িয়ে বলে, "বোকা বানানো নয় তো কী, মৃত্যু তো বিপ্লবীদের সর্বক্ষণের সঙ্গী; কিন্তু বিপ্লবীরা তো এই মৃত্যুকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে সমস্ত কাজ করে যান। নিয়োগীজী পারলেন কই, মৃত্যুই তাঁর সঙ্গে শেষ রসিকতা করল। আজ আমি হাজার গলা ফাটালে কী অমন আর একটা মানুষ পাব। যাক্ যে কথাটা বলছিলাম তাই বলি, নইলে ভাবনার রেশটা কেটে যাবে।"

সোমা অপরাধীর মত হাসে, "বলো, বলো।"

অভী কেশে গলা পরিষ্কার করে, "আবার দেখো এখানে ছত্তিশগড়ের হাঁক দিয়ে নিয়োগীজী বহু মানুষকে চটিয়েছেন।"

সোমা জিজ্ঞাসু চোখে তাকায়, "কেন এই হাঁকটা তিনি এখানে দিলেন বলে তোমার মনে হয়!'

অভী হাসে, "আর কিছু দিয়ে এই অনুন্নত স্থানে কাজ হবে না, শুধুমাত্র এইজন্য। তিনি বুঝেছিলেন মার্কসবাদ, শ্রমিকশ্রেণী, শ্রেণীসংগ্রাম এইসব হাঁকে কাজ হাসিল করতে হলে এখানে হাজার বছর লাগবে।"

সোমা যোগ করে, "অর্থাৎ আমাদের প্রচলিত পদ্ধতিতে।"

অভী মাথা নাড়ে, "তার তুলনায় এখানকার মানুষকে সংগঠিত করতে হলে ছত্তিশগড়ের স্লোগান বেশ মুঠোর মধ্যে ধরা যায়, এর দ্বারা তাড়াতাড়ি মানুষের মনের মধ্যে একটা একাত্মতাবোধ গড়ে ওঠে। এটা তো ঠিক যে এখানে ছত্তিশগড়ের বাইরে থেকে আসা লোকজন এ অঞ্চলকে লুটেপুটে খাচ্ছে। তাই এই কর্মসূচির ব্যাপারে তিনি একেবারে সঠিক ছিলেন। একটু ঘাঁটলেই বোঝা যায়, এখানকার চারপাশের অঞ্চলের ব্যাপক কৃষক ও শ্রমিকদের মধ্যে নিয়োগীজীর এই আন্দোলন অভূতপূর্ব আশার আলো সঞ্চার করেছিল।"

সোমা তাকায়, "কী রকম?"

অভী হাত তুলে বলে,"হ্যাঁ, একটা উদাহরণ দিচ্ছি, এক বছরে এখানে খেটে খাওয়া মানুষজনের মধ্যে চারপাশে এমন সাতাশটা নতুন সংগঠন তৈরি হয়েছে। সবাই মুক্তিমোর্চার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। বোঝা যায়, এখানকার মানুষজনেরা যেন নবজাগরণের স্বাদ পেয়েছিল,

তারা চারিদিকে অসংখ্য ছোট ছোট সংগঠন গড়ে তুলে নিয়োগীজীর নেতৃত্ব দাবি করছে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর নামে স্লোগান দিচ্ছে। কাজেই বলতে পারো, আমরা রাজনৈতিক আন্দোলনের দিক থেকে এখনো ছত্তিশগড়ের স্তরেই আছি।"

সোমা গালে হাত দেয়, "অর্থাৎ গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তর!"

অভী সায় দেয়, "হ্যাঁ, এই ছত্তিশগড় নির্মাণের জন্যেই তাঁর মডেল হাসপাতাল, মডেল স্কুল, গাঁয়ের ব্রিজ তৈরি, চাষের জলাধার তৈরি — সব সব সমস্ত নির্মাণ। বেঁচে থাকতে হলে তোমাকে এখানে নির্মাণে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে, কারণ যুগ যুগ ধরে এ অঞ্চল অবহেলিত, এখানে কোন নির্মাণ হয়নি। কোন মহাপুরুষ পায়ের ধুলো দেননি। পাষাণী অহল্যা, এখানে এতদিন ঘুমিয়ে ছিল। এখানে লড়াই আর নির্মাণ আক্ষরিক অর্থে বেঁচে থাকার দুটি প্রধান হাতিয়ার।"

পা দুটো চেয়ারে গুটিয়ে তুলে অভী জমিয়ে বসে, "এবার আমার কথা বলি। যেটা শুনতে তুমি বেশি আগ্রহী। ধর এই নির্মাণের কথা মাথায় রেখেই নিজেকে নির্মাণ করতে গেলাম। ভোপালে গেলাম শল্যবিদ হতে, এখানকার এই শহীদ হাসপাতালের প্রয়োজনের কথা ভেবে। তার আগে তোমায় বলি, এর নাম কেন শহীদ হাসপাতাল হল।"

সোমা কৌশলে হাই চেপে বলে, "ও আমি জানি, সেই সাতাত্তর সালে এগারোজন শহীদ হবার পর তো। এই নিয়ে অনেক লেখা বেরিয়েছে।"

অভী হাসে, "তা ঠিক, এটা তো এখানকার মানুষজনের গৌরবোজ্জ্বল লড়াইয়ের স্মৃতি। দাঁড়াও তোমায় এখানকার গায়ক ফাগুরামের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব। ও গল্প করে বলবে, কেমন করে মৃত্যুর হাত থেকে ওরা কয়েকজন ফিরে এসেছে।"

কখন চাঁদনী এসে দাঁড়িয়েছে। অভী ওর দিকে তাকিয়ে বলে, "বুঝলে ওর বোধহয় খিদে পেয়েছে, এই সময় তো ও রাতের খাবার খায়।"

সোমা গা ঝাড়া দিয়ে ওঠে, "আমি থাকায় তোমাদের সব রুটিন ওলটপালোট হয়ে গেছে। দাঁড়াও ক'টা রুটি বানাই।"

অভী বাধা দেয়, "আহা তুমি ব্যস্ত হয়ো না। কিছু আনিয়ে নিলেই হবে।"

সোমা ঘুরে দাঁড়ায়, কপট রাগ দেখিয়ে বলে, "কিচ্ছু আনতে হবে না, কতক্ষণ লাগবে, রুটি আর সবজি।"

অভী অবাক হয়, "সবজি কোথায় পেলে?"

সোমা আঁচলের শাড়ি কোমরে জড়ায়, "মশাই আমার সংসারটা আমায় করতে হয়, তুমি তো আর করে দিয়ে আসো না। মেসের সবজি খানিকটা রেখে দিয়েছিলাম।"

অভী তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে, "বেশ তুমি তোমার সংসার সামলাও আর আমি, আমার সংসারটা চট করে একবার দেখে আসি। হাসপাতাল থেকে ঘুরে এসেই তোমায় মজার মজার গল্প শোনাব।"

তারপর সোমার কাছে গিয়ে বলে, "আচ্ছা তুমি তো বেশি কাপড়জামা আনোনি, আমি দু'একটা কিনে নিয়ে আসব।"

সোমা হেসে ফেলে, "বাবা, তোমার তো সাঙ্ঘাতিক নজর, কিচ্ছু লাগবে না, সব আছে। দু'একটা যা লাগবে ওদের কাছে নিয়ে রেখে দিয়েছি। বেশ বুঝতে পারছি, তোমার গিন্নীর কষ্ট অনেক কম হবে।"

অভী বেরিয়ে যাবার আগে প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে, "ওঁ শান্তি।"

ফিরে খাবার হাতে নিয়ে বসে অভী খাবার পরখ করে, তারপর আনমনে বলে চলে, "বাঃ বেশ চমৎকার হয়েছে তো, একেবারে নতুন স্বাদ।"

সোমা অনুযোগের সুরে বলে, "একটা কথা বলি, তুমি কিন্তু আমায় খাবার জন্য পীড়াপীড়ি করবে না। আমি এখন একটুও বেশি খেতে পারি না। খেলেই শরীর খারাপ করে।"

অভী চশমাটা নাকের কাছে তুলে নিয়ে তাকায়, "করছি বুঝি, ও তুমি গ্রাহ্যি করবে না। তুমি তোমার মত খাবে। ওটা আমার স্বভাব, রোগীদের বলতে বলতে অভ্যাস হয়ে গেছে। আচ্ছা তবু তোমার অসুবিধাটা কী হয় শুনি? দাঁড়াও তোমার বয়েসটা কত হবে?"

জিজ্ঞাসা করে সে নিজেই কী হিসাব করে, "হ্যাঁ বল, কী অসুবিধা হয়?"

সোমা বলে, "অম্বল তো ছিলই তার সঙ্গে মাঝে মাঝেই পেট খারাপ হয়, কোন অনিয়ম না করলেও —।"

এরপর অভী গড়গড় করে বলে যায়, তার কী কী হতে পারে!

সোমা হাসে, "হ্যাঁ এইসবই হয়।"

অভী খেতে খেতে বলে, "ছাব্বিশ নম্বর।"

সোমা তাকায়, "মানে?"

অভী বিজ্ঞের মত তাকায়, "মানে, তুমি আমার ছাব্বিশ নম্বর কেস। এরই মধ্যে পঁচিশটা কেস পেয়ে গেছি। একটা গবেষণা করছি। এই ধর, ত্রিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সের মেয়েদের নিয়ে একটা কাজ, সব একরকমের রোগ। আরও একটু ভাল করে পরীক্ষানিরীক্ষা করা দরকার, সে সুযোগ এখানে নেই। যাক্ তোমার চিন্তা নেই, ঠিক জায়গায় এসে পড়েছ, একেবারে উপযুক্ত চিকিৎসাটি পাবে।"

তারপর হাত ধুয়ে এসে চেয়ারে বসে আবার বলতে শুরু করে, "তা ভোপালে গিয়ে প্রথম সমস্যা যেটা হল, বাইরের জগৎ থেকে প্রায় একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লাম। মাঝে মাঝে এদিক ওদিক গেছি, রাজনীতি ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছি, কলকাতায় গেছি; কিন্তু মানুষের প্রয়োজনে ভাল শল্যবিদ হতে হবে এই কথাটা বার বার মনে হত। এ ব্যাপারে নিয়োগীজীরও অবদান আছে। যতবার সংকটের মধ্যে পড়েছি তাঁর কাছে গেছি উনি

বলেছেন, আপনার কাজটা ভাল করে করুন। আমাদের রাজনীতি করার অনেক লোক আছে; কিন্তু আমাদের একজন ভাল সার্জেন দরকার। বলে উনি বেথুনের গল্প শোনাতেন।"

সোমা স্বগতোক্তির মত বলে ওঠে, 'ভবিষ্যদ্‌দ্রষ্টা'।

অভী সোমার কথাটা হজম করে আবার শুরু করে, "এখানেও উনি আমাকে পারতপক্ষে খুব দরকার না হলে ডাকতেন না। অন্য ডাক্তাররা, আরও দু'জন, তাঁকে যথেষ্ট সংগঠনে সাহায্য করে। নানা ধরনের কেরানির কাজও এদের করে দিতে হয়। কারণ এখানে শিক্ষিত কাজ জানা লোকের বড় অভাব। আর বলতে পার, ভোপাল থেকে এখানে ফিরে আসার পর হাসপাতালের সমস্ত দায়িত্বটা যেন আমায় নিতে হল।"

সোমা জিজ্ঞাসার চোখে তাকায়, "এখানে সব অপারেশন করো?"

অভী হাসে, "মোটামুটি প্রায় সবই। সারাদিনে প্রচুর কাজ করতে হয়। এখানকার আদিবাসী মানুষেরা খুব গরিব, পিছিয়ে পড়া, তাদের সমস্যাও হয় প্রচুর। মাঝে মাঝে ক্লান্ত হয়ে পড়ি, তখন এদের নিয়ে গান করি, আড্ডা দি-ই; কিন্তু কোথায় যেন একটা অপূর্ণতা থাকে, একটা অভাববোধ মনের মধ্যে সূক্ষ্মভাবে কাজ করে চলে। এখন ঐ নিঃসঙ্গতা যেন আরও বেড়েছে।"

হঠাৎ যেন সোমার মনে পড়ে যায়, "হ্যাঁ ভুলেই গিয়েছিলাম, তোমার গান শুনবো কিন্তু, সেই গানগুলো।"

অভী সখেদে বলে ওঠে, "আর গান, সারাদিন যে গান করছি তাতেই রক্ষা নেই।" সে একটা হিসাব দিয়ে বলে, "ধর, প্রতিদিন আউটডোরে দেড়শো রোগীর পেছনে যদি চারটে করে কথা খরচ করি, তাহলে প্রতিদিন কতগুলো কথা বলছি হিসাব কর। তারপর এখানে আমার মেজাজের দুর্নাম আছে। মেজাজ মানেই উচ্চগ্রামে চিৎকার। আর আমাদের কাজই হল, কথা বলা। সারাদিনে এত অজস্র কথা বলার পর কোন্ আক্কেলে গলা বার করার সাহস করি বল তো! এখন গান করতে চাইলে গলা থেকে এমন সব বিচিত্র আওয়াজ বের হবে যে তুমিই ঘর ছেড়ে পালাবে।"

সোমা এই কথায় নিবৃত্ত হবার পাত্রী নয় তা তার ক্রমাগত মাথা নাড়ানো দেখে বোঝা যায়। তখন অভী মাথা নাড়ায়, "তবে হ্যাঁ, এই গলায় লোকগীতি মানে ঐ ছত্তিশগড়ী গানের ফোড়ন দেওয়া চলতে পারে।'

তারপর সোমার মুখ দেখে সে বলে ওঠে, "আচ্ছা সে হবে'খন। এখন যে কথাটা বলছিলাম বলি।"

সোমা সায় দেয়, "আচ্ছা বল বল।"

হঠাৎ কী একটা কথা অভীর মনে পড়ে যায়, একটু ভেবে নিয়ে সে বলে ওঠে, "আর দেরি না করে প্রদীপের সঙ্গে কাল একটা যোগাযোগ করা উচিত।"

সোমা মুখটা গম্ভীর করে বলে, "কেন?"

অভী হাত কচলায়, "না মানে, ওদের কাছে প্রদীপ জানবে তো তুমি অসুস্থ, হাসপাতালে

ভর্তি হয়েছো। বউয়ের জন্য একটা দুশ্চিন্তা তার হওয়াও খুব স্বাভাবিক।"

সোমা তাকে নিশ্চিন্ত করে, "অতো ভাবার মত ছেলে সে নয়। তোমরাই তো বল, ভাগ্যবানের বউ মরে, আর অভাগার —।"

অভী হাসে, "কিন্তু এ বউ তো বোঝা নয়। সে দুগ্ধবতী গাভী, এর জন্যে তো ভাবতেই হবে।"

সোমা হাত নাড়ে, "হ্যাঁ অন্তরে উথল-পাথাল ঢেউ উঠবে। আর সে মন পবনের নাও ভাসিয়ে দেবে। বেশ তাহলে তুমিও স্বীকার করছো, সম্পর্কটা নিছক পার্থিব প্রয়োজনের।"

অভী যেন খানিকটা অবাক হবার ভঙ্গি করে বলে, "সে কথা অস্বীকার করে কোন্ মূর্খ। কিন্তু এটাও তো মানবে রাজী না হলে একসঙ্গে পথ হাঁটা যায় না।"

সোমা বিজ্ঞের মত কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, "অভী এটা ছেড়ে দাও, কেন অযথা পরিবেশটাকে ভারি করে তুলবে। কারণ এ ব্যাপারে কোন কথা বলা বৃথা, কেননা তুমি সংসার এখনো করোনি। শুধু এটুকু জানবে, সংসারের সমস্ত সম্পর্ক আর বিষয়গুলো যতখানি আনন্দের, যতখানি প্রয়োজনের, ঠিক ততখানি দুঃখের।"

অভী রামকৃষ্ণের মত হাতটা ওপরে তুলে বলে, "প্রবৃত্তি আর নিবৃত্তি সামলে থাকবি পাঁকাল মাছের মত।"

সোমা সে কথায় ভ্রূক্ষেপ না করে বলে, "এ যে কত কুটিল, জটিল, প্যাঁচালো, নাছোড়বান্দা তা আমি হয়তো তোমায় কোনদিনই বোঝাতে পারব না। আমি কেন কেউই তোমায় বোঝাতে পারবে না। এ বোধহয় বোঝাবার বিষয় নয়। আপন আপন উপলব্ধির ব্যাপার। শুধু একটা কথা তোমায় বলতে পারি, নেহাত সংসার করতে হবে তাই করছি; কিন্তু এই সংসার আমি চাইনি, চাই না। হয়তো গোপনে জিজ্ঞাসা করলে আমার মত সবাই এই একই কথা বলবে।"

তারপর কিছুক্ষণ চুপ থেকে সে বলে, "অবশ্য তাতে এই সংসারেরও কিছু যায় আসে না, প্রবাহিত নদীর ধারার মত সংসার থাকবে। এইসব কিছু টেনে নিয়ে সে ঠিক নিজের মত করে বয়ে চলবে।"

মুখটা নিচু করে সে বলে, "যাক্, সংসারের দূষণ এখনও তোমার মনে ঢোকেনি, এই ভাল।"

হঠাৎ পরিবেশটা ভারি হয়ে ওঠায় অভী হাতঘড়ি দেখে, "বেশ আজ থাক্, অনেক রাত্রি হয়েছে।"

তারপর ঘরের কোণের দিকে তাকিয়ে বলে, "তোমার চাঁদনী বাঈকে দেখ, এককোণে কুণ্ডলী পাকিয়ে ঢুলছে। ও নিচে একটা বিছানা করে নিক্। তুমিও শুয়ে পড়। আবার কাল ফাইল খুলব।"

সোমা কেশে গলা পরিষ্কার করে, "সেই ভাল, তুমিও সারাদিন পরিশ্রম করেছো, কাল রাত্রে আমার জন্য ঘুম হয়নি, আচ্ছা তুমি কোথায় শোবে?"

অভী হাই তোলে, "কোন ভয় নেই, এ জায়গা তোমার জায়গার থেকেও নিরাপদ। এখানে কেউ হাঙ্গামা করবে না। আমি এই পাশের ঘরেই আছি। খুব অসুবিধায় না পড়লে হাসপাতাল থেকে আমায় ডাকবে না। ডাকলেও তোমার ঘুম যাতে না ভাঙে তার ব্যবস্থা আমি করে নিয়েছি। তোমার ঘরের হাসপাতালের দিকটায় তালা লাগিয়ে দিয়েছি। ফলে এই ঘরে কেউ কড়া নাড়বে না। আচ্ছা তোমার ওষুধ যেমন যেমন খেতে বলেছি খেয়েছো?"

সোমা শোবার তোড়জোড় করে, জানালাগুলো ভাল করে বন্ধ করে, অভী তাকে সাহায্য করে। "তোমার তো সামান্য ঠাণ্ডা হাওয়া লাগা বারণ তাহলেই কাশি শুরু হবে, সুতরাং ঘর একেবারে নিশ্চিদ্র হওয়া প্রয়োজন।"

সোমা হাসে, "হ্যাঁ, একেবারে লখীন্দরের বাসরঘরের মত।"

অভী পকেটে কী যেন খুঁজছিল, "না, একটা কথা আমাদের শাস্ত্রে যে লেখে তা ঠিকই। নিশ্চয়ই অতি সাবধানতা আদিখ্যেতার শামিল; কিন্তু সাবধানে থাকলে আমাদের শরীর ভাল থাকে। আগে বহু জিনিস গায়ের জোরে, মনের জোরে করার চেষ্টা করতাম, সহ্য হত না, পরে অসুবিধা হত। কিন্তু সবার পক্ষে এটা সম্ভব হয় না। ধর নিয়োগীজীকে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াতে হয়, ফলে ঠাণ্ডার জন্য ব্যবস্থা, খাবারের ব্যবস্থা এসব নিজের জন্য তিনি কী ভাবে করবেন?"

সোমা বিছানা ঠিক করে বলে, "তাহলে আমার সাবধানে থাকার যুক্তি আছে বলো?"

অভী খুব নিশ্চয়তার সঙ্গে বলে ওঠে, "অবশ্যই।"

উদাসীন হয়ে সোমা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, "এই নিয়ে কত কথা আমায় শুনতে হয়!"

অভী বেশ জোর দিয়ে বলে, "দেখো সার কথা হল, শরীর কষ্টের মধ্যে থাকলে মনও কষ্ট পাবে তখন তুমি তোমার সারাদিনের বরাদ্দ কাজ ঠিকমত করতে পারবে না। আর আমার সব সময় মনে হয়, আমি যদি নিজের কাজ না করতে পারি তাহলে আমার বেঁচে থাকা না থাকা সমান।"

তারপর সিগারেটের প্যাকেটটা আলমারি থেকে বার করে সে বলে, "তুমি নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়।"

সকালবেলায় চা নিয়ে বসে অভী বলে, "এখন তোমার শরীরটা একটু ভাল লাগছে?"

সোমা তখনও শ্বাস টানছে, "ভোরের দিকটায় বাড়ে, তবে আমি অনেক ভাল আছি। এখানকার শুকনো আবহাওয়া যেন আমাদের মত রোগীর পক্ষে একেবারে উপযুক্ত। ঐজন্য এই জায়গা ছেড়ে যেতে চাই না।"

তারপর তার কী কথা মনে পড়ে যায়, "সারারাত কী সব আবোলতাবোল স্বপ্ন দেখলাম!"

অভী হাসে, "হ্যাঁ তা হবে। আগের দিন ঘুমের ওষুধ দেওয়া হয়েছিল তাই স্বপ্ন দেখার

সুযোগ পাওনি। আজ তার প্রতিক্রিয়া হচ্ছে।"

সোমা বিছানায় বসে হাসে, "তুমি শুনলে হাসবে কাল খুব ছাড়া ছাড়া ভাবে শুধু বাঁশির আওয়াজ শুনেছি।"

অভী অর্থপূর্ণ চোখে তাকিয়ে বলে, "কৃষ্ণ এসে বাঁশি নিয়ে পাশে দাঁড়িয়েছিলেন বোধহয়।"

তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে অভী বলে, "সেই কেষ্ট, গৌরীদার ভাষায় দা গ্রেটেস্ট থিঙ্কিং রিড।"

সোমা কপালে মৃদু চাপড় দিয়ে বলে, "হায় আমার কপাল, আমারই গলা দিয়ে কত বিচিত্র বাঁশির সুর বেরোয়।"

অভী তখন মুচকি হাসে, "কেন আমি খারাপ কী বলেছি, ভক্তের একাগ্র সাধনায় ভগবান তার পাশে এসে দাঁড়ান না! এই বলে সে কবিতার সুরে বলে, আমায় নইলে তোমার প্রেম হত যে মিছে — এইসব কথা তোমাদের কবিই তো বলেছেন।"

এই কথার খেই ধরে সোমার যেন হঠাৎ কোন একটা কথা মনে পড়ে যায়, "হ্যাঁ ভাল কথা, রবীন্দ্রনাথের ওপর রাধাকৃষ্ণের এত প্রভাব কেন বলো তো!"

অভী মুখে শব্দ করে আড়িমুড়ি ভাঙ্গে, "সকালবেলায় যদিও সবাই মালিকের নামই নেয়; কিন্তু তুমি এখন যদি **বৈষ্ণব পদাবলী**র নামগান শুরু কর, তাহলে সারাদিনের কাজ মাটি।"

সোমা ছাড়ে না, "না, বল একটু শুনি।"

অভী উঠে পড়ে, কতকগুলো কাগজ আলমারি থেকে বার করতে করতে বলে, "ও তো খুব সহজ কথা। তুমি একটু ভাবলেই মনে করতে পারবে — এটা **বৈষ্ণব পদাবলী**র কবিদের প্রভাব। আমাদের সমাজে মাঝখানটায় **বৈষ্ণব পদাবলী**র কবিরা যা কাজ করে গেছেন অন্তত কাব্যগীতির ক্ষেত্রে, তার উদাহরণ পৃথিবীর সাহিত্যের ইতিহাসে কোথাও নেই।"

অভীর কথা শুনে সোমা সন্দিগ্ধ চোখে তাকায়, "এটা তুমি ঠিক বলছ?"

অভী যেন নিজের কাজে মগ্ন তাই অন্যমনস্কভাবে উত্তর দেয়, "মনে তো হয় ঠিক বলছি। আর সব থেকে বড় কথা হচ্ছে, সেসব তাঁরা করেছেন প্রায় সাধারণ মানুষের মুখের ভাষায়। রবীন্দ্রনাথকেও এ ব্যাপারে যথেষ্ট সমস্যায় পড়তে হয়েছে। কারণ তাঁকে বিদেশী কবিদের বিশেষ করে ইংরেজ কবিদের সাঙ্ঘাতিক প্রভাবকে সামলাতে হয়েছে। বহু চেষ্টায় তিনি তাঁর মান-ইজ্জত রক্ষা করে, এই সমস্ত কিছুকে আত্মস্থ করে, তবে তাঁর নিজের জায়গায় এসে পৌঁছালেন; কিন্তু শেষরক্ষা করতে পারলেন না।"

তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে আলমারি হাতড়ে সে যেন কথা শেষ করে, "তাছাড়া পিতৃপুরুষকে অস্বীকার করতে চাইলেই কী আর করা সম্ভব, তাই তাঁর এত প্রভাব তুমি দেখছো। এমন চমৎকার কল্পকথা রূপক আর পৃথিবীতে কোথাও তুমি পাবে। একবার ভাব তো, ভগবান এসে ভক্তের রথের সারথি হয়ে রথ চালাচ্ছেন!"

সোমাকে দেখে বোঝা যায় সে বেশ আগ্রহ নিয়ে শুনছে; কিন্তু অভী যেন তাল কেটে

দেয়। দুটো কাগজ আর একটা খাতা দিয়ে সে বলে, "কিন্তু ঐসব কল্পকথা দিয়ে আমাদের চলবে না। নিয়োগীজীর এই দুটো লেখা তুমি একটু অনুবাদ করার চেষ্টা করবে।"

তারপর সোমার মুখটা দেখে তার মায়া হয়, "কী আমি বড্ড বেরসিক! আচ্ছা আমি কথা দিলাম এ ব্যাপারে তোমার যা যা প্রশ্ন আছে সব তুমি করবে। আগে আমি হাসপাতালটা সেরে আসি। আজ মঙ্গলবার, এমনিতে হাসপাতালের ছুটি, একবার শুধু ঘুরে আসব।"

সোমা ইতস্তত চোখে তাকায়, "না আমি তা বলছি না; কিন্তু তুমি যে আমাকে এইসব অনুবাদ করার দায়িত্ব দিচ্ছো, এ কী আমার দ্বারা সম্ভব?"

অভী যেন আর কোন কথা শুনবে না, "নিশ্চয়ই সম্ভব, তুমি যা পার কর, তারপর আমি ওটা দেখবো তো।" এই বলে সোমার কোন আপত্তি শোনার আগেই সে দ্রুত ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

দুপুরে হাসপাতাল থেকে প্রায় হন্তদন্ত হয়ে সে ফিরে, পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকে হাতের ব্যাগটা টেবিলে রাখে। প্রায় মার্জনা চাওয়ার ভঙ্গিতে কিছু বলতে গিয়ে দেখে সোমা নিবিষ্ট মনে তার অনুবাদের কাজ করে যাচ্ছে। অভী খুশি হয়, "আমার আসতে একটু দেরি হয়ে গেল। তোমার নিশ্চয়ই খুব খিদে পেয়েছে।"

সোমা দুটো আঙ্গুল তুলে বলে, "আমি দুটো বিস্কুট খেয়েছি।"

অভী বাচ্চাদেরকে শোনানোর মত করে তার কথার প্রত্যুত্তর দেয়, "বেশ করেছো, খুউব ভাল করেছো।"

সোমা কলম বন্ধ করে গা ঝাড়া দেয়, "আমার তো মনে হয় ঠিকমত অনুবাদ করা নিজে কিছু লেখার থেকেও অনেক কঠিন কাজ।"

অভী তার প্রতি প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে, "একেবারে খাঁটি কথা বলেছ।"

তারপর জামা ছাড়তে ছাড়তে বলে, "আমি তো আজ মুশকিলে পড়েছিলাম। ধারে-কাছে কেউ নেই। সবাই বাইরে গেছে কাজে। এইবার কেরালা থেকে একটা দল এসেছে, নিয়োগীজীর ব্যাপারে জানতে, তাদের নিয়ে প্রায় ঘণ্টা খানেক সময় গেল। বাইরের লোকজন সম্পর্কে আমাদের যথেষ্ট সতর্ক থাকতে হয়। কারণ পান থেকে চুন খসলেই তারা বাইরে গিয়ে নিন্দে করবে। আর এদের সব বিচিত্র ধরনের প্রশ্ন! শুনলেই তুমি বিরক্ত হবে! তবে আমি সবাইকে জানিয়ে রেখেছি, আমার বাড়িতে অতিথি আছে, এখন খুব প্রয়োজন না হলে আমায় কেউ হাঁক পাড়বে না।"

সোমা হেসে কাগজপত্র গুছিয়ে ওঠে, এবার খাবার ব্যবস্থা করতে হবে, "অতিথি মানে, ভি. ভি. আই. পি.।"

অভী বাথরুমের দরজা বন্ধ করার আগে মুখ বাড়িয়ে বলে, "অবশ্যই, এমন ফাঁকি দিয়ে

ঋণশোধ করার সুযোগ পেলে মানুষ ছাড়ে।"

সোমা হেসে দীর্ঘশ্বাস ফেলে রান্নাঘরের দিকে যায়।

খাওয়া হয়ে গেলে অভী চেয়ারে বসে কাগজ থেকে চোখ তুলে বলে, "তুমি কী দুপুরে একটু গড়াবে?"

সোমা হাই তোলে, "না, তাহলে রাত্রে ঘুম আসবে না।" তারপর মাথা নিচু করে কী কথা মনে করে বলে, "সকালে তুমি বললে রবীন্দ্রনাথের ওপর পূর্বসূরিদের প্রভাব রয়েছে, তাহলে মধুসূদনের ওপর নেই কেন?"

অভী চশমাটা খুলে সপ্রশংস দৃষ্টিতে সোমার দিকে তাকায়, "বাপ্‌রে, তুমি এইসব নিয়ে বেশ চর্চা কর বলে মনে হচ্ছে। আমার আশ্চর্য লাগছে, প্রবাসে বসে একজন ইঞ্জিনিয়ার হয়ে তুমি বাংলা ভাষা-সাহিত্য নিয়ে এমন গভীর ভাবনায় বিজড়িত, এ তো কলকাতার যে কোন বাংলার অধ্যাপকের ঈর্ষার কারণ হতে পারে।"

সোমা বিছানা ছেড়ে আধশোয়া অবস্থা থেকে উঠে বসে, "কোন কাজ না থাকলে আমাদের মত মানুষ যারা তারা এইসব চর্চাই করে। আর যারা তোমাদের মত মানুষ তারা কাজও করে আবার প্রয়োজনে এসবও চর্চা করে। এই কারণে তোমাদের চর্চা অনেক খাঁটি হয়। আর আমাদের চর্চা হয় নিছক সময় কাটানো, হবি, ফ্যাশান। বেশ, তুমি এখন বলো।"

অভী আবার চশমাটা পরে একটু সময় নিয়ে বলে, "তোমার উত্তর আমি জানি না। তবে মধুসূদন তো অনেক বেশি বয়সে বাংলা কাব্যচর্চা করেছেন, বিদেশী শিল্পের প্রতি তাঁর ঝোঁক ছিল বেশি। তাছাড়া একটু যেন বেশি ধ্রুপদী ধরনের ভাষার দিকে তাঁর আকর্ষণ ছিল বলে মনে হয়। ফলে **বৈষ্ণব পদাবলী**তে যে সাধারণ মানুষের ভাষা আমরা দেখি তা বোধহয় তাঁকে তেমন আকৃষ্ট করেনি।"

একটানা বকে অভী চুপ করে বসে কাগজ দেখে। কিছুক্ষণ পর সোমা বলে ওঠে, "আচ্ছা নিয়োগীজী চলে যাবার পর এখানে সংগঠনের অবস্থাটা কী? সবাই তো তোমাদের দিকে তাকিয়ে আছে।"

কাগজটা মুড়িয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে অভী বলতে শুরু করে, "কী যে তোমায় বলি তাই ভাবছি, একটা কথা বলতে পারি, নিয়োগীজী মারা যাবার পর এখানে সবাই ভেতরে ভেতরে খুব ভেঙ্গে পড়েছে, আমাদের কাছে এটা একটা অসম্ভব ধাক্কা। জানি না, আমরা এটা কাটিয়ে উঠতে পারব কিনা, আর তা পারলেও কতখানি পারব! কারণ নিয়োগীজীর সঙ্গে বাকিদের তফাতটা এত বেশি যে কোন তুলনাই চলে না।"

সোমা যেন একটু অবাক হয়, "এটা বাইরে থেকে দেখে কিন্তু বোঝা যায় না।"

অভী মাথা নাড়ে, "না, বাইরে তুমি তার কোন প্রকাশ দেখতে পাবে না। বাইরে তুমি

উল্টো ব্যাপারটাই দেখবে, যেন কিছুই হয়নি, এ আমরা সামলে উঠতে পারব। কিন্তু ভেতরটা মোটেই তা নয়। যাই হোক, আমার অবস্থাটা একটু অন্যরকমের। ভোপালে থাকার সময়ে প্রত্যক্ষ রাজনীতির সংস্পর্শ থেকে দূরে ছিলাম, তখন মনটাকে সরিয়ে একটু পড়াশোনার জগতে নিয়ে গিয়েছিলাম।"

সোমা হাসে, "এর জন্য তোমায় লড়াইটা কার সঙ্গে বেশি করতে হয়েছে — নিজের সঙ্গে না অন্যদের সঙ্গে।"

অভী একটু চুপ করে বলে, "ঠিক লড়াই না, কারণ এর সবটুকুই ছিল মানুষের কাজে এই বিদ্যাটাকে কাজে লাগানোর জন্য। গ্রামীণ শল্যবিদদের সংস্থায় আমার একটা গবেষণাপত্র সবাই খুব প্রশংসা করেছে। তাতে কিছুটা উৎসাহিত হয়েছি। চেষ্টা করছি, যাতে এ ব্যাপারে একটা বই লেখা যায়, কারণ ভারতবর্ষের গ্রাম-সমাজে এমন কিছু কিছু বিশেষ সমস্যা হয় যা খুব অল্প আয়াসে সমাধান করা যায়। অথচ তার অভাবে মানুষগুলো কষ্ট পায়, তাদের হয়রান হতে হয়। আমরা চেষ্টা করি, এই হাসপাতালেও ঐভাবে কাজ করতে। কাজও প্রচুর হয়, ফলে সমস্যাও তৈরি হয় বিস্তর। সেই কাজ আর সমস্যা যতটা সম্ভব ভালভাবে নথিভুক্ত করি, কাজে ব্যস্ত থাকি সারাদিন। কোন কোন সমস্যার জট ছাড়াতে মাথা খারাপ হবার অবস্থা হয়। অন্য কিছু ভাবার সময়ও পাই না।"

সোমা হাসে, "অর্থাৎ গবেষণার দিকে মন গেছে।"

অভী একটু ভেবে বলে, "বলতে পার, ফলে সরাসরি চিকিৎসার প্রয়োজন ছাড়া আমাকে নিয়ে তেমন কেউ টানাটানি করে না। বলা ভাল, আমিও সরাসরি রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ার ব্যাপারে এখন আর তেমন উদ্যোগ, উদ্যম অনুভব করি না।"

সোমা হাসে, "এখানে তোমায় কেউ পলায়নবাদী নাম দিয়ে কটু কথা বলে না?"

অভীকও হাসে, "হয়তো বলে, আড়ালে, মনে মনে; কিন্তু সামনা-সামনি কেউ কিছু বলে না। হয়তো নিয়োগীজীর স্নেহধন্য বলে অনেকে আমায় ঈর্ষা করে। তবে যারা সামনাসামনি রাজনীতি করে তারা বাকিদের থেকে একটু উচ্চতর প্রাণী বিশেষ, তারা একটু বেশি সচেতন এবং তাদের ত্যাগ করার ক্ষমতা অনেক বেশি — এমন একটা মনোভাব তাদের আচরণে প্রকাশ পায় এটা বেশ বুঝতে পারি।"

এই বলে হঠাৎ সে উঠে পড়ে যেন মনের পায়চারি করে।

ঘরের মধ্যে কয়েকটা পাক দিয়ে বলে, "নিয়োগীজী কিন্তু এর ব্যতিক্রম। যাই হোক, আমরা রক্তমাংসের মানুষ। বলতে পারো, এসব দেখেশুনেও আমি নীরবে হজম করি বা কোন তোয়াক্কা করি না। আমার সম্পর্কে একটা মতামত আড়ালে চলে বলে মনে হয় যে আমি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী। আমি প্রসন্নমনে সেটাও মেনে নিয়েছি। ঠিকই, আমি যখন তর্ক করি তখন হয়তো খুব খারাপভাবে অন্যকে আক্রমণ করি এবং যে তর্ক করছে সে যদি না জেনে, পড়াশোনা না করে এঁড়ের মত তর্ক করে যায়, তাহলে আমি তাকে ছাড়ি না। এইসবের জন্যে

হয়তো আমায় কেউ ঘাঁটায় না, এড়িয়ে চলে। একটা ঘটনার কথা বলি।"

সোমা হাসে, "তোমার সেই পুরানো স্বভাব।"

অভী হাসে, "একদিন নিয়োগীজীর মেয়ে এসে বলল, বাবু কিতাব চাইছে। তখনই বুঝলাম, তাঁর হাতে সময় আছে, কোন গল্প-উপন্যাসের বই উনি পড়তে চাইছেন। আমার কাছে গোরা ছিল, দিলাম। পরে একদিন স্বদেশী আন্দোলন প্রসঙ্গে তিনি কথা তুলতেই আমাদেরই একজন বেশ খারাপ ভাষায় রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ করল। ব্যস, আমি একেবারে দপ্ করে জ্বলে উঠলাম। কারণ এখনও আমার স্থির বিশ্বাস, হাতে গোণা বাঙালি গোরা পড়ে শেষ করেছে। অনেকেই হয়তো উল্টেপাল্টে দেখেছে। যাই হোক, আমিও তার জবাব দিতে শুরু করলাম।"

সোমা হাসে, "কিসে হিন্দিতে না —!"

অভী বেশ উত্তেজিত, "না, সেটা আর দেবনাগরীতে, ছত্তিশগড়ীতে জোগালো না, ঝরঝরে বাংলায়, উচ্চগ্রামে। নিয়োগীজী তখন আমাদের ঝগড়া থামাতে ব্যস্ত। কারণ ততক্ষণে আমাদের চেঁচামেচিতে বেশ ভিড় জমে গেছে। পরে এ ব্যাপারে আমার অনুতাপ হয়েছিল। জানো, আমি বার বার চেষ্টা করি, নিজের এই ব্যবহারটাকে সংশোধন করতে। নিজে বুঝি, এর মধ্যে একটা অহঙ্কার প্রকাশ পায়। আসলে আমরা এত কম জানি যে সামান্য কিছু জানতে বুঝতে পারলে মনে করি, অনেক জেনে ফেলেছি, ফলে অন্যদের তুচ্ছ জ্ঞান করি।"

সোমা জিজ্ঞাসু চোখে তাকায়, "আমারও তো তোমাকে কিছু বলতে ভয় লাগছে। তবু বলি, আমাদের আজকের সমস্যায় রবীন্দ্রনাথ কী ততখানি প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয় তোমার?"

অভী অবাক হয়ে সোমার দিকে তাকায়। সোমা অপ্রস্তুত হয়ে জিজ্ঞাসা করে, "কী দেখছো অমন করে?"

অভী আপন মনে হেসে মাথা নিচু করে, "না কিছু না, হ্যাঁ দেখছি বৈকি, তোমার চোখেমুখে আমার অল্পবয়েসটা দেখছি।"

সোমা কৌতুকের দৃষ্টিতে তাকায়, "কী রকম!"

অভী তাকায়, "কতদিনের কথা। মনে আছে স্কুলের ক্লাসে একদিন ভুঁইফোড়ের মত পদার্থবিদ্যার মাস্টারমশাইকে জিজ্ঞাসা করলাম, স্যর শুনেছি নাকি ভগবান নিউটনকে পাঠিয়ে জগতের আলো জ্বালিয়েছিলেন আবার আইনস্টাইনকে পাঠিয়ে তা নিভিয়ে দিয়েছেন; এ ব্যাপারটা কী স্যর? তখন উনি 'ব্যাপারটা' 'ব্যাপারটা' বলে মাথাটা নাড়িয়ে বার দুয়েক মুখ ভেঙ্গালেন, তারপর চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, বাবা আগে নিউটনটা শেষ কর তারপর আইনস্টাইন আসবে, নইলে তোমার ভবিষ্যৎও নিভে যাবে।"

তারপর অপ্রস্তুত সোমার দিকে আঙ্গুল তুলে বলে, "তাই তোমাকেও আমি বাধ্য হয়ে বলছি, বালিকে! আগে বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, অক্ষয় দত্ত শেষ কর তারপর রবীন্দ্রনাথে এসো। গৌরীদার মুখে শুনেছি, তাঁদের মাস্টারমশাই তারক সেন নাকি রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বলতেন, উই ডু নট ডিসার্ভ হিম।"

সোমা হাসি হাসি মুখে তাকায়, ''গুরুভক্তিটা একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে না।''

অভী হেসে জামার হাতা গোটায়, ''নিয়োগীজীও তাই বলতেন।''

তারপর তার মনে হয় কে যেন ডাকছে, পর্দা সরিয়ে দেখে চাঁদনীর ছাগলগুলি বারান্দা দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। ফিরে এসে বসে সে শব্দ করে হাই তোলে, কিছুক্ষণ সোমার দিকে তাকিয়ে থাকে, তারপর আপন মনে বলে ওঠে, ''সমস্যাটা আসলে কী জানো, আমাদের সেই সনাতন মোক্ষের সমস্যা। এটা রবীন্দ্রনাথকে সামনে রেখে মাঝে মাঝে নিজের জীবনে উপলব্ধি করার চেষ্টা করি। আবার ভাবি, মহাজনদের পথের সুবিধাটা হল, তাতে চমক নেই ঠিকই; কিন্তু পথটা সেই রোমের পজৌলি স্তম্ভের মত। কয়েক হাজার বছরের অনেক ঝড়-ঝঞ্ঝা সহ্য করেও অনেক স্মৃতি সঞ্চয় করে দাঁড়িয়ে আছে।''

সোমা বুদ্ধিমতী তাই সে কোন উত্তর না দিয়ে গালে হাত দিয়ে শুনে যায়।

অভী বলে, ''আমাদের মুক্তির উপলব্ধি হয় দু'ধরনের, এক ব্যক্তির নিজের আর এক চারপাশের সমষ্টিকে ঘিরে। আমরা এ দুই মুক্তির মধ্যে এক অদ্ভুত টানাপোড়েন সম্বল করে সারা জীবন কাটাই। এটা মানতেই হবে যে কারো কাছে ব্যক্তিমুক্তির সাধনা তুলনায় অনেক সহজ; কিন্তু যখন আমি সমষ্টির মুক্তি চাইব তখন কিন্তু আমার জীবন আক্ষরিক অর্থে ছারখার হয়ে যাবে, ঐ সুখের ঘর অনলে পুড়িয়া গেলর মত। ক'জন মানুষ এটা সহ্য করতে পারে! তুমি কী মনে কর মার্কস, লেনিন এমন মহাপুরুষদের এই ব্যক্তিমুক্তির বাসনা ছিল না? প্রবলভাবে ছিল; কিন্তু তাঁরা সমষ্টিমুক্তির স্বার্থে নিজের ষড়রিপুর সঙ্গে সমস্তক্ষণ লড়াই চালাতেন।''

সোমা দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বলে, ''সব বড় মানুষেরই এমন হয় বলছো?''

অভী যথেষ্ট আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে বলে, ''সব সব, রবীন্দ্রনাথের জীবন দেখো। সারা জীবন তিনি এই ব্যক্তিমুক্তি আর সমষ্টিমুক্তির দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন। কেননা তিনি বুঝে ফেলেছিলেন, সমষ্টিমুক্তির জন্য লাগবে পরিমাণাত্মক পরিবর্তন। এর জন্য প্রয়োজন সমগ্র দেশের আর্থসামাজিক বৈপ্লবিক পরিবর্তন। আর ব্যক্তিমুক্তির জন্য প্রয়োজন ব্যক্তির গুণাত্মক পরিবর্তন। তাঁর বাবা যতদিন বেঁচে ছিলেন, বাবার জমিদারীর অন্নে তিনি তাঁর সংসার প্রতিপালিত করেছেন, কাজেই রবীন্দ্রনাথ যেন নিজেকে দমিয়ে রেখেছিলেন। বাবা মারা যাবার পর তাঁর মুক্তি ঘটল ঠিকই; কিন্তু তখন প্রবল সমস্যা তৈরি হল সমষ্টিমুক্তি নিয়ে। আবার ততদিনে তাঁর এবং তাঁর সমগ্র পরিবারেরপরজীবী হয়ে থাকার অভ্যাস গড়ে উঠেছে। এইসব টানাপোড়েন সম্বল করে অধিকাংশ সময়ই তিনি মনে মনে নির্লিপ্ত হয়ে নিজের গানের মধ্যে বাঁচার চেষ্টা করতেন।''

সোমা খুব সাবধানে বলে, ''তাহলে এসব জেনে বুঝে তুমি নির্লিপ্ত হতে চাইছ কেন?''

অভী দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, ''তা কী আর আমি জানি, তবে আমি কিন্তু বুঝতে পারি একটা নির্লিপ্ততা আমার ছেলেবেলাকার সঙ্গী, আবার আর পাঁচজন মানুষের মত আমারও

ষড়রিপু সক্রিয়, হয়তো কোনটা কম, কোনটা বেশি। সেই রিপু থেকেই তোমার প্রতি অন্যায় করেছি। তবে এটাও ঠিক, এখন আমি কী পেতে চাই তা আমি নিজেই জানি না। কিন্তু মানুষের দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণা, মানুষের প্রতি অন্যায়-অবিচার আমায় ব্যথা দেয়। তাদের এই দুঃখ-কষ্ট, বঞ্চনা দূর করতে পারলে তবেই আমার সমষ্টিমুক্তি। কিন্তু তা কী ভাবে হবে আমার অজানা। এটা করতে হলে এর জন্য দু'ধরনের কাজ আমাদের সামনে এসে যায়। যেমন ধর কোন একটা মানুষ সেই সময়ে কষ্ট পাচ্ছে তার সেই সময়ের কষ্টটা লাঘব করতে হবে। এটা ক্ষণিক সত্য আর দীর্ঘদিন ধরে, অর্থাৎ মৃত্যুর আগের দিন অব্দি আমাকে কিছু কাজ করে যেতে হবে, সমাজটাকে পাল্টাতে হবে, এই নিত্য সত্য তার পাশাপাশি ভাবনা।"

তারপর সোমার আগ্রহী মুখ দেখে অভী নিজেকে ব্যাখ্যা করে, "যেমন ধর, ঐ গ্রামীণ শল্যবিদদের সংগঠনে যখন বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়, তখন মনে হয় এইসব বিষয়ে কত কিছু কাজ করার আছে। এরা কতখানি কূপমণ্ডুক। এদের সমাজ সচেতনতা কত কম, এরা শুধু বইপড়া বিদ্যের জাহির করে। আমাদের দেশের গ্রামের অশিক্ষিত মানুষদের চাহিদা সম্পর্কে এদেরকে মানে এই শল্যবিদদের সচেতন করতে পারলে এরাও ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় মানুষের জন্যে সেই শিক্ষাকে কাজে লাগাতে পারবেন। আবার ঐসব কাজ করি বটে, কয়েকদিন খুব তেড়েফুঁড়ে লেগে যাই, তারপর সব উৎসাহ যেন শুকিয়ে যায়। তখন আমায় ডেকে ডেকে কেউ সাড়া পায় না।"

সোমা জানতে চায়, "কেন উৎসাহ হারিয়ে ফেল, কী মনে হয় তখন?"

অভী হাসে, "কী মনে হয় জানো, কখনো মনে হয় কী হবে এসব করে! এসব না করলেই বা এ জগৎ-জীবন-সংসারের কী এলো গেলো! আমাকেই যে এসব করতে হবে, এমন মাথার দিব্যিই কে দিয়েছে? আমার একটাই জীবন, আমি কেন প্রকৃতির এই রূপ-রস-গন্ধই উপভোগ করব না। আমি মরে গেলে তো আর দেখতে আসছি না কী রইলো আর কী গেলো! সুতরাং যতটুকু পারব নিজেকে কষ্ট না দিয়ে ফাঁকি না দিয়ে কাজ করব, তাতে কাজ যা হয় হবে। আবার কখনো মনে হয়, এইসব করে আর ক'টা মানুষের উপকার হবে। তার চেয়ে সমাজটাকে পাল্টে দিতে পারলে সমস্ত মানুষের কল্যাণ হবে। তখন মনে হয় এই রাজনীতির কাজে নিয়োগীজীকে সাহায্য করা দরকার, এসব করতে পারলে অনেক মানুষের উপকার হবে। তখন কাজটা সরাসরি রাজনীতির হলেও তাতে হয়তো ঝাঁপিয়ে পড়ি। কিন্তু সেখানেও যে সব সময় স্বস্তি পাই তা নয়। হয়তো সেখানেও ধাক্কা খাই, আবার নিজের কাজের জায়গায় ফিরে আসি।"

বেশ কিছুক্ষণ অভী চুপ করে থাকে, সোমাও কোন কথা বলে না, চাঁদনী তাদের পাশে কারণে অকারণে ঘুরে বেড়ায়।

বারান্দায় দুটো হুলো বিড়াল ঝগড়া করে, চাঁদনী লাঠি হাতে তাদের তাড়াতে যায়। সোমা

ইশারায় তাকে নিষেধ করে, হাত দিয়ে দেখায় কামড়ে দেবে। চাঁদনী হেসে নিরস্ত হলে সে আবার অভীর দিকে মনোযোগী হয়।

অভী কী একটা পড়ছিল, সেটা বন্ধ করে মাথা চুলকে সোমার দিকে তাকিয়ে থাকে, "কখনো ভাবি, আমি যে কাজটা ভাল প্যারি সেটাই করব অন্য কাজে মাথা ঘামাবো না। কখনো ভয় লাগে, মনে হয় এইসব করতে গিয়ে যদি পিতৃদত্ত প্রাণটাই যায়। আবার সারা দেশের রাজনীতির এই জঘন্যতম পরিবেশ দেখে ঘেন্না লাগে, মনে হয় এর থেকে শত যোজন দূরে থাকাই মঙ্গল। তারপর রাজনীতির যে কোন কাজে নেমে যখন দেখি এ অসম্ভব কাজ, আমি কেন আমার চোদ্দটা পুরুষও এই জগদ্দল পাথরের এক ইঞ্চিও নড়াতে পারব না, তখন হতাশ হই ছেড়ে দি-ই। তবে একটা বিষয় তোমায় নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, হাসপাতালে যতক্ষণ থাকি, মানুষের কষ্ট দেখে ঐ কষ্ট লাঘব করার আপ্রাণ চেষ্টা করি। তখন আমি অন্য মানুষ, তখন ঐ একগাদা দার্শনিক চিন্তা মাথার মধ্যে ভিড় করার সুযোগ পায় না। এসব হয় যখন একা থাকি।"

সোমা যেন এবার সুযোগ পেয়েছে, বিছানা ছেড়ে উঠে বসে, "তাহলে একা যাতে থাকতে না হয় তার একটা ব্যবস্থা কর।"

অভীক চিন্তামগ্ন হয়ে যায়, "ভয় করে যদি মানিয়ে নিতে না পারি। মাঝে মাঝে মনের মধ্যে একটা প্রবল জৈবিক চাহিদা অনুভব করি; কিন্তু তখন নিজেকে কঠোরভাবে শাসন করি।"

সোমা জানতে আগ্রহী, "এর মধ্যে আশেপাশে কেউ আসেনি যার সঙ্গে ঘর বাঁধতে পারো।"

অভী চাঁদনীর দিকে তাকায়, "না তেমন কেউ না, তাছাড়া এলেও কাছে ঘেঁষতে দিই না।"

বাইরে কড়া নাড়তে চাঁদনী বেরিয়ে যায়। তারপর কয়েকটা চিঠিপত্র এনে অভীর হাতে দেয়। অভী তাতে চোখ বুলিয়ে পাশে সরিয়ে রাখে।

তারপর একটু চুপ করে থেকে অভী বলে, "ভোপালে পড়ার সময় একটি মেয়ের আমাকে খুবই পছন্দ হয়েছিল। আমিও কয়েকদিন ঘুরেছিলাম ওর সঙ্গে, নিছক কৌতূহলবশে, ওকে বলতে পার ওদের জানার জন্য। ওরা প্রবাসী বাঙালি, এদেশে অসংখ্য বাঙালি আছে। তাদের সম্পর্কে আমার মোটেই কোন ভাল ধারণা হয়নি। যাই হোক, ওদের পরিবারের একটা মান আছে, তবে পরিবেশটা ভোঁতা ধরনের, সাধারণ ভোগবাদী বিত্তের অহঙ্কারী। খানিকটা লোক দেখানো ব্যাপার আছে। ওর বাড়িরও আমাকে বেশ পছন্দ ছিল। আমার ভেতরটা তো আর জানে না, অযথা খাপ খুলে লাভ কী। মেয়েটি খুব পীড়াপীড়ি করেছিল, ওখানে একটা নার্সিংহোম বানিয়ে দু'জনে কাজ করার জন্য। আমার মনে হল, এটা নিছক বাঁচার জন্য বাঁচা, শুধুমাত্র জীবনধারণের ব্যবস্থা করা। বাধ্য হয়ে আমার অবস্থানটা একদিন ওকে খুলে বললাম তাতে

ঐ মেয়েটিও কষ্ট পেয়েছিল।"

সোমা তাকায়, "আসলে মনে মনে ও হয়তো অনেকখানি আশা করেছিল।"

তারপর অভীর দিকে চোখ বুলিয়ে মুচকি হেসে বলে, "হ্যাঁ তোমার চেহারাটা তো এখনও রমণীমোহনের মত।"

অভী হো হো করে হাসে, "তাহলে তোমাদের অভিশাপ শেষ পর্যন্ত কাজে আসেনি বল, চাষা-ভুষোদের সঙ্গে থেকে এখনও বদলাইনি।"

সোমা অপ্রস্তুতের হাসি হেসে ধীর গলায় বলে, "তা তুমি কোনদিনই বদলাবে না। এটা তোমার প্রকৃতি।"

অভী যেন খুশি হয়, "দারুণ খুশি হলাম, প্রশংসা পেলে কার না ভাল লাগে। আবার শিক্ষিতা মহিলার প্রশংসা, যা আমাদের দেশে দুর্লভ, তাও আবার মূল্য না দিয়ে পাওয়া। যাক্ তারপর থেকে এই কান মলে প্রতিজ্ঞা করেছি আর কাউকেই কাছে ঘেঁষতে দেব না।"

সোমা হাসে, "অতএব ব্রহ্মচর্য পালন করবে এই তো।"

অভীকও হাসে, "ব্যাপারটা ঠিক তা নয়, নিজেকেই আমি ঠিকমত চিনি না, সুতরাং আমার জন্য কেউ কষ্ট পাবে — এটা ভাবতে বড় খারাপ লাগে। ঐ মেয়ে কতখানি কষ্ট পেয়েছে দেখো, বার বার চিঠি দিত। তখন আমি দেখলাম, আমাদের কাজের জায়গাটা ওকে দেখানো দরকার। তাহলে ও খানিকটা আন্দাজ করতে পারবে, তখন আমার আশা ছেড়ে দেবে। তুমি অবাক হবে, মোহ কাকে বলে, ও এখানে এল, এখানে ও দু'বার এসেছে। সবার সঙ্গে মিশেছে, কয়েকটা অপারেশনও করেছে। এখানে থাকতে রাজী হয়েছে। আমি যা চাই তাতেই ও রাজী হয়েছে।"

সোমা অভীকে বাধা দেয়, "হয়তো আন্তরিকভাবেই তোমাকে চেয়েছিল।"

অভী মাথা নাড়ে, "কিন্তু আমার মন সায় দিচ্ছে না। আমার কেবলই মনে হয়েছে, ও এক পরিবেশে মানুষ হয়েছে, এখন একটা মোহে পড়ে হয়তো আমি যা বলছি তাতে রাজী হচ্ছে; কিন্তু পরে ঠিক পিছনের দিকে টানবে। তখন অশান্তি শুরু হবে। আর একটা জিনিস আমি বুঝে ফেলেছি, আমার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করলে আমি নিষ্ঠুর হয়ে উঠব। আর ও জানে না, আমরা কত কষ্টের মধ্যে জীবনধারণ করতে অভ্যস্ত। সারা জীবন কারো পক্ষে এমন দুঃখবিলাসী, দুঃখবিনাশী হয়ে কাটানো মুখের কথা নয়। তখন 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি' অবস্থা হবে।"

সোমা গম্ভীর চোখে তাকায়, "দেখতে কেমন ছিল?"

অভী চোখ বড় বড় করে বলে, "বাব্বা, তুমি যে মাস্টারনীর মত জেরা করছ?"

সোমা হেসে ওঠে, "মাস্টারনীকে বিচার করতে হবে না, এ ছেলে কেন জীবনের পাঠশালায় ঢুকতে চায় না। শুধু পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে, এই পালিয়ে যাওয়া রোগের কারণটা কী? একটা ধাপ তো বুঝলাম। কালচারে মিলমিশ হচ্ছে না। তাহলে এর পরের ধাপেই আসে —!"

অভী, সোমার দিকে কিছুক্ষণ সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে, "বেশ, তাহলে বলতেই হয়, বাইরে লাবণ্য ভরপুর অর্থাৎ —!"

সোমা তার কথা লুফে নিয়ে বলে, "অর্থাৎ আমাদের মত খেঁদি পেঁচি খাঁটি দেশজ নয়, রক্তের মিশেল আছে, স্নংকর জাতীয়।"

অভী তাকায়, "একেবারে খাঁটি কথা, তোমার বুদ্ধির তারিফ না করে পারছি না।" তারপর চেয়ারের হাতল চাপড়ে বলে, "কিন্তু এখানে আমার প্রসঙ্গ আলাদা। আমি চাই অন্যের কষ্ট লাঘব করতে, কিন্তু আমার কাজের জন্য কেউ যেন কেউ কষ্ট না পায়। তবু জানি, আমার ব্যবহারে অনেকে কষ্ট পায়। এটা ভেবে মনের মধ্যে অনুতাপ হয়।"

সোমা আশ্চর্য হওয়ার ভঙ্গিতে বলে, "এ আবার কী কথা শুনি? জগতে কোটি কোটি নরনারী এসব সমস্যা নিয়েই বিয়েশাদি করছে।"

অভী মাথা নাড়ে, "আমার ভুলের জন্য কেউ কষ্ট পাক, এ আমি চাই না। আমি স্বীকার করি, আমার ভুল, অজ্ঞতার জন্য অনেক রোগী মারা গেছে, তখন মনের মধ্যে খুব কষ্ট পেয়েছি। কারণ আমি তো আর একটা জীবন কাউকে দিতে পারব না, আর যে রোগীটি হয়তো আমার ভুলে মারা গেল সে আমার কাছে সাহায্যপ্রার্থী হয়েছিল, আর আমার কৃতকর্মের জন্য ওর জীবন সংক্ষিপ্ত হয়ে গেল।"

একটু চুপ করে থেকে অভীক বলে, "একটা কথা মনে পড়ে গেল, তোমায় বলি। হয়তো তুমি ভাবছ, লোকে বেকায়দায় পড়লে নানা গুরুঠাকুরের নাম নেয়, তফাতটা আর কী, এ মানুষটাও কথায় কথায় কোন না কোন পীরের নাম স্মরণ করছে।"

চাঁদনীর মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে সোমা খিলখিল করে হেসে ওঠে, "না, আমি মোটেই তা মনে করছি না। তুমি স্বচ্ছন্দে নাম নিতে পারো, তাঁদের কথা শুনলেও পুণ্য।"

অভী আশ্বস্ত হবার ভঙ্গিতে বলে, "বেশ শুনে খুশি হলাম। তা একবার আমার কথা শুনে রামকৃষ্ণদা খুব উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, রাজনীতি নিয়েই কথা হচ্ছিল। কথাটা হচ্ছিল, কোন একটা বুর্জোয়া পত্রিকায় বলেছে, আমাদের চরিত্র হল, বার বার আমরা একই ভুল করি আর ঐ একই ভুলের জন্য বার বার বলি, আমরা ভুল করেছি। তাই খুব কঠিনভাবে রামকৃষ্ণদা বললেন, বার বার একই ভুল করে মার্জনা চাওয়াতে গৌরববৃদ্ধি হয় না। যদি কোন একটা বিষয় আমরা বুঝতে পারি ভুল হয়েছে বা হচ্ছে তাহলে সেই ভুল থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত এবং নিজেদের সংশোধন করা উচিত। আর খেয়াল রাখা উচিত যাতে ঐ ভুলের পুনরাবৃত্তি না ঘটে।"

সোমা যেন চিন্তিত মুখে বলে, "বলছ বটে; কিন্তু মানুষের ভুলের পেছনেও একটা যুক্তি থাকে। মানুষকে বুঝতে হলে তার ভুলগুলোও ভাল করে বোঝা দরকার হয়।"

কিন্তু এ কথা শুনে অভী চুপ করে আছে দেখে সোমা বিছানা থেকে উঠে বলে, "অবশ্য ঠিক এই বিষয়টা নিয়েই আমার সঙ্গে সহকর্মীদের ঝগড়া হয়।"

তারপর কী ভেবে মাথা নিচু করে অন্যমনস্ক হয়ে পরে মাথা তুলে সোমা বলে, "আচ্ছা একটা কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করি। সংসারে মেয়েরা পিছনের দিকে টানে বলেই কী ছেলেরা এগিয়ে যেতে পারে না।"

একটু ভেবে নিয়ে অভী হাসে, "আঁতে ঘা দিয়েছি বোধহয়। বেশ ধর, মেয়েরা তো পিছনের দিকে টানবেই, তাদের শিক্ষা কম, জ্ঞান কম, অভিজ্ঞতা কম, তাদের ছেলেমেয়ে মানুষ করতে হয় —।"

সোমা তাকে কথা জুগিয়ে যায়, "সুতরাং তুমি তাকে যে ধর্মের কাহিনীই শোনাও শেষমেশ তার মন পড়ে থাকে সংসারে। আর তার মানুষটাকে ঐ সংসারে টেনে ধরে রাখতে পারলে তারই সংসারের সুবিধা। তাহলে এটাই কী পুরুষদের এগিয়ে না যেতে পারার কারণ বলে তোমার মনে হয়।"

অভী অঙ্গসঞ্চালন করে হাসে, "তুমি এমন একজনের কাছে এসব বিষয়ে বিশেষজ্ঞের মতামত চাইছ যার এ ব্যাপারে কোন অভিজ্ঞতাই নেই।"

এ ব্যাপারে সোমা কিছু বলতে চাইলে অভী বলে ওঠে, "আমি কিছু বলিনি, তুমিই কিন্তু এই শিরোপা আমায় দিয়েছো।"

সোমা তখন চাদরটা ভাল করে জড়িয়ে নিয়ে কপট রাগ দেখিয়ে বলে, "তুমি খুব ভাল করেই জানো, আমি ঠিক লোককে ঠিক কথা জিজ্ঞাসা করেছি। এত দাম বাড়াও কেন?"

অভী তাকে থামায়, "আচ্ছা আচ্ছা, আর বলব না। আমি যা বুঝি তোমায় বলতে পারি, অগ্রজদেরও দেখছি তো। তবে এইসব বিষয়গুলো এমনই জটিল যে চট করে কোন মতামত দিতে হলে অনেক সময়ই দেখেছি ভুল হয়ে যায়। কারণ কোন একজন মানুষকে তার স্থান-কাল-পাত্র-পরিবেশে বিচার করা উচিত।"

সোমা হাসে, "চতুর্মাত্রিক পদ্ধতিতে!"

অভী সায় দেয়, "হ্যাঁ, সে মনোভাব আমাদের অনেক সময়েই তো থাকে না। আমরা খুব নিজের মত করে সবটা দেখি আর মতামত দি-ই। তবে একটা কথা মানতেই হবে, কোন অবস্থাকে টপকে যাওয়া, ধর সেটাকে অতিক্রম করার ব্যাপারটা অনেকখানি নির্ভর করে ব্যক্তির নিজস্ব ক্ষমতার ওপর।"

সোমা কিছু বলতে চাইছিল; কিন্তু সে সোমাকে থামিয়ে বলে, "আমি আগে বলে নিই। যেমন ধর আমরা দুটো শিবিরের কথা বলি একটা ওদের শিবির বা শত্রুর শিবির, আর একটা আমাদের গরিব খেটে খাওয়া মানুষদের শিবির। তা অনেকে এমন একটা ভাব দেখান যে তাদের খুব ইচ্ছা ছিল, এখনও আছে, গরিব মানুষদের জন্য কাজ করার; কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে নানা চাপের মুখে থাকার জন্যই তারা কিছু করতে পারছে না। এ ব্যাপারে তারা পরিবারের সমস্যাগুলো কারণ হিসাবে দেখান। এইসব ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর জন্য পরিবারে অশান্তি হচ্ছে, এমনই শুনি।"

সোমা গম্ভীর হয়ে বলে, "অশান্তি হয় তাও সত্যি।"

অভী মাথা নাড়ে, "অস্বীকার করছি না; কিন্তু তখন আমার যা মনে হয়, আমি তখন নিজেকে তার জায়গায় রেখে তুলনা করার চেষ্টা করে দেখি, আমি হলে এক্ষেত্রে কী করতাম। দেখো, ছেলেপিলে মানুষ করা একেবারে অন্য ব্যাপার। আমরা ঠাট্টা করে বলি, ছেলেপিলে বড় হলে বাপ-মায়ের চুল খাড়া হয়ে যায়। অনেক বড় বড় মহাজনের ছেলেমেয়েরা তোমার ভাষায় ঢ্যাড়স, বেগুন। আমরা তাদের কথা বলতে লজ্জা পাই। আবার মহাপুরুষের ছেলেমেয়ে হলে তার সুবিধাও আছে, তেমনি অসুবিধাও আছে। তবে যার ক্ষমতা আছে তাকে কেউ কোথাও আটকে রাখতে পারে বলে মনে হয় না। কেউ যদি তার কাজটার প্রতি একনিষ্ঠ হয়, তাহলে যে কোন প্রতিকূল পরিবেশ-পরিস্থিতিকে সে টপকে যাবেই। বাধা পেলে কেউ হয়তো তার সম্পূর্ণ ক্ষমতা উজাড় করে দিতে পারে না; কিন্তু অনেকখানি পারে।"

সোমা তাকে বাধা দিয়ে জিজ্ঞাসা করে, "তা সে যত বাধাই থাক্?"

অভী নিশ্চিত ভঙ্গিতে বলে যায়, "হ্যাঁ, তা সে যত বাধাই তার সামনে আসুক। এমন তো আমরা আকছারই দেখি যে হাজার অসুবিধাকে স্বীকার করে নিয়ে এক একজন মানুষ অসম্ভব ভাল কাজ করছেন। নিশ্চয়ই পরিবেশ-পরিস্থিতি সাহায্য করলে কাজটা ভাল হয়; কিন্তু ব্যক্তির ক্ষমতাটা হয়তো শেষ বিচারে নির্ধারক হয়ে দাঁড়ায়।"

সোমা উঠে বসে, "তাহলে ব্যক্তির ক্ষমতাটাই আসল?"

অভী সংশয় প্রকাশ করে বলে, "কী জানি আমাকেও অনেকে বলেন শুনি, স্ত্রীরা পেছনের দিকে টানে বলে আমাদের এগিয়ে থাকা শ্রমিক কমরেডরাও অনেক কিছু করতে পারেন না। আমার কেমন জানি, বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে না।"

সোমা সায় দেয়, "আমারও কতকটা তাই মনে হয়।"

তখন অভী গলার স্বর খাটো করে বলে, "তেমন ধরলে নিয়োগীজীও তাঁর পরিবারকে কতখানি কষ্ট দিয়েছেন তুমি ভাবতে পারবে না। তাই দেখে মাঝে মাঝে আমারও মনে হত, তাঁর বিয়ে করা উচিত ছিল না। বিয়ে করে সংসারটা বাড়িয়ে তারপর সকলকে কষ্ট দেওয়া — কী জানি!"

সোমা কোন কথা না বলে চুপ করে থাকে।

অভী যেন তার চিন্তাতেই মশগুল, "আরও মনে হয় একটা কারণে, যেমন ধর কিছু করা না করা, এটা তো শুধুমাত্র সেই সময়ের ব্যাপার নয়। আমরা তো মুখে বলি, একজন কমিউনিস্ট জীবনের শেষদিন অব্দি লড়াই করেন। তাহলে এটা হতেই পারে কোন একটা সময় হয়তো আমার খুব খারাপ যাচ্ছে; কিন্তু আমার ভাল সময়ও তো আসে। তখনও দেখা যাচ্ছে, আমি কিছু করছি না। তাহলে মানব কী করে এই কারণগুলির জন্য করতে পারছি না।"

সোমাও মাথা নাড়ে, "আমারও তাই মনে হয়, আমাদের সহকর্মীদের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি তো, তারা সামান্য কাজ দীর্ঘদিন ধরে ফেলে রেখে দেয় আর নানা অজুহাত দেখায়।

কিছু বললে বলে, তোমার আর কী সংসার, আমাদের মত সংসার করতে হলে তবে বুঝতে।"

অভী দীর্ঘশ্বাস ফেলে, "মনটাই আসল, আমি যদি মনে করি, মনস্থির করি কোন একটা কাজ করব, তাহলে নিশ্চয়ই তার জন্য একটা উপায় বার করতে পারি। তার জন্য হয়তো সময় লাগতে পারে। আসলে কোন একটা কাজে দীর্ঘদিন লেগে থাকার ধৈর্য বা অধ্যবসায় হয়তো আমাদের থাকে না।"

সোমা আগ্রহীর চোখে তাকায়, "তা তো হল, এখন তুমি ভবিষ্যতের কথা কী ভাব কও দিকি?"

অভীক চিন্তামগ্ন হয়, "তা তো জানি না! তবে এটুকু তোমায় জোর গলায় বলতে পারি, যাই করি না কেন, এ দেশের খেটে খাওয়া গরিব মানুষের স্বার্থে কাজ করে যাব। আসলে নিয়োগীজী মারা যাবার পর আমাদের সবার মনে একটা বিশাল ধাক্কা এসেছে। এতদিন একরকম-ভাবে জীবন কাটাবার কথা ভেবে একটা হিসাব করে এসেছিলাম। উনি আমাদের কাছে ছিলেন প্রায় হিমালয়ের মত, সমস্ত ঝড়-ঝঞ্ঝা বুক পেতে নিতেন, আমাদের আড়াল করতেন। আমরা পরম উৎসাহে আমাদের কাজ করে যেতাম। হয়তো এই অবস্থাটা থেকে আরও কিছুদিন থিতু হতে সময় লাগবে, তারপর যে চোরা স্রোতগুলো গোপনে গোপনে চলত তারা এখন সামনে এসে যাচ্ছে। এইসব মিলিয়ে কী যে দাঁড়াবে তা এখনই তোমায় বলতে পারছি না।"

সোমা বিজ্ঞের ভঙ্গিতে বলে, "কিন্তু আজ হোক বা কাল হোক সিদ্ধান্ত একটা তোমায় নিতেই হবে।"

অভী হাসে, "নিশ্চয়ই। শোন তোমায় বলি, আমার এ ক'দিনের কথা শুনে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো, জীবনে চলার পথে এতদিনে অনেক মানুষের সংস্পর্শে এসেছি; কিন্তু গৌরীদা, রামকৃষ্ণদা দু'জন ব্যক্তি আমার জীবনে অনেকখানি মূল্য পান। এবার যখন কলকাতা গেলাম দু'জনের সঙ্গে দেখা করলাম। দু'জনেই নিয়োগীজীর এই হত্যাকাণ্ডে যারপরনাই ব্যথিত, বলে দিলেন কিছু সাহায্য করার থাকলে তাঁরা তা করতে প্রস্তুত। রামকৃষ্ণদা তো নিয়োগীজীর কাজকর্মের ব্যাপারে উচ্ছ্বসিত। কিন্তু কথা বলে দেখলাম, দু'জনে যেন দুই মেরুতে।"

সোমা হাসে, "দু'জন দুটি দলের প্রতিনিধি।"

অভী হাসে, "গৌরীদাকে যাই বলি না কেন, তাঁর কথার মধ্যে সেই নির্লিপ্তির সুর, মানুষ কী ভাল থাকতে চায়? তুমি চেষ্টা করেও কী মানুষের ভাল করতে পার? ক্ষণিক সুখ-ভোগের তাড়না মানুষকে এমন ছুটিয়ে নিয়ে বেড়ায় যে সে যেন চোখের সামনে আর কিছু দেখতে পায় না। তুমি মানুষকে যতই দাও না কেন, তার চাহিদা তুমি পূরণ করতে পারবে না। আসলে সে কী চায় তা সে নিজেই জানে না।"

সোমা যেন নিশ্চিত, "এই নির্লিপ্তি তোমায় পেয়েছে।"

অভী মাথা নাড়ে, "গৌরীদা এখন ভারতীয় ধর্ম-দর্শনের মধ্যে এইসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে

বার করার চেষ্টা করছেন। তাঁর মনের মধ্যে যেন এক গভীর আধ্যাত্মিক চেতনা পাক খেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। হতে পারে, এই একই চেতনার বোধ থেকে তিনি কোন চরম ন্যায়, চরম সামাজিক বিচার প্রতিষ্ঠা করার আশায় এই সমাজ-সংসারে সারা জীবন লড়াই করেছেন। কিন্তু তাঁর জীবদ্দশায় তিনি ভাল কিছু দেখতে পেলেন না। তাই এখন শুধু হাতড়াচ্ছেন, কোথায় আমাদের মুক্তি লুকিয়ে আছে, কোন্ অন্ধকূপের মধ্যে থেকে উদ্ধার পেলে!"

তারপর একটু দম নিয়ে গলার স্বর নামিয়ে অভী বলে, "একটা **স্বরবিতান** টেনে নিয়ে আমায় বললেন, এ গান তুমি শোননি নিশ্চয়ই, তেমন একটা কেউ গায় না। তারপর কবিতায় সুর করে শোনালেন —

"... কান্না আমার সারা প্রহর তোমায় ডেকে
ঘুরেছিল চারিদিকের বাধায় ঠেকে,
বন্ধ ছিলেম এই জীবনের অন্ধকূপে —
আজ এসেছ ভুবনমোহন স্বপনরূপে।। ..."

খুব খারাপ লাগছিল, আমার সামনের এই মানুষটাকে কত ঋজু, কঠোরভাবে লড়াই করতে দেখেছি।"

বালিশে মুখ চেপে সোমা বলে, "কিন্তু সব মিলিয়ে ব্যাপারটা ভাবলে কী সাঙ্ঘাতিক না!"

অভী যেন সে কথার গুরুত্ব না দিয়ে বলে, "কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমি থাকতে না পেরে বলেই ফেললাম, গৌরীদা এ তো ব্যক্তিমুক্তির যাতনা, আমার গরিব মানুষ, তাদের পীড়ন, তাদের সেই উলঙ্গ অভাব, হা-মুখ ক্ষুধা — আমি এই অস্ত্র দিয়ে দূর করব কী করে! তা যদি না করতে পারি তাহলে আমি তো মরেও শান্তিও পাব না। এ মুক্তি নিয়ে আমি কোন্ স্বর্গে যাব!"

কিন্তু গৌরীদা তাঁর সেই পরিচিত ভঙ্গিতে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন, আমার সঙ্গে তর্ক করলেন না, শুধু অতি পরিচিত নিচুস্বরে বললেন, "কী জানি!"

হঠাৎ অভী নড়েচড়ে বসে, "এবার একটু এন্টি-ক্লাইমেক্স করি।"

সোমা অবাক হয়ে অভীর দিকে তাকায়। অভী বলে চলে, "একবার কলকাতার বইমেলায় গৌরীদা রেমব্র্যান্ডের একটা ছবি আঁকার বই সস্তায় পেয়ে গেছেন। সেটাই মাঠের ওপর দাঁড়িয়ে বিভোর চোখে দেখছেন। ওর মধ্যে একটা ছবি ছিল স্নানরতা কয়েকটি নগ্ন মহিলার ছবি। গৌরীদা বিভোর হয়ে এর অন্তর্নিহিত বিদেহী সৌন্দর্য উপলব্ধি করছেন, এমন সময় কয়েকটি চ্যাংড়া ছেলে ঝুঁকে বলল, দাদু কত নিল।"

সোমা খিল্‌খিল্ করে হেসে ওঠে।

তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে অভী বলে, "যাই হোক, এই ধরনের মানুষের ঐরকম পরিণতি যেন ভাবতে পারছিলাম না। কিন্তু কিছু বলিনি, মাথা নিচু করে সব শুনে চলে

এসেছি। শুধু মনে হয়েছে, গৌরীদা যখন এইসব বলছেন তখন বিষয়গুলো নিয়ে ভাবতে হবে।''

সোমাও যেন অভীর মত ভাবতে থাকে, ''বয়স বাড়লে কী বড় মাপের মানুষদের এমন হয়! তোমার কাছেই শুনেছি মায় বিদ্যাসাগর থেকে তলস্তয় অব্দি এঁরা সবাই নাকি শেষ জীবনে মানুষের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে এমন নির্লিপ্ত হয়ে গিয়েছিলেন।''

অভী যেন আজ একটু অন্য কথা বলতে চায়, তাই সে কেশে গলাটা পরিষ্কার করে বলে, ''হতে পারে তাঁরা হয়তো অনেক কিছু দেখবেন বলে আশা করেছিলেন। সেই আশা-ভঙ্গের বেদনায় —! কিন্তু রামকৃষ্ণদা যেন আগের থেকেও আরও প্রখর আরও দীপ্ত। রামকৃষ্ণদার নতুন লেখাটা সম্পর্কে তোমায় কিছু বলিনি বোধহয়।''

তারপর হাই তুলে বলে, ''এক আধবার নিশ্চয়ই কথা প্রসঙ্গে এসেছে, ভুলে গেছো, এটাই স্বাভাবিক। এ ক'দিনে এত অনর্গল কথা হচ্ছে, আর বাঙালিদের বদনামই হচ্ছে তারা আড্ডাবাজ। গৌরীদা বলেন উন্নতমানের আড্ডা। তাছাড়া আমাদের বিষয়েরও অভাব নেই। সুতরাং —। আমার জীবনেও বোধহয় এটা একটা রেকর্ড।''

সোমা তাকায়, ''তাও এইভাবে একটা ঢাকের বাঁয়ার মত এলেবেলে মহিলার সঙ্গে সমস্ত কাজ ফেলে তোমার মত কর্মবীর এত সময় নষ্ট করছে।''

অভী কী যেন বলতে যায়, সোমা তাকে হাত দিয়ে বাধা দেয়, ''থাক্ আর কিছু বলতে হবে না, আমি জানি তুমি কী বলবে?''

অভী তার হাত ধরে ফেলে, ''আরে না শুনে তুমি চেঁচাচ্ছ, আগে শোনই না।''

ওদের তর্কাতর্কি দেখে চাঁদনীও হাসে। এই মানুষটাকে চাঁদনীরও এ কয়েকদিন কেমন অন্যরকম লাগছে। চাঁদনীর কাছে সেই রাশভারি মানুষটা কেমন সহজ-সরল হয়ে গেছে। চাঁদনী যেন অনুমান করতে পারছে, এই বাঈয়ের গুণে এমনটি হয়েছে। বাঈকেও তার খুব ভাল লেগে গেছে, তাই সে আর উদ্‌ভ্রান্ত হরিণ শিশুর মত ঘুরে না বেড়িয়ে এই বাঈয়ের আশেপাশেই বেশি সময় ঘুর ঘুর করে।

তারপর সোমা থেমে গেলে অভী শুরু করে, ''ওমর খৈয়ম তাঁর রুবায়েতে এক জায়গায় বলছেন — এক ঘটি মদ, একটা কবিতার বই, এক টুকরো রুটি আর তোমাকে যদি পাই তাহলে জাহান্নামও আমার কাছে স্বর্গ হয়ে উঠবে।''

সঙ্গে সঙ্গে সোমা মুখ ঝামটে বলে, ''থাক্ থাক্ অনেক আদিখ্যেতা হয়েছে।'' তারপর প্রসঙ্গ পাল্টে বলে ওঠে, ''তোমার রামকৃষ্ণদাও কী ইংরাজীর প্রফেসর?''

অভী আড়িমুড়ি ভাঙ্গে, ''সব সব।''

তারপর চারপাশে তাকিয়ে গলার স্বরটা নিচু করে সোমার মুখের কাছে গিয়ে কোন গোপন কথা বলার ভঙ্গিতে বলে, ''মনে রাখবে, এটা একই সঙ্গে ডায়ালেকটিকস ও দুর্ভাগ্য যে আমাদের চারপাশে যাঁদের আমরা মানুষ হিসাবে গণ্য করি তাঁরা সবাই ইংরাজীর প্রফেসর।''

সোমা হেসে ওঠে, "তুমি এমনভাবে বলছ, এই শুনে সবাই তোমায় লাঠি নিয়ে তাড়া করবে।"

অভী দীর্ঘশ্বাস ফেলে, ব্যঙ্গ করে বলে, "তাতে কী সত্যিটা মিথ্যে হয়ে যাবে, সত্য যা তা তো সত্যই। মার্কসের লেখায় দেখোনি, ইংরেজরা আসার পর এই জাতি মানুষ হয়েছে। আর বাঙালিদের সৌভাগ্য হল, এই দেশে প্রথম ইংরেজরাই তাদের সব কিছু হাতে ধরে শিখিয়েছে। তারাও খোলামনে ইংরেজদের জড়িয়ে ধরেছিল। কিন্তু বাঙালিরা নিমকহারাম তাই তারা সব থেকে বেশি সন্ত্রাসবাদী ক্রিয়াকলাপ করে ইংরেজদের বিব্রত করেছে।"

সোমা হাসে, "পঞ্জাবীদের মত নয়।"

অভী প্রতিবাদ করে, "না না, এমন ছিঁচকে চুরির কাজ পঞ্জাবীরা করেনি। চোর নামও হল; কিন্তু কিছু করে দেখাতে পারলাম না। ক্ষুদিরাম বোমাটাও ভাল করে ছুঁড়তে পারেনি। যাই হোক, বিরক্ত হয়ে ওরা তো দিল্লী চলে গেল। কিন্তু যাবার সময় অভিশাপ দিয়ে গেল, আমরা তা দিয়ে তোমার যে বিকাশ শুরু করেছিলাম এটা সম্পূর্ণ হবে না, অর্ধেক হবে। আমরাও আটকে গেলাম, একদিকে রবীন্দ্রনাথ অব্দি ভালই হল; কিন্তু অন্যদিকে সত্যেন মেঘনাদে গিয়ে হুঙ্কার ছাড়লাম। প্রফুল্ল রায় গালাগালি দিলেন, ব্যাটারা হারামজাদা। কিন্তু ততদিনে তারা পালিয়েছে। এটাও ডায়ালেকটিকস জানবে, মানুষ যাকে সব থেকে বেশি চায় ও ভালবাসে তাকেই সব থেকে বেশি আঘাত করে।"

অভীর কথা শুনে সোমা শাড়ির আঁচলে আঙুল জড়াতে জড়াতে হাসে।

অভী শেষ করার ভঙ্গিতে বলে, "যুদ্ধ দরকার বুঝলে, যুদ্ধ ছাড়া কোন জাতি গড়ে ওঠে না।"

সোমার যেন কোন কথা মনে পড়ে যায়, "জানো, এই কথাটাই আমি সেদিন আলোচনা করছিলাম তাতে আমায় বন্ধুরা খ্যাপালো।" তারপর অভীকে মনে করিয়ে দেবার ভঙ্গিতে বলে, "রামকৃষ্ণদা কী বললেন?"

অভী চাঁদনীর দিকে অঙ্গভঙ্গি করে বলে, "তা চার্বাকের চেলা রামকৃষ্ণদা হচ্ছেন আমার পাড়ার দাদা, আমরা তাঁকে এ কালের পরমহংসদেব বলি। কারণ আমরা বুঝতে পারি, তাঁর নাগাল পাওয়া মুশকিল, তাঁর মাথাটা আকাশে ঠেকে গেছে; কিন্তু তাঁর পা-টা মাটিতে রয়েছে। তাঁর অবশ্য সামান্যতম ইংরেজপ্রীতি নেই। তবু যার যা ভাল জিনিস তা নেবার জন্য তিনি সর্বদা পরামর্শ দেন। কিন্তু তফাত হল, গৌরীদা গম্ভীর হয়ে বলেন, ইংরেজরা নাকি দেশ ছাড়ার আগে আমাদের জিজ্ঞাসা করেছিল, এই যে তোমরা স্বাধীনতা চাইছ, তোমরা স্বাধীনতা নিয়ে কী করবে, তোমরা কী দেশটা চালাতে পারবে?"

সোমা জিজ্ঞাসা করে, "তোমার গৌরীদা সক্রিয় রাজনীতি করতেন?"

অভী হাসে, "তা নইলে আর তোমায় বলছি কী! যাই হোক, আমার এই রাইফেল কাড়া থেকে শুরু করে এইরকম ছুটে বেড়ানো, এর সঙ্গে ব্রহ্মবান্ধবের জীবনের অনেক মিল রামকৃষ্ণদা

দেখতে পেয়েছিলেন। উনি খুব বকতেন, বলতেন এইভাবে কোনদিন কোন ভাল কাজ হয় না, এই করে কিস্যু হবে না। সমাজের জন্য কিছু করতে হলে একটা কাজে মাটি কামড়ে পড়ে থেকে জীবন উৎসর্গ করতে হয়। ঐ ধৈর্যই নাকি আমার নেই। সব সময় ছটফট করছি, এক্ষুনি কিছু একটা করে ফেলতে হবে। রামকৃষ্ণদাই বললেন, যে কাজটা করতে হয় ভাল করে কর। শেষে বলেই দিলেন, তোকে দেখছি ধীরেন গাঙ্গুলীর কাছে মাথার চিকিৎসা করাতে হবে।"

সোমা হো হো করে হেসে ওঠে, "একেবারে খাঁটি কথা বলেছেন।"

অভী দু'হাত আকাশে তুলে বলে, "হায় ব্রুটাস তুমিও!"

তারপর সে চট করে বারান্দা থেকে ঘুরে আসে। ফিরে এসে বসে ধীর গলায় বলতে শুরু করে, "হ্যাঁ, বলছি যে রামকৃষ্ণদার মত এত গভীর রাজনীতির ভাবনা আমার ধারে-কাছে কোন মানুষের আমি দেখিনি। উনি পরিষ্কার বলে দিলেন, রাজনীতিতে যে কোন উপায়ে কার্যসিদ্ধির ব্যাপার থাকবেই। পাঁচজনের কাজ করতে গেলে তা মেনে নিতে হবে, তাতে দুঃখ পাওয়া ভাববাদী আদর্শবাদিতা। শুধু যিনি এইসব হরদম করছেন তিনি যেন মনে রাখেন, এটা বাধ্য হয়ে তাকে করতে হল; কিন্তু সুযোগ পেলেই এটা তিনি সংশোধন করে ফেলবেন।"

সোমা মন্তব্য করে, "চমৎকার।"

অভী যোগ করে, "আরও বললেন, সংগঠন যত বড় হবে তত তার মধ্যে জঞ্জাল ঢুকবে, সুতরাং ঐ জঞ্জাল দূর করার একটা ব্যবস্থা সংগঠনের মধ্যে থাকতেই হবে। খেটে খাওয়া মানুষের লড়াইয়ে জেতার কাজটা দু'চারদিনের নয়, এটা পাঁচ হাজার বছর ধরে চলছে, আরও হয়তো হাজার বছর চলবে, সুতরাং এক্ষুনি আমরা বাজিমাৎ করে ফেলব, এমন না ভাবাই মঙ্গল। উল্টে ভাবা উচিত, এ ব্যাপারে সবটাই আমাদের কাছে চ্যালেঞ্জের মত।"

সোমা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, "অসম্ভব আত্মবিশ্বাস! আসলে আমরা আমাদের জীবদ্দশায় সবকিছু দেখে যেতে চাই।"

অভী যোগ করে, "সাঙ্ঘাতিক! পারা যাচ্ছে না, পারা যাবে না — এসব কোন কথা নয়। আমরা এসব জেনেই চ্যালেঞ্জ নিয়েছি। সুতরাং এই বিশাল কাজে যে যেমন পারে ঐ কাঠবেড়ালির মত সেতুবন্ধন করে যাক্, তাতেই হবে। যাই হোক, আমি ভেবে আশ্চর্য হয়ে যাই, সরাসরি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত না থেকেও রামকৃষ্ণদা মানুষের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এত আশা-ভরসা কোথা থেকে পান! মানুষ সম্পর্কে তাঁর আছে যেমন শ্রদ্ধা, তেমনি আছে মানুষের কোন অমানবিকতার ঘটনা দেখলে তার প্রতি বিরক্তির প্রকাশ, ক্রোধের প্রকাশ। সত্যি আমি ভেবে পাই না একজন পাক্কা পড়াশোনার জগতের মানুষ হয়ে কী ভাবে উনি এটা আয়ত্ত করলেন! রামকৃষ্ণদার ভাষায়, সমাজবিজ্ঞানের আশাবাদ সহজ-সরল আশাবাদ নয়, তা হবে বিচারশীল আশাবাদ।"

সোমা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছিল, মন্তব্য করে, "বোঝা যায় তাঁর বিশ্বাসের ভিতটা, বলা যায় রঙটা খুব পাকা।"

অভী একটু চিন্তা করে বলে, "আমি ভেবে দেখেছি, এর প্রধান কারণ বিজ্ঞানসম্মতভাবে যুক্তি-বুদ্ধি প্রয়োগ করে প্রতিটি ঘটনাকে বিচার করার ক্ষমতা, যা আমাদের এখানে নিয়োগীজীরও ছিল। অন্তত তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করতেন।"

সোমা আরও যোগ করে, "তোমার মুখে তাঁদের কথা শুনে মনে হচ্ছে জীবনের ক্ষণিক পাওনাগণ্ডাগুলোকে তুচ্ছ জ্ঞান না করলে এই অবস্থায় পৌছানো সম্ভব নয়। অন্তত এঁদের কাছে ব্যাপারটা নিশ্চয়ই তাই।"

অভীক সায় দেয়, "তাই হয়তো হবে, আসলে আমাদের মনের মধ্যে যে উৎসাহ-উদ্দীপনাটা থাকে সেটা যেন এই মুহূর্তে ফল পেতে চায়, আর তার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে। কিন্তু রামকৃষ্ণদার বক্তব্যই হল দীর্ঘদিন ধরে ধীরেসুস্থে কাজ করে যেতে হবে। কাজ কম হোক ক্ষতি নেই ; কিন্তু কাজটা যেন খাঁটি হয়। আগে ততখানি বুঝতে পারতাম না, এখন বুঝি, রামকৃষ্ণদার বিজ্ঞানমনস্কতা অনেক বেশি খাঁটি, অথচ উনি কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্যচর্চা করেন, হাতে-কলমে বিজ্ঞানের কোন কাজই করেন না। তুলনায় দেখো, গৌরীদা শুধু মহাকাশবিজ্ঞান নিয়ে হাতে-কলমে যা কাজ করেছেন তা ঐ বিষয়ের যে কোন পেশাদারি মানুষও হার মেনে যেতে পারেন। কিন্তু এখন এই জীবনের, বলা ভাল এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অযৌক্তিকতা যুক্তিহীনতাকে গৌরীদা যেন সমান গুরুত্ব দেন, এখন যেন মনে হচ্ছে বেশি গুরুত্ব দেন।"

সোমা নড়েচড়ে চাদর ঢাকা দিয়ে বসে, "এসব তো বুঝলাম, এখন তোমার কথা বলো।"

অভীক হাসে, "আমার কথা আমি বলে দিয়েছি; কিন্তু তুমি আমার কাছে যা আদায় করতে চাইছো তা তোমায় দিতে পারছি কই?"

সোমা যেন ধরা পড়ে গেছে, হাসতে থাকে, "না গুরুমশাই, আমি কোন বিশেষ কথা তোমার কাছে শুনতে চাইছি না। অনেকদিন পরে তোমাকে দেখলাম তো। নিশ্চয়ই মনে করতে পার তোমাকে আমি মিলিয়ে দেখছি, সেই অভী আর এই অভী। এর মধ্যে অনেক পরিবর্তন হয়েছে সময়ের, সমাজের। সেই সঙ্গে আমারও তোমারও — এইসবই মিলিয়ে দেখছি, তুমি কেমন আছো?"

অভীও হাসতে থাকে, "এইরকম দেখে খুব অদ্ভুত লাগছে না, কিছুতেই মেলাতে পারছো না। শুধু আমার ভাল লাগছে, তুমি অনেক সহজ হয়ে গেছো।"

সোমা যেন একটু গম্ভীর হয়ে যায়, "না ঠিক তা নয়। তোমার পরিণতি একরকম ভেবেছিলাম —!"

অভী অর্থপূর্ণভাবে হাসে, "এখন দেখছো একেবারে আলাদা তাই তো।"

ঈষৎ সংশয়ের ভঙ্গিতে সোমা বলে, "হ্যাঁ, ঠিক এইরকম যে হবে তা ভাবিনি। আগের ঐ সম্পর্কটার ছেদ না ঘটলে তোমার এই অবস্থা নিশ্চয়ই হত না।"

অভী একটু চুপ করে যায়, "হয়তো ঠিকই বলেছো। তবে সব মিলিয়ে আমি বোধহয় সংসারের উপযুক্ত মানুষ নই। মানসী বলেছিল, তুমি চার্চের ফাদারের মত, ঠিক স্বামী বলতে

যা বোঝায় তা তোমাকে ভাবতে পারি না। হয়তো তাই। এইসব সাতপাঁচ ভেবেই সংসার থেকে দূরে থাকতে চাই। শুধু স্বার্থপরের মত নিজের প্রয়োজনের জন্য কাউকে ব্যবহার করব, এটা ভাবতেও খারাপ লাগে।"

সোমা একটু নরম গলায় বলে, "আমায় কথায় তুমি ব্যথা পেলে, আমি কিন্তু ঠিক ঐভাবে বলতে চাইনি।"

অভী হাসে আর নিঃশব্দে মাথা নাড়ে। বাইরের প্রকৃতির নানা শব্দ সেই নৈঃশব্দ্যতায় আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ করে থাকে। নীরব থাকার এমন ব্যঞ্জনা অভী অনেকদিন পায়নি। এই নীরবতা অনেক কিছু ব্যক্ত করে, সমর্থন করে। এটা অভী যেমন বোঝে, সোমাও বোঝে। অভী সংসারের উপযুক্ত মানুষ নয় একথা সত্যি; কিন্তু এই কারণে মানসীর হাজার যুক্তিকে সোমা সমর্থন করতে পারবে না। সোমার কাছে অভী যতটুকু অপরাধী মানসীও ঠিক তাই। মানসীকে সে ক্ষমা করতে পারবে না। এই নীরবতার মধ্যে দিয়ে যেন সোমার মনের কথাগুলো আরও স্পষ্ট হয়ে তার মুখের ওপর দৃঢ়ভাবে ফুটে ওঠে।

শেষে সোমাই নীরবতা ভঙ্গ করে বলে ওঠে, "কে যে সংসারের উপযুক্ত আর কে নয় — এর বিচার করবে কে? তাহলে তো সংসারের আসল মানুষদের সংসারে থাকার কথা নয়।"

নিচু গলায় অভী সায় দেয়, "আপাতভাবে হয়তো তাই।"

প্রতিবাদের ভঙ্গিতে সোমা সোজা হয়ে বসে, "কিন্তু মানুষের সংসার তো শুধু রসনার পরিতৃপ্তি, মৈথুন আর ভোগসুখ নয়। তার বাইরে থাকে আরও অনেক কিছু। মানসীও তো তখন মানুষটাকে দেখে নেচে উঠেছিল, তখন তার কাছে মানুষটা রঙচঙে নায়ক ছিল, যেমন দূর থেকে সর্ষে গাছ মনে হয়। তারপর কাছে যেতেই মোহভঙ্গ হল। কারণ আমাদের চাহিদার তো শেষ নেই। মনে হল, যাকে চেয়েছি এ তো সে-ই লোক নয়। এ তো আমার কথায় উঠবস করবে না। এমন লোক আমার কী কাজে লাগবে? জীবন নিয়ে যা খুশি তাই করা, খেয়ালখুশি, স্বেচ্ছাচারিতা।"

অভী তাকে থামায়, "আহা তখন বয়সটাও কম ছিল, তাছাড়া কখন মোহের বশে একটা কী করে ফেলেছি তার জন্য সেটাকে সারাজীবন টেনে নিয়ে চলতে হবে, এটাও কোন কাজের কথা নয়। আমাদের তো একটাই জীবন। সুতরাং ক্রমশ জীবনে চলার পথে আমি তো ভাল কিছু আশা করতেই পারি।"

সোমা নড়েচড়ে বসে, যেন এতদিন ধরে এই কথাগুলো বলার জন্য সে অপেক্ষা করেছিল, "কিন্তু সে দেখার তো শেষ নেই অভী। আর মানসী তো শিল্পী, শিল্পীরা তো শুনেছি সংবেদনশীল হয়। একজন শিল্পী জানবে না, একটা ছেলে সর্বস্ব খুইয়ে তাকে আঁকড়ে ধরতে চাইছে, এই আঘাতের ফলে সে তো আত্মহত্যাও করতে পারত!"

অভী অপ্রস্তুতে পড়ে যায়, কোন্ কথা থেকে কোন্ কথা আসে, "তা বলে আমি যাকে

সংসারের উপযুক্ত বলে মনে করছি না, তাকে নিয়ে সারাজীবন ঘর করতে হবে।”

সোমা ব্যঙ্গের ভঙ্গিতে বলে, “কথায় বলে জান তো, অতি বড় ঘরনী না পায় ঘর, আর অতি বড় সুন্দরী না পায় বর।”

অভী হেসে প্রতিবাদ করে, “এ কী আর সব ক্ষেত্রে সত্যি হয় নাকি?”

সোমা জোর দিয়ে বলে, “অধিকাংশ ক্ষেত্রে সত্যি।”

অভী হাসে, “তাহলে যা সত্য, তা তুমি ঢাকলেও সত্য হয়ে উঠবে। সত্যটা সত্যই, তা তুমি যেভাবেই তাকে প্রকাশ কর।”

সোমা দুষ্টুমির চোখে পরিবেশটা হালকা করার জন্য বলে ওঠে, “বেশ, তাহলে তো তোমাদের মত সমস্ত মানুষদের সারাজীবন ব্রহ্মচর্য পালন করতে হবে, যেমন তোমার ব্রহ্মবান্ধব করতেন। মহিলাদের কাছে ঘেঁষতে দিতেন না। পরে রবিবাবুর কাছে স্বীকার করলেন, আমার অনেক পতন হয়েছে। কিন্তু তুমি সেটা করবে কী করে, তোমায় তো আমি জানি, এখন হয়তো কিছুটা নিজেকে পাল্টেছো, তাছাড়া যাই বল না কেন দাম্পত্যের গুঞ্জনের যেন একটা অন্যরকমের স্বাদ আছে। এই স্বাদ একদিন তুমি নিশ্চয়ই পেতে চাইবে।”

অভী দুষ্টুমির হাসি হেসে বলে, “যদি ক্লিক করে।”

তারপর সুবোধ বালকের মত বলে ওঠে, “ব্রহ্মচর্যের কথা তুমি বলছ বটে; কিন্তু আমাদের কী দোষ বল? তোমাদের গুরুদেব যদি এইরকম পরামর্শ দেন, ‘বাসনার রঙে লহরে লহরে রঙিন হল/করুণ তোমার অরুণ অধরে তোলো হে তোলো —’।”

সোমা হাত নাড়ে, “মশাই, গুরুদেব তো শুধু লিখেই ভাবমোক্ষণ করেছেন, তাঁর দৌড় ঐ পর্যন্ত; কিন্তু তোমরা তো মার্কসবাদী বিপ্লবী, প্রয়োগ ছাড়া কোন কিছুর সার্থকতা আছে বলে মেনে নাও না। বিপদ তো তাতেই।”

দু'জনে উচ্চৈঃস্বরে হেসে ওঠে।

তারপর সহজ হয়ে অভী বলে, “একদম ঠিক ধরেছো, এ কথাটা আমিও ভাবি। আর পাঁচজনকে দেখেও মনের মধ্যে কাজ করে; কিন্তু তা সত্ত্বেও বলছি, কোথাও একটা বাধা আছে। আমার যা ধরন তাতে হঠাৎ করে একটা কিছু ঘটে যাওয়াই স্বাভাবিক। আর তা যেন না ঘটতে পারে তাই এ ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক থাকি। তবে আমার মনে হয়, নারীর প্রতি আকর্ষণের ব্যাপারটা সব পুরুষের একপ্রকারের হয় না। তাই কোন কোন মানুষ সহজে সারাজীবন ব্রহ্মচর্য পালন করতে পারেন; কিন্তু আমাদের মত আবেগপ্রবণ লোকের পক্ষে এটা যথেষ্ট কঠিন কাজ এটা মানি। দেখি কী হয়? কিছু হলে অন্তত তুমি একটা খবর পাবে।”

সোমা হাসে, “অবশ্যই।”

অভী হাসে, “রামকৃষ্ণদাকে একদিন জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা আপনি কাউকে ‘তুমি’ বলেন না কেন? প্রত্যুত্তরে তিনি বললেন, ঐজন্য তো বিয়ে করা হল না।”

সোমা হা হা করে হেসে কেশে একাকার হয়।

হয়তো সোমার পরামর্শমতই চাঁদনী কিছু ফুল তুলে এনেছে। সে ইতস্তত করে সেই পাত্রটা নিয়ে সোমার কাছে এগিয়ে যায়। সোমা পাত্র সমেত ওকে জড়িয়ে ধরে, 'বাঃ চমৎকার' বলে ওর গালে একটা চুমু দেয়। তারপর দুটো বোতলে জল দিয়ে তাদের সাজাতে শুরু করে, গুন্‌গুন্‌ গান করে। দূর থেকে দাঁড়িয়ে চাঁদনী তাকে দেখে।

হঠাৎ অভী চাঁদনীকে খেয়াল করে। এই কয়েকদিনে মেয়েটারও যেন শ্রী ফিরে গেছে। সেই ঘুঁটেকুড়েনি, শাঁকচুন্নি চাঁদনী আর নেই। সোমা ওর মাথার চুলে দু'পাশে দুটো বিনুনি করে দিয়েছে। হয়তো নিজের প্রসাধন সামগ্রী থেকেই তাকে সাজিয়েছে, ঠিক ওর নিজের মেয়ে হলে যেমন করত। বোতলে ফুল সাজাতে গিয়ে সোমা কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক হয়ে নিজের কাজ করে যায়, অভীর উপস্থিতি সে যেন ইচ্ছা করেই উপেক্ষা করে। অভী ভাবে, এই কী গার্হস্থ্য সুখ!

ভাবতে ভাবতে অভী উঠে পড়ে ঘড়ি দেখে, "না অনেক হয়েছে। আজকের মত অধিবেশন শেষ আবার কাল শুরু হবে।" তারপর চাঁদনীর মাথায় টোকা দিয়ে তাকে বিছানার দিকে আঙ্গুল দেখায়।

সকালে সোমা কাজকর্ম সেরে ফিরে এসে বিছানায় বসতেই অভীর ধ্যান ভাঙ্গে, সোমা বলে, "যাই বল না কেন, আসলে তুমি মানুষটা ভাল।"

সঙ্গে সঙ্গে অভী শেয়াল পণ্ডিতের মত চশমাটা নাকের ডগায় টেনে নিয়ে বলে, "তাহলে আমায় সেই নতুন বউটির মত বলতে হয়, যাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল তোমার স্বামী কেমন? সে উত্তর দিল, কার তুলনায় বলব?"

সোমা হেসে বলে, "আমার অস্মিতার মানদণ্ড, হয়েছে। যাই হোক, এই বিচ্ছেদে আমি খুব কষ্ট পেয়েছিলাম। তোমার মত মানুষ আমার জীবনে আসবে তা আমি কোনদিন আশাও করিনি। তারপর তুমি ডাক্তার, আমার এমন অসুখ আছে।"

অভীর যেন কিছু একটা মনে পড়ে যায় সে সোমাকে বাধা দিয়ে বলে, "ঠিক এই ব্যাপারটাই ঘটেছিল কিন্তু মালদায়। তোমার হয়তো মনে নেই। তোমাদের কোন এক আত্মীয়ের বাড়ি তুমি যাচ্ছো মা আর ছোট বোনকে নিয়ে, আমায় বললে, আমি যাব কিনা। ওখানে আমাদের একটা আকুপাংচার সেন্টার চলছিল, আমি রাজী হয়ে গেলাম। আমরা তখন একে অপরের ভাল বন্ধু। পরের দিন মাঝ রাত্তিরে তোমার তো খুব শ্বাসকষ্ট শুরু হল। পাশের ঘরে থেকে আমিই কিন্তু প্রথম ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম, তোমার মা'কে ডেকে তুললাম।"

সোমা গালে হাত দিয়ে শুনে যায়।

অভী বলে চলে, "ছোট বোনও ঘুম থেকে জেগে উঠে পাশে বসে। তখন তোমার ঐ অবস্থাটা দেখে আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল। ভাবলাম, এ মেয়েটি কত অসহায়, এ সারাজীবন কষ্ট পাবে। তখন মনে মনে খুব দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম। পরে তোমার বাড়িতে একদিন এসে

তোমার মা'কে আমার মনের কথা বললাম। তোমার মা সব শুনে স্থির হয়ে রইলেন, কোন উত্তর দেননি। কিন্তু তিনি প্রসন্ন হয়েছিলেন, এমনও মনে হয়নি।''

সোমা চুপ করে শুনে মন্তব্য করে, ''হ্যাঁ বাড়ি ফিরতেই মা আমাকে অনেকক্ষণ জেরা করল, আমি তো অবাক, কারণ আমি কিছুই জানি না। অথচ মা মনে করেছে আমি তোমাকে দিয়ে এই কথাটা বলিয়েছি। তখন ভেতরে অবশ্য একটা অদ্ভুত উত্তেজনা হয়েছিল, তা আমি কাউকে বোঝাতে পারব না। এ আমার জীবনে কখনো হয়নি। যাই হোক, সব মিলিয়ে তোমার ওপর একটা অসম্ভব নির্ভরতা জন্মেছিল।''

অভী হঠাৎ বলে ওঠে, ''আচ্ছা, তোমার সেই শিভকে বেড়াতে যাওয়ার কথা মনে আছে। হাঁটতে হাঁটতে তুমি আমায় বললে, আর কতদূর নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দর। সেই পাহাড়, ঘোরানো রাস্তা, খুব উঁচু সেতুর নিচ দিয়ে বয়ে চলা তিস্তা, ভাঙ্গা ভাঙ্গা মেঘ, সূর্যের নরম আলো আর —।''

অভীকে বাধা দেয় না সোমা, নিশ্চুপ হয়ে শুনে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। যখন বুঝতে পারে তার কাছে কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে অভী চুপ করে গেছে তখন খুব নিচু স্বরে বলে ওঠে, 'হ্যাঁ'।

অভী থেমে গেছে, সোমা আবার শুরু করে, ''কিন্তু মনের মধ্যে হাজার সংশয় ছিল। তাই শেষ পর্যন্ত তোমার ওপর রাগ, বিরক্তি, এমনকি ঘৃণা তৈরি করে নিজেকে খুব তাড়াতাড়ি সামলে উঠতে পেরেছিলাম। কিন্তু শিলিগুড়িতে টিকতে পারছিলাম না। বাড়ির লোকজন উত্যক্ত করছিল, সহকর্মীরা নানা কথা বলছিল বিশেষ করে যারা তোমায় চিনত। তাদের কাছে এসব বেশ মুখরোচক গল্প হয়ে উঠেছিল।''

তারপর হাত দিয়ে অভীকে ইশারা করে সে, কোন একটা কাজ মনে পড়ায় রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে যায়।

ফিরে এসে সে আবার শুরু করে, অভী রোগীর রোগ-ইতিহাস শোনার মত চুপটি করে বসে শুনে যায়, ''এইসব মিলিয়ে অবস্থাটা এত দুর্বিষহ হয়ে উঠল যে পালিয়ে এলাম। আর একটা সুযোগও এসে গেল, জব্বলপুরে ইঞ্জিনিয়ার ট্রেনিং-এ যাবার পরীক্ষায় পাশ করে গেলাম। এখানে কখনো মা এসে থেকেছে, আমায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবার বহু চেষ্টা করেছে; কিন্তু ঠিক করে নিয়েছিলাম আর ফিরবো না। এখানকার জল-হাওয়া বেশ ভাল।''

অভী কোন কথা না বলে আধবোজা চোখে সোমার দিকে তাকিয়ে থাকে, সোমা আনমনে যেন স্মৃতি হাতড়ায়, ''আর প্রদীপ ছেলেটিও খারাপ না। আমার অফিসেই কাজ করে। ওর বাড়ির সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারিনি, আলাদাই থাকি। সেটাও ও মেনে নিয়েছে। আমাকে নিয়ে ওর কোন কষ্ট আছে বলে মনে হয় না। কারণ ওর একটাই সমস্যা, বাড়ির বড় ছেলে, বাড়ির দায়িত্ব পালন করতে হবে, তাতে আমি কোন বাধা দি-ই না।''

অভী শুধায়, ''বাচ্চা হয়নি কেন?''

সোমা ম্লান হেসে বলে, ''একটা বাচ্চা হয়েছিল, প্রসব করার পরই মারা যায়। তারপর

আর কিছু হয়নি, আমিও আর ঐ নিয়ে ভাবি না। প্রদীপের জন্যেই হয়তো একটা দত্তক নিতে হবে। ব্যস, নটে গাছ মুড়িয়ে গেল।"

অভী হাঁ করে শুনছিল, যেন খুব তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল। আরও কিছু শুনবে বলে সে আশা করেছিল।

তাই সে আবার নড়েচড়ে বসে আক্ষেপের সুরে বলে, "এত অল্পকথায় কী মন ভরে? আমি কত কথা বললাম, তুমি আরও কিছু মাটি দাও যাতে অন্তত তোমার এই মূর্তিটা গড়ে নিতে পারি। আর বলতে পার, তোমার এই কয়েক বছরের বৃদ্ধি-বিকাশটা আমি অনুভব করতে চাইছি।"

সোমা চাঁদনীকে ইশারায় খাতাপত্র নিয়ে পড়তে বসায় তারপর অভীর দিকে তাকিয়ে হাসে, "ডাক্তারদের এই একটা বড় দোষ মানবে নিশ্চয়ই। তারা অধিকাংশ সময় রোগীর কথা শুনতে চায় না। মনে করে, ঐ একই কথা এ আর কী শুনব? আর যখন আগ্রহী হয় তখন তাদের কাছে ভাল-পচা সব রোগ-ইতিহাস খুঁটিয়ে বলতে হবে; যতক্ষণ না সেটা ইতিহাস হচ্ছে ততক্ষণ তাদের কাছ থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না।"

অভী মুখে শব্দ না করে হাসে।

একটু চুপ করে থেকে সোমা যেন আক্ষেপের সুরে বলে, "আর আমাদের কী কথা থাকতে পারে বল, কাকের উচ্ছিষ্ট ঘাঁটা জীবন, এর মধ্যে আর কী নন্দনতত্ত্ব তুমি খুঁজে পাবে! আর তোমাদের জীবনে কত রঙ, কোকিলের রোমান্টিক সুর, তোমাদের সঙ্গে আমাদের কী কোন তুলনা হয়!"

অভী নড়ে চড়ে বসে, "ধন্যবাদ, তোমার উপমার তারিফ করছি; কিন্তু তুমি ঠাট্টা করে বললেও একটা খুব ভাল কথা মনে করিয়ে দিয়েছো। এবার তোমায় একটা অভিজ্ঞতা বলি, এটা তুমি নিশ্চয়ই জানো না।"

এই কথা বলে সে আঙ্গুল তুলে দূরের দিকে ইশারা করে বলে, "আমাদের এই বাড়ির পাশে ঐখানে একটা বড় তেঁতুলগাছ আছে, ওখানে কাকেরা বাসা বেঁধে ডিম পেড়ে তা দেয়, বাচ্চা বড় করে। আমি খুব মনোযোগ দিয়ে ওদের এই ব্যবহারটা লক্ষ্য করেছি। এইটা তোমায় গল্প করে বলি, বেশ শোনার মত।"

সোমা হাসে, "দাঁড়াও, একটু আসছি।" এই বলে স্লিপারটা পায়ে গলিয়ে দ্রুত হেঁটে যায়।

অভী তার চলার ছন্দ আর ভঙ্গি মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করে। সোমা বেশ ভারিক্কি চেহারার হয়ে উঠেছে, বেশ গিন্নী গিন্নী, মহিলা ধরনের। চেহারার এই পরিবর্তন আসবেই, কেউ তাকে ঠেকাতে পারবে না। হয়তো অভীরও এতদিনে এমন অনেক পরিবর্তন হয়েছে যা সোমার চোখে ধরা পড়ছে।

তেমনই দ্রুত ফিরে এসে চাঁদনীর হাতে কী একটা খাবার দিয়ে সোমা হাঁটু মুড়ে বিছানার ওপর বসে।

অভী চশমাটা খুলে গল্প বলে, "কোকিলের ডিম কাকের ডিমের থেকে বড় হয়। আর কোকিল তো বাসা বাঁধতে পারে না। তাই সে বেছে বেছে তার থেকে ছোট আকারের কোন পাখির বাসা পাবার ধান্দা করে। সেখানে সে ডিম পাড়ে। কাক সব ডিমেই তা দেয়। এবার ডিম ফুটে যে বাচ্চাগুলো বেরোয় তার মধ্যে কোকিলের বাচ্চাগুলো বড় হয়। কাক তো আর কিছু বুঝতে পারে না। সে সবাইকে খাওয়ায়। দেখা যায় কোকিলের বাচ্চাগুলো সেই খাবারের প্রায় সবটাই দখল করে গায়ের জোরে। ফলে তারা খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠে। এমনকি কাকের বাচ্চাদের তারা বাসা থেকে ঠেলে ফেলেও দেয়।"

সোমা আতঙ্কিত হয়, চাঁদনীর মাথায় হাত বুলিয়ে বলে, "আহা কী নিষ্ঠুর!"

অভী অপরাধীর মত তার দিকে তাকিয়ে থাকে, তারপর নিচু গলায় বলে, "ঐ নিষ্ঠুরতাই তো আমরা পেয়েছি, প্রকৃতির সন্তান হয়ে। ঐ নিষ্ঠুরতা দিয়েই তো তোমার ভালবাসা প্রত্যাখ্যান করে তোমায় অসহায় করে দিয়েছি।"

সে আরও কিছু বলতে চাইছিল, সোমা তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গটা পাল্টাবার জন্য বলে ওঠে, "একটা কথা মনে হল তোমায় জিজ্ঞাসা করি, এই যে বিপ্লবীরা খতমের কথা বলে, এ ব্যাপারে তোমার মত কী?"

অভী একটু চুপ করে থেকে হাসি মুখে সোমার দিকে তাকিয়ে বলে, "হ্যাঁ এই বিষয়টা নিয়ে আমাদের মধ্যে অনেক তর্ক-বিতর্ক হয়েছে। নিয়োগীজীর এ ব্যাপারে চমৎকার বক্তব্য ছিল, সেটা বলছি; কিন্তু তার আগে তোমায় একটু রাজনৈতিক বক্তৃতা দি-ই।" এ কথা বলে সে বাইরে থেকে ঘুরে আসে।

ফিরে চেয়ারে বসে মুখে শব্দ করতেই সোমা যেন কর্ত্রীর মত বলে, "সিগারেট তুমি তো আগে খেতে না?"

অভী হাসে, "এই দু'একটা খাই।"

আবার শুরু করে, "যদিও তুমি এসবই জানো; কিন্তু না বললে আমি ঠিক এগিয়ে যেতে পারব না। তোমায় জানতে হবে এবং মানতে হবে যে শোষকশ্রেণী গরিবদের খতম করে, মারে বলেই এই পাল্টা আঘাতের প্রশ্নটা আসছে। আমাদের যদি কেউ অত্যাচার বা আঘাত না করে তাহলে আমরা খামোকা কাউকে আঘাত করতে যাব কেন? গরিব মানুষ চিরকাল একতরফাভাবে মার খেয়ে এসেছে, আজ সে পাল্টা মার দেবার চেষ্টা করছে বলেই আমাদের এই সভ্য সমাজ হৈ হৈ করে উঠছে।"

এই পর্যন্ত বলে অভী চুপ করে। সোমা কোন উত্তর করে না।

আবার অভী চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলতে শুরু করে, "কিন্তু যুগ যুগ ধরে এই যে গরিব মানুষরা মার খেয়ে আসছে সে ব্যাপারটা আমরা মেনে নিয়েছি, যেন এটাই তাদের ভাগ্য

বা কপাল। আর বিপ্লব মানে তো একটা শ্রেণী আর একটা শ্রেণীকে উৎখাত করবে, সেখানে ওরাও মারবে আমরাও পাল্টা মারবো। তবে নিশ্চয়ই নির্বিচারে হত্যা করা আমরা কেউ সমর্থন করি না। এ সম্পর্কে বহুদিন বহু মেজাজে নিয়োগীজীর সঙ্গে কথা বলে দেখেছি তো, অমন্ মানবিক মানুষ আমি আমার জীবনে কম দেখেছি। প্রতিটি মানুষের জন্য তাঁর প্রাণ কাঁদত। শুধু মানুষ কেন বলব, গাছপালা পশুপাখি এমনকি এই প্রকৃতির জন্যও তাঁর প্রাণ কাঁদত।"

তারপর কোন কিছু মনে করে অভী চেয়ারের ওপর ঝুঁকে বলে, "উনি কেমন মানবিক ছিলেন শোন। একবার ভোপালে খুব অর্থকষ্টে ভুগছি। বন্ধুদের কাছে ধার করেছি, আর চলছে না, এবার একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগটা চিরকালই ক্ষীণ। সুতরাং নিজের প্রয়োজনে সাহায্য চাইতে লজ্জা হয়। তাই একটাই জায়গা আছে, এখানে চলে এলাম, যদি কোন ব্যবস্থা করা যায়। এখানেও তখন মরণপণ সংগ্রাম চলছে, কোনরকমে রান্নাঘরটা ওরা চালাচ্ছে। আমি তো বেশ দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলাম, ফিরে যাবো কী করে? একদিন সন্ধ্যেবেলায় দেখি নিয়োগীজী একজন কমরেডের হাত দিয়ে একটা খাম পাঠিয়ে দিয়েছেন, তাতে তিন হাজার টাকা। আমি কিন্তু তাঁকে কিছু বলিনি। নিশ্চয়ই উনি অন্যদের কাছে শুনেছেন এবং ওখানকার এক ব্যবসাদারের কাছ থেকে ধার নিয়ে আমায় টাকাটা পাঠিয়েছেন। এই ঋণ আমি ভুলতে পারি!"

সোমা দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

অভী বলে যায়, "সেই মানুষটিকেও বলতে শুনেছি, এ সমাজে কিছু মানুষ সংশোধন-অযোগ্য, তাদের পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে হবে।"

সোমা একটু অবাক হয়ে তাকায়, "নিয়োগীজী বলতেন এই কথা!"

অভী চোয়াল শক্ত করে বলে, "হ্যাঁ বলতেন, সেই সঙ্গে মনে রাখবে উনি মানুষকে অসম্ভব বিশ্বাস করতেন। এই বিশ্বাসের জন্যেই তাঁর প্রাণটা এমন বেঘোরে গেল। আমরা কতদিন তাঁকে সাবধান করেছি। উনি কোন কথাই শুনতেন না, শুধু হাসতেন। তাই আমাকে যারা ঐ খতমের ব্যাপারে কোন কথা জিজ্ঞাসা করে তখন আমি বলি, আর একটা শঙ্কর গুহনিয়োগী তৈরি করে দিতে পারবেন! আজ ঐ অপরাধীর শাস্তি কী হল তা অবান্তর। কিন্তু আমাদের কী কষ্ট হয়, সোমা তোমায় কী বলবো!"

এই পর্যন্ত বলে চেয়ারের হাতল দুটো শক্ত করে ধরে বলে, "শুধু নিয়োগীজী কেন? তুমি ভাব তো, আমাদের এই কুৎসিত সমাজে এই ধরনের এক একজন শ্রমিক বা কৃষক কমরেড তৈরি হয় সমাজের কত পুণ্যের জোরে! সেই কমরেড যখন বেঘোরে প্রাণ হারায় তখন হায় হায় করে কোন লাভ হয় কী!"

তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে অন্যমনস্ক হয়ে দূরের দিকে তাকিয়ে বলে, "মাঝে মাঝে এই কথাই মনে হয়, এই যে বিপ্লবে ভাল মানুষেরা প্রাণ দেয় তা না হয়ে যদি আমাদের

মত পোকামাকড়দের প্রাণের বিনিময়ে তাঁদের প্রাণগুলো রক্ষা করা যেত —!"

উত্তেজিত অভীকে প্রশমিত করার জন্য সোমা বলে, "না এটা আমরাও আলোচনা করেছি, নিয়োগীজীর সাবধান হওয়া উচিত ছিল। শুনেছি উনি এ ব্যাপারটা আঁচ করেছিলেন আর একটা ক্যাসেটও করেছিলেন। কিন্তু সব জেনেশুনেও তিনি সাবধান হননি। এ ব্যাপারে তুমি ফিদেল কাস্ত্রোর কথা ধর। আমেরিকার নাকের ডগায় ঐ মানুষটি রাজত্ব করে দেখিয়ে দিলেন তো।"

অভী স্বগতোক্তির মত বলে, "তার মানে সাবধানে থাকলে সবাইকেই মারা যায় না।"

সোমা বলে যায়, "ওরা ফিদেলকে মারার কত চেষ্টা করেছে; কিন্তু পারেনি। কারণ সবাই জানে ফিদেলকে মারতে পারলেই কিউবা শেষ। নিয়োগীজীরও বোঝা উচিত ছিল, তিনি নিজেই একটা প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠছেন। তাঁকে বহুদিন কাজ করতে হবে। আমরা তো পোকা-মাকড়ের মত. রইলাম কী গেলাম তাতে কিছু যায় আসে না। কিন্তু নিয়োগীজীর মত একজন মানুষ চলে যাওয়া, বিশেষত তিনি এখানে এমন একটা জায়গায় কাজ করছিলেন।"

অভী অন্যমনস্ক হয়ে কী যেন ভাবছিল, কিছুক্ষণ নীরব হয়ে থেকে ভরতনট্যম নাচের ঢঙে মাথা নাড়তে নাড়তে বলে, "এখন ভাবি, কথাটা তুমি ঠিকই বলেছো। আগে ভাবতাম, কেউ কাউকে যদি খতম করতে চায় তাহলে কী ভাবে তাকে রক্ষা করা সম্ভব! একটা মানুষকে সর্বক্ষণ সুরক্ষিত করা কী সোজা ব্যাপার!"

সোমা খুব দৃঢ় গলায় বলে, "আমরাও এইরকম ভাবতাম; কিন্তু এখন ভেবে দেখছি, এভাবে কাউকে মারতে চাইলেও একটা আদর্শবোধ লাগবে। শুধু কাস্ত্রো কেন, ইজরায়েল আরাফাতকে মারার চেষ্টা তো কম করেনি। কই পারেনি তো, এর অর্থ ভাড়াটে গুণ্ডা দিয়ে মারতে চাইলেই কাউকে মারা যায় না, একটা ন্যূনতম আদর্শবোধ লাগে।"

অভী শান্ত গলায় বলে, "ঠিকই তো, আমরা নিয়োগীজীকে বাঁচাতে পারিনি! এটা আমাদের কমিউনিস্ট আন্দোলনের ব্যর্থতা। আর গান্ধীজীর পর স্বাধীন ভারতে এই বোধহয় সব থেকে বড় রাজনৈতিক হত্যা।"

সোমা বিস্ময়ের ভাব কাটাতে পারে না, "সত্যি ভাবা যায় না, এমন একটা জলজ্যান্ত মানুষকে বিনা অপরাধে গুলি করে মেরে দিল!"

ততক্ষণে সোমা চাঁদনীকে লেখাটা দেখিয়ে মুখ তুলে অনুসন্ধিৎসুর মত বলে ওঠে, "আচ্ছা, তুমি যখন প্রথম খবরটা পেলে তখন তোমার প্রতিক্রিয়া কী হল?"

অভী মুখের ওপর দু'হাত মুড়ে ঢাকা দিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকে।

তারপর ধীরে ধীরে মুখ খোলে, ছাড়া ছাড়া ভাবে কয়েকটা কথা বলে, "এ অভিজ্ঞতা মর্মান্তিক! ঐ সকালে খবর পেলাম, থমকে গেলাম। চোখের সামনে কত কিছু ভেসে উঠল। প্রথমেই মনে হল, সেই মানুষটাকে আর দেখতে পাব না। পরে মনে হল, প্রকৃতি ছত্তিশগড়ের জন্য একজন দেবদূত পাঠিয়েছিলেন তিনি চলে গেলেন, ছত্তিশগড়ের দুর্ভাগ্য! দেশী পিস্তল

দিয়ে গুলি চালিয়েছিল পিঠের দিকে। নিয়োগীজী ঘুমিয়ে ছিলেন। মুখে সেই প্রশান্তি, কোন দুঃখ নেই, কোন রাগ নেই, কোন অভিমান নেই — শুধু এক নির্মল প্রশান্তি। ভারতবর্ষের শত সহস্র খেটে খাওয়া মানুষের সম্পদ কেউ যেন চুরি করে নিয়ে চলে গেল। এই সঙ্গে জানিয়ে গেল, আমাদের দূতকে তোমাদের কাছে পাঠিয়েছিলাম তোমাদের কষ্ট লাঘব করার জন্য, তোমরা রাখতে পারলে কই!''

রাত্রি আঁধারের মত সমস্ত ঘর নিঝুম নিস্তব্ধ হয়ে আসে।

অভী আবার ধীর গলায় শুরু করে, ''একটা কষ্টের কথা নিয়োগীজী বার বার আমাদের বলতেন। একবার জেল থেকে তাঁর মুক্তির জন্য চারজন শ্রমিক পুলিসের গুলি খেয়ে মারা যান। এই বেদনা তিনি যেন ভুলতে পারতেন না। হয়তো তাঁর মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে এই দেনাও শোধ হল।''

সোমা থমথমে চোখমুখে দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

অভী কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকে।

তারপর যেন প্রসঙ্গটা শেষ করার ভঙ্গিতে বলে, ''মৃত্যুটা হয়তো সাঙ্ঘাতিককিছু নয়। আমাদের সবাইকে একদিন না একদিন চলে যেতে হবে; এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কারো জন্য কিছু আটকে থাকে না। কিন্তু কোন কোন মৃত্যু আমাদের নিঃশেষ করে দিয়ে যায়। সেটা আর অন্ধকূপ থেকে ভুবনমোহন স্বপনের হাত ধরে কোন অদৃশ্যলোকে মোক্ষের ঘটনা হয়ে দাঁড়ায় না। সেটা ঐ **জুলিয়াস সীজার** নাটকে অ্যান্টনির কথার প্রতিধ্বনি করে বলতে হয়, দা মোস্ট আনকাইনডেস্ট কাট অব অল।''

অভী বুঝতে পারে পরিবেশ ভারি হয়ে গেছে, তাই সে বিষণ্ণতার হাসি হেসে সোমার দিকে তাকায়, ''সোমা, শেক্‌সপীয়র পড়, তা না হলে এর উত্তর তুমি পাবে না। সাধে কী মহাজনরা বার বার ধ্রুপদী সাহিত্য পড়তে পরামর্শ দেন। আমার তো মনে হয়, ওসব আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার খাদ্য।''

তারপর ম্লান হেসে অভী বলে, ''তুমি বললে বিশ্বাস করবে কিনা, লাশকাটা ঘরে যখন তাঁর নীরব দেহটা পড়ে থাকতে দেখলাম তখন বড্ড বেশি রাজা লীয়রের কথা মনে হচ্ছিল। লীয়র যেন আমার কানের কাছে বলে যাচ্ছেন, নেভার ...। নীরবতার যে এমন ভাষা থাকে তা শেক্‌সপীয়রের কর্ডেলিয়ার মধ্যে দেখেছি, আর আমি নিয়োগীজীর কাছে শেষ শিক্ষা হিসাবে পেলাম।''

তারপর ঈষৎ আবেগমন্দ্রিত হয়ে সে সোমার কাছে ঝুঁকে পড়ে, ''কল্পনা কর **ওথেলোতে** যেখানটায় দেসদিমোনাকে হত্যা করা হবে, তার জন্য নাট্যকারের প্রস্তুতিটা — অভাবনীয়! ঐজন্য তিনি শেক্‌সপীয়র।''

উঠে দাঁড়িয়ে অভী নাটকের ভঙ্গিতে বলে যায়, ''ওথেলো তার বিরুদ্ধে অভিযোগের বান ডাকিয়ে ফুলের মত নিষ্পাপ মেয়েটাকে যেন ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। ঐসব শুনে দেসদিমোনার

মনে হচ্ছে, তার প্রাণাধিক প্রিয়র কাছ থেকে এসব শোনার চেয়ে বরং মৃত্যু শ্রেয়। এমনকি পড়তে পড়তে তোমারও এ কথা মনে হবে, এমন পীড়ন দেবার চেয়ে ওথেলো দেসদিমোনাকে মেরে দিক।"

তারপর নিজের অবস্থাটা অনুমান করে সে হেসে ফেলে, "জানি, এসব শুনে সবাই বলবে এসব বস্তাপচা সস্তা অভিমানের কী দাম আছে? সত্য তাই, আমরা যারা পৃথিবীটাকে বদলাতে চাই, সমস্ত মানুষের জন্য আমাদের প্রিয়া এই পৃথিবীটাকে ছেনি আর হাতুড়ি লাগিয়ে উপযুক্ত মানানসইভাবে গড়ে তুলতে চাই, তাদের কাছে এই ম্যাড়মেড়ে অভিমানের কোন দাম নেই। মানুষের হিংস্রতার কাছে, নিষ্ঠুরতার কাছে আবেদন জানিয়ে কোন ফল হয় না; কিন্তু এই শিক্ষাটা এতবার ঠকেও তো আমরা নিলাম না।"

সোমা চুপ করে স্থির দৃষ্টি নিয়ে সম্মোহিতের মত অভীর কথা শুনছিল। এদিকে নিস্তব্ধতা যেন অনেক ভারি হয়ে উঠেছে।

অভী, রিমঝিম বাদলের দিনে চুপটি করে বসে গল্প বলার মত বলে যায়, "জানো, আমরা সবাই মিলে একবার বসে একটা তালিকা বানিয়েছিলাম। নিয়োগীজীর বিরুদ্ধে কার কী অভিযোগ, এই ব্যাপারে। দেখলাম, তাকে এখানে কেউ পছন্দ করে না। এই অঞ্চলের সব রাজনৈতিক নেতা, শিল্পপতি, গুণ্ডা, আমলা, পুলিস, মদের ঠিকাদার, মাফিয়া, কমিউনিস্ট পার্টি, তাদের ট্রেড ইউনিয়ন — সব সব। সব্বার শত শত অভিযোগ। সরকার থেকে হুলিয়া জারি করে দেওয়া হয়েছে, তাঁকে যেন এ অঞ্চলে আর না দেখা যায়। সাধারণ মানুষজনের কাছে এইভাবে তাঁর বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগ জমা করে, দাখিল করে তাঁকে মেরে ফেলার নীরব সম্মতি আদায়ের চেষ্টা চলেছে বছর বছর ধরে।"

সোমা যেন আর্তনাদের মত বলে ওঠে, "কিন্তু কেন!"

অভী চুপ করে থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলে, ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলে, "তাঁকে খতম করা চাই। শুধু দেখলাম শেষ নীরবতার ভাষায় নিয়োগীজী আমাদের এই কথাটা জানিয়ে দিয়ে গেলেন। আমরা কতখানি অপদার্থ দেখ, এই চক্রান্তটা আমরা বুঝতেই পারলাম না! অনেকে বলেছেন, তিনি এত সমঝদার মানুষ ছিলেন তাঁর তো অবস্থাটা বোঝা উচিত ছিল। যিনি মানুষকে এত ভালবাসেন, মানুষকে এত বিশ্বাস করেন, তিনি নিজের জন্য কোন সুরক্ষা চাইতে পারেন না। এটা আমাদের দায়িত্ব ছিল।"

সোমা চোখ তুলে মন্তব্য করে, "তা নইলে তার মূল্য এইভাবে চুকিয়ে দিতে হয়। ও তুমি যাই বল আমার কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাস, তাঁর পরবর্তী মানুষজনের সঙ্গে তাঁর এতই ফারাক ছিল যে এইসব ব্যাপারটা নিয়ে হুঁশিয়ার করারও কেউ ছিল না।"

অভী চুপ করে কিছু ভেবে বলে, "তা তো ঠিকই, সব সংগঠনেই এমন হুঁশিয়ার মানুষজন থাকে, তারা তৈরি হয়, যারা এগিয়ে থাকা মানুষজনের নিরাপত্তা দেখে। বলতে পারো, এটা নিয়োগীজীর ব্যর্থতা। আসলে জায়গাটাও এতখানি পিছিয়ে পড়া, এখানকার মানুষজনও এত

সহজ-সরল যে জটিল করে কোন কিছু ভাবার ক্ষমতা শুধু ঐ একজনেরই ছিল।"

কী কথা মনে পড়ে যায় সোমার, "আচ্ছা একজন ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী, কার কথা বার বার শোনা যাচ্ছে, সে নাকি নিয়োগীজীকে ভিলাইয়ে টেনে নিয়ে এই ষড়যন্ত্রটা করেছে বলে সবাই বলছে।"

অভী আনমনে ভেবে চলে, "তুমিও বলছ, অনেকে বলছে বটে। আশ্চর্য! সে ছেলেটি এত দ্রুত নিয়োগীজীর বিশ্বাসভাজন হয়ে উঠল, আমিও এ ব্যাপারে খুব হতবুদ্ধিকর অবস্থায় পড়েছিলাম। সেই বিশ্বাস! আমি ঐ ছেলেটির সঙ্গে আগে পরে কথা বলেছি। কিন্তু সমস্যাটা কী জানো, যতক্ষণ না নির্দিষ্ট কোন প্রমাণ পাচ্ছি, এতখানি অনুমান করে কিছু বলা মুশকিল। তার তুলনায় আমি ঐ আমাদের চিরপরিচিত নিয়তিকেই বেশি দায়ী করি।"

তারপর চুপ করে থেকে বলে, "যেমন আমায় অনেকে বলেছেন, এ আর কী করা যাবে, এমন হত্যাকাণ্ড তো হয়েই থাকে। তাহলে একে নিয়তি ছাড়া কী বলা উচিত হবে আমার জানা নেই। জানি একে নিয়তি বলা হয়তো উচিত নয়; কিন্তু এক অমোঘ নিয়মে ভিলাই যেন নিয়োগীজীকে হাতছানি দিয়ে ডেকেছে। বলতে পার প্রায় আলেয়ার মত।"

শব্দ করে কেশে একটু দম নিয়ে অভী বলে, "উনি ক্রমশ বুঝছিলেন, এখানে লোহার-খনি ইউনিয়নের মানুষজন শক্তসমর্থ হয়ে উঠেছে, তাঁর আর এখানে তেমন প্রয়োজন নেই। বড় মাছ যেমন ছোট ডোবায় বাড়তে পারে না। তাই নিয়োগীজী ভিলাইয়ের দিকে ঝুঁকলেন। তিনিও ক্রমশ বড় হচ্ছেন, নিজের চারপাশে ডালপালা মেলে নিজেকে ক্রমশ প্রসারিত করছেন। ওদিকে ভিলাইয়ে ঠিকাশ্রমিকদের ওপর মধ্যযুগের বর্বরতা চলে। তা চোখে দেখার দরকার নেই, শুধু শুনেই যে কারো রক্ত টগবগ করে ফুটবে। সুতরাং নিয়োগীজীকে যেতেই হবে, তাঁর ডাক এসেছে। কিন্তু, কিন্তু ...।"

এই কথা বলে অভী মাথার চুলগুলো দু'হাতে মুঠোর মধ্যে ধরে, চাঁদনীও তার দিকে তাকিয়ে থাকে, "আমরা কেউই একবারের জন্যেও ভেবে দেখলাম না, এ মানুষটি ভিলাই গিয়ে যে কাজ শুরু করেছেন তাতে সারা দেশের মালিকশ্রেণী, সরকার সবার রাতের ঘুম চলে গিয়েছে। সুতরাং তাঁকে বাঁচিয়ে রাখা যায় না —।"

তারপর শান্ত হয়ে প্রায় স্বগতোক্তির মত অনেকগুলো কথা অভী বলে যায়, "এমন কিছু কথা বোধহয় মানুষের মনে জমে থাকে যা সে কোনভাবে কোথাও প্রকাশ করতে পারে না। যেমন নিয়োগীজীর মৃত্যুর কথা যখন ভাবি তখন অনেক এলোমেলো কথা মাথার মধ্যে জমে যার সমাধান নিজেও করতে পারি না, আবার কাউকে বলতেও পারি না! তাই তোমায় বলি। দেখো, নিয়োগীজী তাঁর রাজনীতির জীবনে কাজ শুরু করেছিলেন ভিলাই থেকে বাষট্টি সালে। এখানে একটি কথাই তোমায় বলব, উনি স্বয়ংক্রিয় মানুষ ছিলেন।"

সোমা তাকায়, 'স্বয়ংক্রিয় বলতে —।'

অভী ধীর গলায় বলে, "আমাদের শল্যবিদ্যায় কিডনি পড়াতে গিয়ে বলা হয়, কিডনিকে

দেহের সবাই পরিচালনা করে, মানে যাদের পরিচালনা করার কথা। এতদ্‌সত্ত্বেও কিডনি একটি স্বয়ংক্রিয় অঙ্গ, অর্থাৎ সে নিজেকে নিজে পরিচালিত করে, এই জন্য কিডনি প্রতিস্থাপিত করা সম্ভব হয়। নিয়োগীজীর ক্ষেত্রেও ঠিক এই কথাটা প্রযোজ্য। একটা ভিন্ন পরিবেশে বড় হওয়া এই মানুষটিকে এই ছত্তিশগড়ের মাটিতে প্রতিস্থাপিত করা এই কারণে সম্ভবপর হয়েছিল। মার্কসবাদ থেকে শুরু করে গান্ধীবাদ উনি যার দ্বারা যেভাবেই পরিচালিত হন না কেন, উনি সর্বদা সৃষ্টিশীল, স্বয়ংক্রিয় মানুষ ছিলেন। এ যারা তাঁর সঙ্গে মিশেছে তারাই জানে।"

সোমা জিজ্ঞাসার চোখে তাকায়, "কিন্তু একটা প্রধান ভাবনা নিশ্চয়ই তাঁর ছিল।"

অভী মাথা নাড়ায়, "হ্যাঁ, তিনি তাঁর সমস্ত ভাবনাচিন্তাকে একটি জায়গায় নিবদ্ধ করেছিলেন সেটা হচ্ছে, ছত্তিশগড়ের শ্রমিকদের মধ্যে থেকে কমিউনিস্ট তৈরি করতে হবে যারা এ দেশের সমস্ত প্রতিকূল শক্তির বিরুদ্ধে মনপ্রাণ সঁপে দেবে। এ ব্যাপারে তিনি নিজেই নিজের গুরু ছিলেন।"

তারপর একটু চুপ করে বলে, "ঠিক এই কথাটাই রামকৃষ্ণদা বলেন, আর গুরু খোঁজার দরকার নেই নিজেই নিজের গুরু হ্।"

হঠাৎ কোন একটা কথা বলার প্রস্তুতি নিয়ে সে সোমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বলে, "জানো, আমাকে অনেকে জিজ্ঞাসা করেন নিয়োগীজী ঠিক কী ছিলেন? কেউ তাঁকে বলে গান্ধীবাদী, কেউ বলে উগ্রপন্থী, কেউ বলে পরিবেশবাদী, কেউ বলে আঞ্চলিকতাবাদী, কেউ বলে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী, কেউ বলে কমিউনিস্ট — আসলে সবাই তাঁকে নিজেদের কল্পনার খাটে শুইয়ে মাপ করে, তিনি ক'ফুট, ক' ইঞ্চি ছিলেন।"

সোমা হেসে ওঠে, "চমৎকার বলেছো তো!"

অভী বাইরে যাবার প্রস্তুতি নিয়ে উঠে দাঁড়ায়, "হ্যাঁ, বলতে পার, নিয়োগীজী মরে প্রমাণ করে দিয়ে গেলেন তাঁর বিরুদ্ধে সমস্ত ধরনের অভিযোগ কত দূর ভিত্তিহীন ছিল।"

অল্প কিছুক্ষণ পর বাইরে থেকে ফিরে এসে অভী একবার চারপাশে তাকিয়ে কী একটা কথা মনে করার ভঙ্গিতে হাত নেড়ে বলে ওঠে, "হ্যাঁ তা যা বলছিলাম, ভিলাইয়ের সব ধরনের মানুষই তাঁর চেনা। কিন্তু তিনি ভিলাই থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন প্রায় আট-দশ বছর। তখন তিনি এখানকার চারপাশে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়িয়েছেন।"

সোমা বলে ওঠে, "উনি তো পেশায় ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন।"

অভী জল খায়, সোমা জিজ্ঞাসা করে, "চা করব?"

অভী হাত নাড়ে, "কিন্তু পেশার কাজ উনি আদৌ কতদিন্ করেছেন সন্দেহ আছে। কিন্তু এখানে যান্ত্রিকীকরণের আন্দোলনে তাঁর এই পেশার জ্ঞান তাঁকে খুব সাহায্য করেছিল। যাই হোক, উনি এখানকার গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়িয়ে ভারতবর্ষকে বোঝার চেষ্টা করলেন। এর

মধ্যে এখানকার দানীটোলার গ্রামে খাদানে আখড়া বাঁধলেন, সেই গ্রামের একটি আদিবাসী মেয়েকে বিয়ে করলেন এবং খনির মজদুর হয়ে এখানকার লৌহখনি এলাকায় সংগঠন গড়ে তুললেন। এই সংগঠন হয়ে দাঁড়াল ভারতবর্ষের শ্রমিকদের আদর্শ সংগঠন। আমি জানি না, এইরকম সংগঠন কোন শ্রমিক নেতা ভারতবর্ষে কোথাও গড়ে তুলতে পেরেছেন কিনা।''

সোমা জিজ্ঞাসা করে, ''তখন আর ভিলাই যেতেন না।''

অভী দেহে মোচড় দিয়ে বলে, ''খুব কম। এখানকার মানুষও যুগ যুগ ধরে সেই ঠিকাদারদের মধ্যযুগের বর্বরতার শিকার হয়েছিল। এদের নিয়ে নিয়োগীজী তুমুল লড়াই করেছেন; এমন লড়াই যাতে একবারের ঘটনায় পুলিসের গুলি খেয়ে এগারোজন মারা গেছেন। তবু তাঁরা লড়াই ছাড়েননি। কিন্তু তার ফল হয়েছে চমৎকার। আজকের এই সমস্ত নির্মাণকর্মের ফসল হচ্ছে ঐ জয়। এই খনি শ্রমিকদের অধিকাংশই আগে পশুর মত জীবনযাপন করত।''

অভীকে থামিয়ে সোমা বলে, ''হ্যাঁ আমি পড়েছি, এদের নিয়ে উনি সাফাই আন্দোলন, হাসপাতাল, স্কুল এইসব করেছেন।''

অভী নড়েচড়ে বসে, ''ভারতবর্ষে কোথাও শ্রমিকরা এত টাকা দৈনিক মজুরি পায় কিনা আমি জানি না। এই কয়েক বছরে এদের চেহারাই পাল্টে গেছে। ছেলেমেয়েরা ভাল পোশাক পরে, সাইকেলে চড়ে স্কুলে যাচ্ছে, এদের অনেকের বাড়িতে তুমি পাবে রান্নার গ্যাস, টিভি এমনকি ফ্রীজও। এই তো মানুষের মত বাঁচা। ঐ মানুষটি সেই বাঁচার রাস্তাটা দেখিয়ে দিয়েছেন। তেমনি তিনিও তো এদের সঙ্গে জলের মধ্যে মাছের মত ছিলেন। কারো ক্ষমতা ছিল না এখানে তাঁর কেউ কোন ক্ষতি করতে পারে!''

তারপর কী মনে করে অভী হাসে, ''একবার মোর্চার একটা গুরুত্বপূর্ণ মিটিং চলছে তখন একজন বাঈ এসে অভিযোগ করে যে তার কমরেড মেয়েকে স্কুলে যেতে দিচ্ছে না। নিয়োগীজী একেবারে দপ্ করে জ্বলে উঠলেন। সামনেই সেই কমরেডকে পেলেন একেবারে তুলোধুনো করে ছাড়লেন। তিনি এতদিন ধরে চেঁচিয়ে আসছেন বাইরের লোকজন এসে ছত্তিশগড়ে চাকরি করে, এখানকার লোক কাজ পায় না! কিন্তু কী করে তা পাবে, এখানকার মানুষরা যদি নিজেরাই নিজেদের চিরকাল অশিক্ষিত করে রাখার বন্দোবস্ত করে। কাজ কী পড়ে থাকবে। খাদানে যন্ত্র বসছে সেই যন্ত্র চালাতে হলেও শিক্ষিত কর্মী চাই।''

সোমা হাত নাড়ে, ''এই যান্ত্রিকীকরণের ব্যাপারটা তোমার কাছে ভাল করে বুঝবো।''

অভী শব্দ করে হাই তোলে, ''ভাল কথা, তোমাদের সম্মেলনে এই নিয়ে কোন আলোচনা হয়নি?''

সোমা হাসে, ''ঐসব আলোচনা চলতে চলতেই তো অসুস্থ হয়ে পড়লাম। তখন হিরির কমরেডরা বক্তব্য রাখছিল, তাদের ওপর কী অমানবিক অত্যাচার হয়েছে, নিয়োগীজী কেমন করে ওদের লড়াইয়ে মদত দিয়েছিলেন সেই বর্ণনা দিচ্ছিলেন।''

অভী মনে করিয়ে দেয়, "এ ব্যাপারে নিয়োগীজীর চমৎকার লেখা আছে।"

সোমা সায় দেয়, "হ্যাঁ আমাদেরও দিয়েছে। দেখা যাচ্ছে, যান্ত্রিকীকরণে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মহিলা শ্রমিকরা, নিয়োগীজী তো তথ্য দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। এটা নিয়েও আমাদের একটা জোর লড়াই হবে।"

অভী জিজ্ঞাসু চোখে সোমার দিকে তাকায়, "এদের সংগঠন দেখে তোমার কী মনে হল?"

সোমা একটু চিন্তা করে বলে, "এখানকার মেয়েরা অনেক এগিয়ে আছে। কারণ তারা উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত, তাই লড়াইটা ঠিকমত বোঝে। স্বামীদের মদ তাড়ানোয় তুমি তাদের যেমন পাবে আবার শহীদের দলেও তুমি তাদের পাবে। যাক্ তুমি ভিলাইয়ের কথা বল।"

"হ্যাঁ এ ব্যাপারে একটা কথা তোমায় বলি। আমরা চেনা মার্কসবাদ দিয়ে ভিলাইকে ব্যাখ্যা করতে পারব না। রুশ সহযোগিতায় ভিলাই তৈরি হয়েছে, ভারতবর্ষের সর্বাধুনিক ইস্পাত কারখানা হিসাবে কাজ শুরু করেছে প্রায় তেতাল্লিশ বছর। কিন্তু এর একশ' কিলোমিটারের মধ্যে তুমি পাবে মধ্যযুগীয় বর্বর অবস্থা — এখানে সুপ্রীম কোর্টের আদেশবলে দাসশ্রমিক প্রথার অবসান ঘটানোর চেষ্টা চলছে, কোথাও হাজার হাজার শিশুর মৃত্যু ঘটছে বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাবে, এখানে আদিবাসী মানুষজন আক্ষরিক অর্থে পশুর মত জীবনযাপন করে আর তা নৃতত্ত্বের বিষয় হিসাবে বিদেশীরা দেখে যায়। বেশ, তাহলে মার্কস-লেনিন যে বলছেন শ্রমিক, শ্রমিক-সম্পর্ক, উৎপাদন-সম্পর্ক এইসব কোথাও একবার শুরু হলে তা ক্রমশ চারপাশে ছড়িয়ে পড়বে, কই তা তো এখানে এত বছরেও দেখা যাচ্ছে না। অথচ শুরু থেকে আজ ভিলাইয়ের উৎপাদন বেড়েছে প্রায় ছ'গুণ।"

সোমা হঠাৎ আধশোয়া অবস্থা থেকে উঠে বসে, হাসে, "তোমাকে বার বার থামিয়ে দিচ্ছি, আসলে প্রশ্নগুলো এমন মাথার মধ্যে এসে যাচ্ছে যে তক্ষুনি না বলেও পারছি না।"

অভী হাসে, "না বল, আড্ডার তো মজা এটাই, বলতে বলতে যা নিজের কাছেও হয়তো পরিষ্কার ছিল না তা স্বচ্ছ হয়ে ওঠে। বাঙালিদের যত দোষই থাক্ — তাদের এই আড্ডাটা যেন সভ্যতার শেষ দিন অব্দি বেঁচে থাকে।"

সোমাও হাসে, "আচ্ছা, এই রাশিয়া সম্পর্কে আমাদের কমিউনিস্টদের একটা অসম্ভব দুর্বলতা আছে বলে কখনো তোমার মনে হয়েছে?"

অভী আঙ্গুলে তুড়ি বাজিয়ে বলে, "এই না হলে সোমাবাঈ। আর দেখবে যার প্রতি মানুষ দুর্বল হয়ে পড়ে তার দোষ-ত্রুটিও তখন চোখে পড়ে না।"

তারপর কিছুক্ষণ চিন্তা করে অভী বলে, "দাঁড়াও আমি দেখবো, আমার কাছে অভিজিতের ঐ বইটা আছে কিনা। চমৎকার বই, তাতে ও দেখিয়েছে, কেমন করে অসম চুক্তির মাধ্যমে রাশিয়া আমাদের দেশটাকে লুটেপুটে খাচ্ছে আর আমেরিকাকে ঠেকাবার জন্য অস্ত্র বানাচ্ছে। আসলে ব্যাপার কী জানো, রাশিয়া লেনিন-গোর্কি-গ্যাগারিনের দেশ। আমার মনে আছে, বাবা

আমায় ছেলেবেলায় বলত, কী রে গ্যাগারিন হবি। পরে কোন অপরাধ করলে দাদারা ভেঙ্গাতো, এই ছেলে নাকি গ্যাগারিন হবে!"

অভীর বলার ভঙ্গিতে সোমা হেসে ওঠে।

অভী বলে যায়, "তাই আমরা সবাই রাশিয়ার প্রতি এতখানি দুর্বল; কিন্তু এটা তো বুঝতে হবে কাউকে যতই আমি ভালবাসি তার মলমূত্র নিশ্চয়ই সুবাসিত হয়ে উঠবে না। আমার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে কেউ যদি আমায় দিনের পর দিন ঠকায় তাহলে আর যাই হোক, তাকে আমি আমার নেতা বলতে পারব না। এই ব্যাপারে শুধু রাশিয়া কেন, চীন মানে পৃথিবীর যে কোন কমিউনিস্ট পার্টির ক্ষেত্রে নিয়োগীজী একই কথা বলতেন।"

সোমা সায় দেয়, "হ্যাঁ, নিয়োগীজী আমাদের ওখানে বক্তৃতায় এটাও তথ্য দিয়ে দেখিয়েছিলেন, কেমন করে নির্ভরশীল পুঁজিপতি আর ঠিকাদাররা ভিলাইকে লুটেপুটে খাচ্ছে। আর রাশিয়া জোর করে তাদের পরিত্যক্ত যন্ত্রগুলো আমাদের দিয়ে কেনাচ্ছে।"

তার দিকে চোখ বড় বড় করে অভী বলে, "ওসব কিছুই না। নিয়োগীজীর কাছে যা মালমশলা ছিল তুমি ভাবতে পারবে না —।"

তারপর হাতের কড় গুণে বলে, "এ দেশের আমলা, শিল্পপতি, রাজনীতির লোক এরা সবাই মিলে শুধু তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য ঐ দেশগুলোর কাছে এ দেশের সম্পদ জলের দামে, বলতে পার প্রায় কোন দাম না নিয়ে বিক্রি করে দিচ্ছে। এটা সহ্য করা যায় না। আমরাই দেশ থেকে কাঁচা লোহা জলের দামে নিয়ে আমাকে চড়া দামে পিগ লোহা বিক্রি করবে অথচ আমার পিগ লোহা তৈরির কারখানাকে অলাভজনক ঘোষণা করে বন্ধ করে দেওয়া হবে — এ আমি কখনই হতে দিতে পারি না।"

সোমার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে অভী হাসে, গলাটা খাটো করে বলে, "ছেলেবেলায় সুকান্ত'র কবিতার একটা লাইন পড়েছিলাম, ... বুঝব তুমি এ দেশের মানুষ নও, গোপনে গোপনে দেশদ্রোহের পতাকা বও। অর্থাৎ এ দেশের লোক ভুখা মরলেও তোমার কোন প্রতিক্রিয়া হয় না, তুমি দিব্যি সুইস ব্যাঙ্কে টাকা জমিয়ে যাও। তা নিয়োগীজীকে গোপনে তুমি জিজ্ঞাসা করলে তুমি জানতে পারতে রাশিয়ার ব্যাপারে আমাদের কমিউনিস্টদের কার্যকলাপকে তিনি দেশদ্রোহিতা মনে করতেন। কারণ তাঁর হাতে ভূরি ভূরি প্রমাণ ছিল।"

সোমা হতাশ হয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে, "তাহলে দেখ কাউকে বিশ্বাস করা যায় না!"

অভী দাঁড়িয়ে কবিতার সুরে অঙ্গভঙ্গি করে বলে যায়, "... বিশ্বাস, বিশ্বাস কী পণ্য, ফেরি করে ফিরবি তুই একে ওকে তাকে। ... বিশ্বাস বলিষ্ঠ পা, পায়ে মাটি ...।"

তারপর গলা চড়িয়ে সে বলে, "এ দেশের তথাকথিত প্রগতিশীল রাজনীতির লোকজনের কাছে নিয়োগীজীর একটাই আবেদন ছিল, খেটে খাওয়া মানুষের বিশ্বাসকে পণ্য করে দেবেন না। কিন্তু যখন তিনি দেখলেন, বিশ্বাসকে এরা পণ্য না করে ছাড়বে না তখন তিনি নিজের বলিষ্ঠ পায়ে উঠে দাঁড়ালেন। আমাদের কাছে তিনি বলতেন আমাদের মার্কসবাদ আছে,

বিদ্যাসাগর আছে, রবীন্দ্রনাথ আছে এমনকি গান্ধীও আছে।''

সোমা যেন অভীর কোন ভুল ধরেছে এইভাবে বলে ওঠে, ''না, তোমাদের কাছেই শুনেছি রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবোধের ধারণা খুব গোলমেলে ছিল।''

অভী যেন খেদের সঙ্গে বলে ওঠে, ''হায়! শুধু মুখের কথাই শুনলে, শুনতে পেলে না এমন ছেলের অন্তরের ব্যথা। তুমি না জননী! তোমাদের শত জীবনের সৌভাগ্য যে রবীন্দ্রনাথের মত এমন একটা কর্মবীর ছেলে পেয়েছিলে। সেই ছেলেকে এখনও তোমরা চিনতে পারলে না। তবে শোন, তোমরা তাঁকে চেনো তাঁর কবিতা আর গানের মধ্যে; কিন্তু একটা কথা জানবে, তাঁর মত ভারতবর্ষের কোন একক ব্যক্তি এ দেশের জন্য এত কাজ করে যাননি।''

সোমা দু'হাত তুলে আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে বলে, ''আচ্ছা মার্জনা চাইছি, এবার নিয়োগীজীর কথা বল।''

সোমার ওপর জোর করে নিজের বিশ্বাসটা চাপিয়ে দিতে পেরে কর্তৃত্বপরায়ণ পিতার মত অভীর একটা পরিতৃপ্তি হয়। আর তার ফলে সে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কোন কথা মনে পড়ায় হঠাৎই হেসে ওঠে।

সোমা অবাক হয়ে তাকায়, ''হাসির কী হল?''

অভী তখনও হেসে চলে, ''না, কিছু না। একবার নিয়োগীজী কলকাতা থেকে ফিরে বললেন, নেতাজীকা হালত বহুত খারাপ হ্যায়। আমি বললাম, নয়া কোন চিজ নিকলা, যো হোনা থা ও তো হো গিয়া। তখন নিয়োগীজীর কথা শুনে বুঝলাম, আর্মহার্স্ট স্ট্রীটের মোড়ে কোথায় উনি দেখেছেন নেতাজী সু স্টোর, নেতাজী মিষ্টান্ন ভাণ্ডার। সুতরাং এর পরে লাইনে আছেন নেহরু, গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ।''

সোমা হেসে লুটোপুটি খায়। তারপর হেসে কেশে গলা পরিষ্কার করে বলে, ''আচ্ছা তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, নেতাজীকে নিয়ে বাংলায় কোন গল্প-উপন্যাস লেখা হয়েছে?''

অভী প্রশংসার দৃষ্টিতে সোমার দিকে তাকিয়ে বলে,'না'।

তখন সোমা যোগ করে, ''অথচ দেখ শুধু নেতাজী ছাড়া ইতিহাসের সব ঘটনা নিয়ে বাংলায় কাহিনী আছে।''

অভী হাসে, ''তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে ওদের দলকে বলি, অন্তত এই কাজটা করার জন্য টেন্ডার ডেকে কাউকে ঠিকা দিন।''

সোমা হেসে মাথা ঝাঁকায়, ''বেশ তুমি নিয়োগীজীর কথা বল।''

অভী যেন প্রবল উৎসাহ পায়, ''হ্যাঁ নিয়োগীজী বলতেন, এরা দেশকে কেউ ভালবাসে না। দীর্ঘদিন পরাধীন থাকার জন্য এদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে গেছে। তিনি ছত্তিশগড়ের শ্রমিকদের কাছে উদাত্ত কণ্ঠে বলতেন, মনে রাখবেন কমরেড এ দেশের প্রতিটি ধূলিকণা আশা করে আপনি এ দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করবেন।''

সোমা সায় দেয়, "আমাদের ওখানেও উনি এই কথা বলেছেন, এ দেশের শাসকদের চরিত্র হল সব দিক থেকে দেশটাকে দুর্বল করে দেওয়া। তাঁর মত হল, এটাই ভারতবর্ষের চরিত্র, সে টাটা থেকে আরম্ভ করে সমস্ত শিল্পপতিরা রাষ্ট্রীয় পুঁজির ওপর ভিত্তি করে বছরের পর বছর দেশের লোককে ঠকিয়ে তাদের মুনাফা করেছে।"

অভী অধৈর্যের সঙ্গে বলে ওঠে, "সে লুটপাট করুক তাতেও আমার আপত্তি নেই। চিরকাল বুর্জোয়ারা তাই করে এসেছে; কিন্তু আমরা চাইব অন্তত এখানকার মেঘে এখানেই বৃষ্টি হোক।"

তারপর অভী যেন উত্তেজিত হয়ে পড়ে, "কিন্তু সব থেকে বড় কথা, সত্তর বছর ধরে আমাদের কমিউনিস্টরা এত লড়াই করছে, এত কলকারখানা তৈরি হয়েছে; কিন্তু আমার শ্রমিকশ্রেণী এল কই, চারপাশে এর প্রভাব পড়ল কই, আমি কমিউনিস্ট পেলাম কই — তাহলে আমাকে বলতেই হবে এ দেশে মার্কসবাদের এই অংশটা অসম্পূর্ণ?"

সোমা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, "এ তো সমগ্র পৃথিবীর সমস্যা!"

অভী যেন একটু দম নেয়, "ভিলাই সম্পর্কে নিয়োগীজীর মন্তব্য হল, টবের গোলাপ গাছ। যত্ন করে রাখা, সাজিয়ে লোককে দেখানোর মত। তুমি জেনো এখানকার সমস্ত নদী-নালাগুলো বেঁধে ভিলাইয়ে জল দেওয়া হয়। ভিলাইয়ে জল নষ্ট হয় আর এই চারপাশের অঞ্চলে বছরের পর বছর চলে আসছে খরা, হাজা, শুখা, ভুখমারি। ভিলাইয়ে লোহাপাথর সরবরাহ করার জন্য হাজার হাজার একর জমি নষ্ট করা হয়েছে। এখানকার স্বাভাবিক জলনিকাশী ব্যবস্থাটা নষ্ট হয়ে গেছে।"

তারপর চুপ করে মাথা চুলকে বলে, "যাই হোক, এই নিয়ে হা-হুতাশ করে তো লাভ নেই। এ বোধহয় এই আগ্রাসী সভ্যতার অবশ্যম্ভাবিতা। তবু ভিলাই তো রাজনন্দগাঁও নয়। ভিলাই বড় শহর, ঠিকেদার মাফিয়া এইসব জটিল কুটিল স্বার্থান্বেষী সুযোগসন্ধানী মানুষ যেন সেখানে থিক্ থিক্ করছে। অথচ সেখানে যারা আন্দোলন করছে তাদের কারো সংগঠন এখানকার মত মজবুত নয়। তাহলে নিয়োগীজীর মত মানুষ সেখানে কোন্ ভরসায় পা রাখলেন! একটা জঙ্গি শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হলে সেইরকম মজবুত সংগঠন তো চাই।"

সোমা জিজ্ঞাসা করে, "কিন্তু শুনেছি ভাল সংগঠনই ওখানে ছিল।"

অভী হাসে, "না, তা ছিল না, থাকা সম্ভব নয়। মনে রাখবে, যেখানে কামিয়েনিস্ কেরানিরা চরে বেড়াচ্ছে সেটা পৃথিবীর বিপজ্জনকতম জায়গা। নিয়োগীজী জানতেন, তীব্র শোষণ হলেই আন্দোলন গড়ে তোলা যায় না। তার জন্য চমৎকার সংগঠন দরকার হয়। তিনি তো জানতেন, আগে এই সংগঠন তাঁকে গড়ে তুলতে হবে, তারপর তিনি সেখানে আন্দোলন শুরু করবেন। তিনি তো বার বার বলে গেছেন, তাঁকে হত্যা করার চক্রান্ত করা হচ্ছে। সবাই এখানে তাঁর বিরুদ্ধে। সবাই এখানে নিয়োগীজীকে খতম করার জন্য ঠিকেদার মাফিয়াদের সঙ্গে হাত

মিলিয়েছে।"

সোমা গালে হাত দিয়ে অভীর কথা শুনে যায়, "এত বছর পর নিয়োগীজী আবার সেখানে পা রাখছেন এমন একটা বিশাল বড় মাপের শ্রমিক আন্দোলন করার জন্য। তিনি তো জানতেন, ভিলাইয়ের ঠিকাদার-শ্রমিকরা জয়লাভ করলে ভারতবর্ষের শ্রমিকরা নতুন ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সূর্যোদয় দেখবে। রাজনন্দগাঁওয়ের খনি-শ্রমিকদের আন্দোলন তার তুলনায় সমুদ্রে বারিবিন্দুর মত। এই কথাটা নিয়োগীজীর মত এতদিনের পোড় খাওয়া মানুষও বুঝতে পারলেন না! এটাই ভাবতে পারছি না।"

সোমা আনমনে তাকিয়ে থাকে, "তুমি এখন এসব কথা বললে সবাই বলবে, চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে। তাছাড়া এমন রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড যে ঘটে না তা তো নয়!"

অভী মাথা নাড়ে, "আসলে সমস্যাটা কী হয় জানো তো, খারাপ মানুষ মরলে দুঃখ পাই না কারণ জানি তার শূন্য আসন সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণ হয়ে যাবে; কিন্তু একটা ভাল মানুষ মারা গেলে অশেষ দুঃখ হয় কারণ ঐসব ভগবানের দূতরা তো সচরাচর পৃথিবীতে পা ফেলেন না। সব যুক্তি দিয়েও মন মানতে চায় না, যখন ভাবি, আমাদের সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে যে কথাটা বুঝতে পারি সেই কথাটা নিয়োগীজীর মত একজন কমিউনিস্ট বুঝতে পারলেন না। এমন কমিউনিস্ট ভারতে কতজন তৈরি হয়েছে বা হবে! এই ক্ষতি কী আমরা আর কোনদিন পূরণ করতে পারব?"

অভীর চোখদুটো ছলছল করে ওঠে।

সোমা অভীর অবস্থা বিবেচনা করে প্রসঙ্গটা পাল্টাবার চেষ্টা করে, জিজ্ঞাসা করে, "আচ্ছা তোমার কথা থেকেই বলি, নিয়োগীজীকে কী কমিউনিস্ট বলা যায়?"

"তাহলে এ দেশে আর কাকে কমিউনিস্ট বলবে!"

সোমা ব্যাখ্যা করে, "না, কথাটা বলছি এইজন্য যে তোমাদের কাছেই শুনেছি, একজনকে কমিউনিস্ট হতে হলে তাঁর তাত্ত্বিক কাজকর্ম থাকতে হবে, তা সে যত কমই হোক। তা নিয়োগীজীর কী তেমন তাত্ত্বিক কাজকর্ম কিছু ছিল?"

অভী একটু চিন্তা করে বলে, "একেবারে নেই তা নয়, তবে তুমি বলতে পার প্রয়োজনের তুলনায় তা কিছুই নয়। ঠিকই বলেছ, তিনি এতদিন ধরে একটা জায়গায় কাজ করেছেন, সুতরাং আরও একটু তাত্ত্বিক কাজকর্ম থাকলে ভাল হত। সুতরাং তাঁর লেখাপত্র ছাড়া তো কোনভাবে বোঝার উপায় নেই যে তিনি কী ভাবতেন বুঝতেন বা তিনি কী করতে চেয়েছিলেন।"

ক্লান্ত সোমা প্রসঙ্গ পাল্টায়, "আচ্ছা, এবার তোমাদের বন্ধুদের খবর কী বল?"

অভীক কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মুখ তুলে তাকায়, "তুমি কী আজ রাত্রে ঘুমাবে না ঠিক করেছ, সারারাত গল্প করবে!"

সোমা হেসে উঠে বসে, "তাই কী হয় মশাই, আমি জানি তোমার কাল সারাদিন কাজ আছে। আচ্ছা তোমায় বলে রাখছি, কাল তুমি হাসপাতাল চলে গেলে আমি একটু চাঁদনীকে

নিয়ে এদিক-ওদিক ঘুরব, এই আশেপাশে।''

অভী হাই তুলে সম্মতি জানায় তারপর আগের কথার রেশ টেনে বলে, ''বন্ধুদের আর নতুন কী খবর হবে, সব ভাল, সবাই যে যার ক্ষমতা সামর্থ্যমত জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর মধ্যে কেউ কেউ তাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষার শিখরে উঠে গেছে, আবার কেউ কেউ সেটা করতে পারেনি বলে মনে দুঃখ আছে। কেউ হয়তো বিগত দিনের ছাত্র-যুব অবস্থার গড়ে ওঠার কালে এই ধরনের বিপ্লবী বামপন্থী রাজনীতি করে সময় কাটানো ভুল হয়েছে বলে মনে করে। কেউ মানিয়ে নিয়েছে ভালভাবে। কেউ হয়তো বিগত ইতিহাসটাকে মূলধনের মত কাজে লাগায়। হয়তো এখনও কেউ কেউ এই ধরনের কাজের প্রতি সহমর্মী, এই আমাদের মত আর কী! তবে সংখ্যায় খুব অল্প হলেও কিছুজন নিশ্চয়ই আছে যারা এখনও লড়াই করে যাচ্ছে। অন্যদের কথা আর কী বলব, আমিই তো অনেকখানি সরে এসেছি। তা সবাই এইরকমই আছে!''

সোমা আনমনে তাকিয়ে থাকে, ''আমারও তাই মনে হয়, ঠিক হুজুগ বলব না, তাহলে ছোট করা হয়, তবে এটা একটা জোয়ার নিশ্চয়ই ছিল।''

অভী তার কথায় সায় দেয়, ''হ্যাঁ এইরকম জোয়ার এ দেশে আরও বহুবার এসেছে, দুটো বিশ্বযুদ্ধের আগে পরে। একটা কথা মনে হয়, বিশ্বপ্রকৃতিকে ভালভাবে জানবার বুঝবার ব্যাপারে বিজ্ঞান এতখানি এগিয়ে গেছে যে আজ তার প্রতি মুখ ঘুরিয়ে থাকার অর্থই হল ক্রমাগতভাবে পিছিয়ে যাওয়া। আর এইসব বিজ্ঞানশিক্ষার মধ্যে দিয়ে একটা বিজ্ঞানমনস্ক মন তৈরি করতে না পারার জন্য দেশের নবযুবার দল সব কালেই চরমপন্থী হয়।''

গায়ে চাদরটা ভাল করে জড়িয়ে নিয়ে সোমা বলে, ''সে যাই হোক, বলতেই হবে এই জোয়ারে বহু মানুষ জড়ো হয়েছিল। তারা ভাল মন নিয়ে কিছু করতেও চেয়েছিলেন, কেউ কেউ নিশ্চয়ই করেছেন। তাদের আত্মদান কোন ছোট করার বিষয় নয়। তারপর জোয়ার চলে গেছে, এখন ভাঁটার টান।''

অভীক দুই হাত তুলে ভঙ্গিমা করে দেখায়, ''তারপর এল পুত্রকন্যা সংসারে সে যে অথৈ বন্যা।''

দু'জনে হো হো করে হাসতে থাকে।

তারপর অভী যোগ করে, ''তাও আমাদের দুর্ভাগ্য দেখ, দু'চারটে তেমন বংশধর এরা তৈরি করতে পারেনি, তাহলেও আমরা বলতে পারতাম, অন্তত একটা কাজ এরা করেছে, এ বাঘের বাচ্চা বাঘ না হয়ে যায় না।''

সোমা হাসে, ''বাঃ, আধুনিক বাবা-মা'রা তাদের ছেলেমেয়েকে উত্তর-আধুনিক করার জন্য আমেরিকা পাঠাচ্ছে, এটা বুঝি খুব সহজ কাজ ভাবছো।''

এখন অভীও অনেক সহজ হয়ে এসেছে তাই যা মনে আসে বলে চলে, ''আসল ব্যাপারটা কী জানো, সময়। সেই সময়টা বোধহয় অন্যরকম ছিল।''

সোমা হাসে, "আবার তোমাদের কাছেই শুনেছি, সময় আপনি আসে না, সময় তৈরি করে নিতে হয়।"

অভী হাসে, "হ্যাঁ আগে ঐরকমই বলতাম বটে, এখন মনে হয় সময় যেন অবস্থাটা পাকিয়ে দেয়। উপযুক্ত সময় না এলে অবস্থা পাকে না। এই নিয়ে নিয়োগীজীর সঙ্গে অনেক কথা হয়েছে।"

সোমা তাড়াতাড়ি বলে ওঠে "নিয়োগীজীর ভাবনা-চিন্তাটা বড় চমৎকার ছিল, না!"

অভী যেন আনমনে কিছু ভাবে, "হ্যাঁ জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের খাতিরে অতি চমৎকার। উনি বলতেনও শুধু 'মানিনি' 'মানছি না' 'মানব না' এইসব কথা বলে নিজেদের দায়িত্ববোধ বাড়ানো যায় না। তুমি এই ব্যবস্থাটা মানতে চাইছো না, তাহলে তোমাকেও মানুষের মধ্যে থেকে কিছু তৈরি করে দেখাতে হবে, এর বিকল্প তুমি কী ভাবছো! যত ছোটই হোক তোমায় মানুষকে বোঝাতে হবে তুমি আসলে কী চাও?"

সোমা তার কথায় সায় দেয়, "ঠিকই তো, সাধারণ মানুষ অত তত্ত্বকথা বোঝে না। তারা চোখের সামনে কিছু দেখতে চায়, তবেই তাদের কাছে আমাদের বিশ্বাসযোগ্যতা প্রমাণ হয়। তাছাড়া আমাদের মানুষ এতদিন ধরে অনেক বড় বড় কথা নেতাদের কাছে কেবলই শুনেছে পরিণামে কিছুই দেখেনি।"

শুনতে শুনতে অভীর যেন কোন একটা কথা মনে পড়ে যায়, "একবার একজন কমরেডের বিয়ের ভোজ খেতে গিয়ে দেশের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা নিয়ে তুমুল তর্ক বেধে গেল। আরও অনেকে ছিল। কারো খেয়াল নেই যে, একটা বিয়ে বাড়ির অনুষ্ঠান সেটা। সেখানে নিয়োগীজীর একটা কথা আমার মনে গভীরভাবে দাগ কেটেছিল।"

তারপর দম নিয়ে অভী বলে, "উনি বললেন, এই যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার টাকা এ তো আমার দেশের মানুষের শ্রমের রক্ত জল করা পয়সা। এসব তৈরি হয়েছে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার সাফল্য দেখে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রচুর টাকা নানা বিকাশের খাতে খরচ করা হয়েছে। কিন্তু আমাদের কমিউনিস্ট, সমাজ-গণতন্ত্রীদের এই কথাটা বোঝার ক্ষমতা ছিল না যে, পরিকল্পনা খাতের এই টাকাটা দিয়ে এই গরিব দেশে নির্মাণের লড়াই চালাতে হবে, এটাও শ্রেণীসংগ্রাম। এ কাজ হলে তখন থেকেই সংঘর্ষ ও নির্মাণের তত্ত্ব চালু হয়ে যেত।"

সোমা এই শুনে হাততালি দিয়ে ওঠে, "দারুণ, দারুণ!"

চাঁদনী চমকে ওঠে!

অভী যেন কিছু জয় করে ফেলেছে এমন ভঙ্গিতে হেসে চাঁদনীর দিকে তাকায় আর বলে, "এই সঙ্গে আমাদের নেতাদের ব্যক্তিগত জীবনযাপনের কথা ভাব। সাধারণ মানুষ এসব অত্যন্ত গুরুত্ব নিয়ে দেখে। এদিক থেকে নিয়োগীজী তো গান্ধীর মত সহজ-সরল জীবন-যাপন করতেন।"

সোমাও মাথা নাড়ে, "আমাদের এই অশিক্ষিত পিছিয়ে পড়া দেশে নেতাদের ব্যক্তিগত জীবন-যাপন অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষভাবে সাধারণ মানুষের কাছে যদি এই রাজনীতির কোন বিশ্বাসযোগ্যতা প্রমাণ করার প্রয়োজন হয়।"

অভী মাথা নাড়ে, "তখন ঐ উৎসাহ-উদ্দীপনায় মানুষ আগ্রহ নিয়ে নিজেরা কিছু করে, তাতে তাদেরও আত্মবিশ্বাস, মনোবল বাড়ে। সে মনে বল পায় এই ভেবে যে আমরাও পারি। এখানকার সমস্ত নির্মাণকর্মই তাই। নিয়োগীজীর মাথায় বহু পরিকল্পনা ছিল; কিন্তু আজ সব কোথায় কর্পূরের মত উবে যাচ্ছে।"

এই পর্যন্ত বলে সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, "মাঝে মাঝে ভাবি, এখানে সবই আছে একই আকাশ মাটি জল; কিন্তু সেই মানুষটাই নেই।"

সোমা দাঁত মাজতে মাজতে যোগ করে, "যে মানুষটা বনলতা সেনের মত বলে উঠবে, এতদিন কোথায় ছিলেন মশাই!"

অভী যেন লাফিয়ে ওঠার ভঙ্গিতে বলে, "একদম ঠিক কথা, তুমি ভাবতে পারবে না। কতদিন খুব মন খারাপ করে ঘুরতে ঘুরতে হয়তো তাঁর কাছে গেছি, উনি হয়তো কোন কাজ করছিলেন, আশেপাশে পাঁচজন বসে আছে। জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেয়া ডাক্তারসাব খাস কুছ হ্যায়!' কিন্তু আমার মাথা নাড়া দেখেই বুঝতে পারলেন, আমার মন ভাল নেই। পাঁচজনকে বলে দিলেন, তোমরা এখন যাও আমি ডাক্তারসাবের সঙ্গে কথা বলব।"

তারপর আগ্রহী সোমার দিকে তাকিয়ে বলে, "সে তুমি ভাবতে পারবে না, ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলেছি, কোন বিরক্তি নেই, মনটা কখন শান্ত হয়ে গেছে বুঝতেই পারিনি। এমনকি তাঁর সঙ্গে নানা বিষয়ে তর্ক করতে করতে মনটা বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। খুব বড় তত্ত্ব কথা নয়, এই ছোট ছোট গল্প করে বলার মধ্যে দিয়ে উনি এমন চমৎকার সব টীকা-ভাষ্য দিতেন, শুনে আমি অবাক হয়ে যেতাম। সেসব তাঁর নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে ছেঁকে বার করা।"

সোমাও দীর্ঘশ্বাস ফেলে!

অভী আনমনা হয়ে যোগ করে, "এসব তাঁর সঙ্গে দূর-দূরান্তে মিটিং করতে গিয়েও হত। জঙ্গলের মাঝখানে হয়তো গাড়ি থামিয়ে আমাদের ছত্তিশগড়ের গাছ চেনাতেন, পরিবেশ নিয়ে নানা কথা বলতেন। নানা জিনিস গড়ে তোলার পরিকল্পনায় তাঁর মাথাটা যেন ভরপুর হয়ে থাকত।"

অভীর ঘরে প্রতিদিনকার মত আবার সকাল হয়। সূর্যের আলো পড়ে সোমার ঘরে। বিছানা ঠিক করতে করতে অভীকে দেখে ঘড়ঘড়ে গলায় সোমা জিজ্ঞাসা করে, "আচ্ছা গৌতম কেমন আছে? ওর সঙ্গে তোমার কী এখনও যোগাযোগ আছে?"

অভী আগ্রহ নিয়ে তাকায়, "হঠাৎ এই নিষাদের দেশে গৌতমের কথা মনে হল তোমার!"

সোমা হাসে, "হ্যাঁ কাল হঠাৎই শুয়ে শুয়ে ওর কথা খুব মনে হচ্ছিল।"

তখন বাসি কাগজটা মুড়ে দিয়ে প্রায় স্বগতোক্তির মত অভী বলে ওঠে, "আমার লেফটেনেন্ট গৌতম, তোমার ভাই, বৃদ্ধ দ্রোণ —।"

সোমা ইনহেলারে শ্বাস টেনে কিছুক্ষণ দম ধরে থাকে, তারপর প্রশংসাসূচক মাথা নেড়ে বলে, "ও কিন্তু চমৎকার করত দ্রোণের রোলটা, সাত সমুদ্রের অন্ধকার বলতে বলতে যখন স্টেজে এসে দাঁড়াত তখন একেবারে মুগ্ধ হয়ে যেতাম।"

অভী সমর্থনের দৃষ্টিতে তাকায়, "হ্যাঁ, ও একটু ভাবুক গোছের আবার রোমান্টিকও — এক অদ্ভুত সমন্বয়। বাইরে থেকে কারো পক্ষে ওকে বোঝা মুশকিল। এই তো কয়েক বছর আগে ওর সঙ্গে একদিন হঠাৎ শেয়ালদা স্টেশনে দেখা, ওর তাড়া ছিল; কিন্তু আমাকে ছাড়তেও পারছে না। তারপর আমরা দু'জনে ভাঁড়ে চা নিয়ে আড্ডা দিতে বসে পড়লুম, ঝাড়া দেড়ঘণ্টা। অনেক কথা!"

তারপর একটা কথা বলার জন্য অভী যেন বিশেষ একটা প্রস্তুতি নেয়, হঠাৎ করে চুপ করে যায়, গলার স্বর নামিয়ে বলে, "তার মধ্যে একটা কথা তোমার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। যতই হোক তোমার ভাই তো।"

সোমা হাসে, "কী রকম?" তারপর মুখ মুছে চা করার জন্য রান্নাঘরে যায়।

অভী দাঁত মাজতে মাজতে তার পিছু নেয়, "ওকে জিজ্ঞাসা করলাম, কী রে বিয়ে করবি না, বয়েস হচ্ছে তো। ও হেঁয়ালি করে, একথা সে কথা বলে প্রসঙ্গ এড়িয়ে যায়। আমি তখন চেপে ধরলাম, এতদিনে কোন মেয়েকে তোর ভাল লাগেনি? ওর সেই অর্থপূর্ণ হাসিটা হেসে ও বলল, কী জানি মানুষ দেখি না তো! আমি প্রায় চমকে উঠলাম, কী বলছিস, মেয়েরা মানুষ নয়। ও তখন প্রায় মুখ কাঁচুমাচু করে বলে, না আমি তা বলছি না।"

সোমা তার গায়ের চাদরটা ঠিক করে অভীর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে কপট রাগের ভঙ্গি দেখিয়ে বলে, "গৌতম এইসব কথা বলেছে, ওর ঠিকানাটা দিও তো।"

অভী হাসে, মুখ ধোওয়ার জন্য সময় চেয়ে নিয়ে বাইরে আসে। সোমা চা তৈরি করতে করতেই আরেকটা উনুনে রুটি সেঁকে ফেলে, আরশোলা তাড়ায়, দুধের প্যাকেট খোলে। চাঁদনীকে ইশারায় ডাকে।

জানলা দিয়ে যেটুকু আলো এই জগতে ঢুকে পড়েছে তাতে স্পষ্ট দেখা যায় এরই মধ্যে চাঁদনীর সাহায্যে সোমা এ ঘরটির সংস্কার করে ফেলেছে।

অভী ফিরে সোমার মুখের কাছে গলা খাটো করে নাটকীয় ভঙ্গিতে বলে, "এসব অত্যন্ত গোপন বিষয়, এ ব্যাপারে তুমি গৌতমকে কিছু বললে হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গা হয়ে যাবে।"

সোমা হেসে ওঠে, "না আমি কিছু বলব না। ওকে আমি চিনি, ওর মনে কোন পাপ নেই। সুতরাং ও যা বলবে তা ব্যথা পেয়েই বলবে।"

অভী আবৃত্তির সুরে বলে ওঠে, "দণ্ডিতের সাথে দণ্ডদাতা —।"

সোমা হাতের কাজ সারতে সারতে বলে চলে, "তাই গৌতমের কথাগুলোই ভাবছি, যত বয়স বাড়ছে তত দেখছি তত এইসব নিয়ে ভাবছি।"

তারপর উনুনের চাবি বন্ধ করতে করতে বলে, "তবে একটা কথা তোমায় বলছি, মেয়েরা যদি এতদিনে মানুষ না হয়ে থাকে তাহলে জেনো তার জন্য দায়ী সংসার নামক এই পেষণ যন্ত্রটি। সংসারই মেয়েদের নিংড়ে নেয়, শেষ করে দেয়। অথচ সংসার না করলেও চলে না। বিশেষত বাচ্চা থাকলে মায়েদের অন্য কোন কিছু করার ভাবার সুযোগই থাকে না। বাচ্চাটি ছেলে হলে এক ধরনের সমস্যা আবার মেয়ে হলে আর এক ধরনের সমস্যা। কিছুই আগাম বোঝা যায় না। এক একজন এক এক রকমের। খুব কম মহিলাকে আমি দেখেছি, এইরকম সংসার সামলে বাইরের কাজ, নিজের পেশার কাজ বা তেমন কোন সামাজিক কাজে মন দিতে পেরেছে, ধরে রাখতে পেরেছে।"

অভী প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে, "যেমন আমি এখন অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করতে পারছি আমাদের এই ঘরের কী চমৎকার শ্রী ফিরে এসেছে। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও বলব—।"

অভী আরও কিছু বলতে চাইছিল, সোমা হাত নাড়ে, "এরপর তুমি কী উদাহরণ দেবে আমি জানি; তবু বলছি ওসব তোমাদের বইপড়া বিদ্যে, প্রতিদিনের জীবনে তা কিন্তু অচল। শুধু সাধারণভাবে একটা কথা বিচার করে বল, একটি মেয়ের পক্ষে ঘর সামলে বাইরে চাকরি সামলে তারপর তার দ্বারা আর কিছু করা সম্ভব? এরপর যখন তার একটু ফুরসৎ হল অর্থাৎ ছেলেমেয়ে বড় হল, তখন সে দেখল ততদিনে জগৎ-সংসার থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে অচল হয়ে পড়েছে, আর সংসার তাকে ততদিনে নিংড়ে ছিবড়ে করে দিয়েছে। ততদিনে সে তার মন ভরানোর জন্য প্রচলিত ভোগসুখের জগতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে, বলা উচিত আটকে পড়েছে।"

চেয়ারে বসে চা-এ একটা লম্বা চুমুক দিয়ে মুখে আয়েসের শব্দ করে অভী তাকে সমর্থন করে বলে, "আমি তোমার বিরুদ্ধে কথা বলছি না, তোমাকে সমর্থনই করছি, অবস্থাটা এইরকমই। তবু তারই মাঝে কিছু কিছু ব্যতিক্রম আমাদের চারপাশেই রয়েছে। যেমন চন্দনাদির জীবনটা ভাব, তুমি আমাদের ওখানে চন্দনাদিকে দেখেছো — **অহল্যা** পত্রিকাটা চালায়, আমার কপিগুলো তোমায় দিয়ে দেব, পড়ে দেখো। পারলে তুমি ওতে লিখো। আমার বিবেচনায় সে এক দুর্লভ মানুষ। এক অদ্ভুত গুণের সমন্বয় আছে তার মধ্যে।"

সোমা সায় দেয়, "হ্যাঁ মনে পড়েছে, অনেকটা মা'দের মত; কিন্তু এসব ক্ষেত্রে দেখবে এর পেছনে স্বামীর সাহায্য-সহযোগিতা বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।"

অভী অল্পক্ষণ কথাটা ভেবে নিয়ে মাথা নাড়িয়ে তার আপত্তি জানিয়ে বলে, "আমি ঠিক মানতে পারছি না। বহুক্ষেত্রে আমি দেখেছি স্বামী চাইলেও স্ত্রীরা পারছে না। আবার স্বামী না চাইলেও কোন মহিলা যদি মনে করেন তিনি কিছু করবেন তাহলে স্বামীর বাধা উপেক্ষা

করেও তিনি কিছু কাজ করতে পেরেছেন, এমন উদাহরণ বহু আছে। হেমন্তবালার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্রগুলো পড়ে দেখো; ঐ সময়েও যখন মেয়েরা প্রায় পর্দানশীন ছিল — ঐ অবস্থাতেও তারা কেউ কেউ শেকল ছেঁড়ার চেষ্টা করেছেন।”

সোমা কিছু বলতে যাচ্ছিল অভী হাত দিয়ে তাকে থামিয়ে বলে, “তবে নিশ্চয়ই তোমার কথা আমি মানি। ছেলেবেলা থেকে মেয়েদের মাথায় অতিমাত্রায় সংসারটা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, ফলে সংসারের মধ্যেই তারা মোক্ষ খোঁজে, সংসার নামক জগদ্দল পাথরে নিষ্ফল মাথা ঠুকে মরে। সংসারটাকে মাথা থেকে সরিয়ে দিয়ে দেখা উচিত তারা কী করতে পারে।”

সোমা ফ্ল্যাস্ক থেকে গরম জল দিয়ে ওষুধ খেয়ে হাসে, “অর্থাৎ কতখানি মানুষ হতে পারে!”

অভী যোগ করে,“আমি আরও কয়েকটা জিনিস ভাবি, এই যে ধর এত এত দম্পতিকে আমরা দেখি প্রতিদিন পুত্রকন্যা নিয়ে দিব্যি সুখে-দুঃখে ঘর-সংসার করে যাচ্ছে, এরা কী সত্যি একে অপরকে ভালবাসে? মানে প্রচলিত অর্থে আমরা যা বুঝি তা কী এদের মধ্যে আছে?”

সোমা চুপ করে আছে দেখে অভী আরও যোগ করে, “অর্থাৎ আমি বলতে চাইছি, আমাদের সমাজে বিয়ে করে ঘর-সংসার করার জন্য পাত্রী এখনও পর্যন্ত মা-বাবারাই দেখে শুনে ঠিক করে দেন। তারপর যখন এরা সংসার করতে শুরু করে তখন কী সত্যি এদের মধ্যে এই সম্পর্কটার কোন গভীরতা তৈরি হয়? না, তারা যন্ত্রের মত সংসার টেনে যায়। তা না হলে বলতে হয়, এদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কটা হচ্ছে নিছক একটা সামাজিক দায়িত্ববোধ।”

সোমা নড়েচড়ে বসে, তারপর দূরের দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে, “হ্যাঁ তোমার কথাটা আমিও ভাবি। আমাদের সহকর্মীদের মধ্যে যখন দেখি গয়না-কাপড়, পরনিন্দা-পরচর্চা ছাড়া নানা আলোচনা হয়, তখন শুনি, কিছুটা অনুমান করতে পারি। এইসব দেখেশুনে আমার মনে হয় এখনও আমাদের সমাজটা অনেক অনেক সামন্ততান্ত্রিক, এমনকি আমাদের পারস্পরিক সম্পর্কগুলোও।”

অভী মাথা নেড়ে তার কথায় সায় দেয়, সোমা বলে চলে, “তবে সব মিলিয়ে দেখেছি মেয়েদের মধ্যে এক অসম্ভব ভয় বলতে পার ভয়ার্ত অবস্থা প্রতিমুহূর্তে কাজ করে চলে। নিজে স্বাধীনভাবে যে কিছু ভাববে সে সুযোগ তার কোথায়? তুমি কী মনে কর, কোন মানুষ ভয়ার্ত হলে তার পক্ষে স্বাভাবিক ভালবাসার প্রকাশ দেখানো সম্ভব?”

অভী হাসে, “ব্রেভেটি ইজ দা সোল অব উইট।”

আহত বাঘিনীর দৃষ্টি নিয়ে সোমা তাকায়, “ঠাট্টা করছো?”

অভী হাত দুটো ওপরে তুলে দাঁত দিয়ে জিভ কেটে মাথা নাড়ায়।

সোমা কী বোঝে তা বোঝা যায় না; কিন্তু সে তার মত করে বলে যায়, “ছেলেবেলায় একদিকে বাবা-মা’র অতি কড়া শাসন। আবার একটু স্বাধীনভাবে কিছু করতে গেলে বা মেলামেশা করতে হলে অঘটনের ভয়। সে কোথায় যাবে! শান্তিতে সে রাস্তায় চলাফেরা

পর্যন্ত করতে পারে না, কারো কাছে গিয়ে দুদণ্ড মন খুলে আড্ডা দেওয়ার অধিকার তার নেই। তার বা অন্যদের সমস্যাগুলো নিয়ে আলাপ-আলোচনা পর্যন্ত সে করতে পারে না।"

অভী হাসে, "নিজেকে বাঁচানোর জন্য তার সব সময় একটা পাহারাদার লাগে।"

সোমা জোর দিয়ে বলে, "অবশ্যই, এই জন্য বাড়ির লোকজনের একটা সর্বক্ষণ দুশ্চিন্তা থাকে, কারণ কোন একটা অঘটন ঘটলে তার ফল তাকে সারাজীবন টানতে হবে। এত ভয় নিয়ে মানুষ নতুন কিছু ভাবতে পারে, না করতে পারে। কিছু যান্ত্রিক কাজকর্ম ছাড়া এত ভয় নিয়ে কিছু করা তোমাদের পক্ষেই সম্ভব হত?"

চাঁদনী এসে তার কাছে কিছু জানতে চায়, সোমা ইশারায় তাকে কী সব বোঝায়, চাঁদনী চলে যায়। অভী অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। মেয়েরা মেয়েদের ভাষা কত চমৎকার বোঝে।

তারপর উৎসুক অভীর দিকে তাকিয়ে সোমা হাসে, "এখানে এসে একটা কাজ করলাম। ও ঋতুমতী হয়েছে, এই ব্যাপারটা বহু কষ্টে দুদিন ধরে লড়াই করে ওকে বোঝালাম।"

তারপর আগের কথার সূত্র ধরে সোমা বলতে শুরু করে, "আবার বিয়ে হবার পর শুরু হয় স্বামীর জ্বালাতন। তার সঙ্গে যদি তুমি মানিয়ে নিতেপারলে ভাল, নইলে অবস্থা দুর্বিষহ। আমাদের এক একজন সহকর্মীর কাছে শুনি তো তাদের কী জ্বালাতন সহ্য করতে হয়। বল, কেন এই জ্বালাতন আমি সহ্য করব। সংসার কোন্ জায়গায় আমাকে ছাড় দেয়? তোমরা অনেক ছাড় পাও। মানি, এখন গৃহবধূদের অবস্থা তুলনায় অনেক ভাল; কিন্তু যে মেয়েদের ঘর বার দুটো সামলাতে হয় তাদের অবস্থা এখনও বেশ খারাপ!"

অভী প্রায় মন্ত্রমুগ্ধের মত সোমাকে দেখছিল আর শুনছিল।

সোমা যেন একটু দম নেয়, তারপর একজন চমৎকার শ্রোতা পেয়ে বলার উৎসাহটা যেন তার বেড়ে যায়, "যেমন আমার কথা ধর। আমি তোমাকে বলছি, আমার বিয়ে করার সামান্যতম ইচ্ছা ছিল না, বলতে পার তা আমার অসুবিধার কথা মনে রেখেই। কিন্তু অনেক ভাবনা-চিন্তা করে দেখলাম, বিয়ে না করলে এখানে আমার পক্ষে টেকা মুশকিল হবে।"

অভী মাথা নাড়ে, "এ বাড়াবাড়ি হচ্ছে।"

সোমা নিশ্চিত হয়ে বলে, "আমি যা বলছি তুমি শোন। বেশ তোমায় একটা খবর জানাচ্ছি, এটা তুমি নিশ্চয়ই জানো না। উনবিংশ শতাব্দীতে ফরাসি, জার্মান ছাড়া অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাইভেটেও মেয়েদের পড়াশোনা করার অনুমতি দেওয়া হত না। তাই রাশিয়া, পূর্ব-ইউরোপের মেয়েরা বিদেশে পড়তে যাবার জন্য তেমন পুরুষের সঙ্গে একটা নকল বিয়ে করে পড়তে যেত। তারপর ওখানে থিতু হয়ে ঐ পুরুষের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখত না।"

অভী হাঁ করে শোনে।

সোমা অভীকে জয় করার ভঙ্গিতে বলে যায়, "বেশি নয় আমরা মাত্র একশ' বছর পিছিয়ে আছি। তাই আমি জানতাম, অন্তত বিবাহিত হলে আমার পেছনে লেগে কেউ জীবন

অতিষ্ঠ করবে না। কিন্তু যখনই কেউ দেখবে আমি একা আছি, আমার পুরুষ সহকর্মীরাই কেউ কেউ উৎপাত শুরু করে দেবে, যেন আমি একটা ফাউ, উপরিপাওনা। আমি যদি এই অবস্থাটা থেকে নিষ্কৃতি পেতাম, তাহলে আমি বিয়েই করতাম না, যে সুবিধাটা তুমি ছেলে হয়ে পাচ্ছো। আমি হয়তো অনেক কাজ করতে পারতাম। কিন্তু আমি জানি, সারাজীবন এইভাবে আমার পক্ষে কাটানো অসম্ভব।''

অভী অবাক হয়ে তাকায়, ''এতটা খারাপ অবস্থা বলছো?''

সোমা দৃঢ় কণ্ঠে বলে, ''হ্যাঁ এতটাই খারাপ অবস্থা। তারপর প্রদীপ প্রথম প্রথম খুব চেষ্টা করেছিল ওর বাড়ির সঙ্গে আমাকে মানিয়ে চলার; কিন্তু যখন দেখল হচ্ছে না, তখন হাল ছেড়ে দিল। আমরা আলাদা বাসা ভাড়া করেছিলাম, এখন কোয়ার্টারে আছি, ভবিষ্যতে হয়তো একটা ফ্ল্যাট কিনে নেব।''

অভী শুধায়, ''প্রদীপ ছেলে কেমন?''

সোমা হাসে, 'প্রদীপ মানুষটা ভাল, আর নরম স্বভাবের বলে আমার ওপর কোন চাপ দেয়নি। অন্য কোন পুরুষ হলে ব্যাপারটা হয়তো এত সহজে ছাড়তো না। ভেবে দেখ এখানেও আমাকে হিসাব কষতে হয়েছে। খুব জ্ঞানবান-বুদ্ধিমান স্বামী হলে আমিই উপকৃত হতাম। কারণ যে জ্ঞান আহরণ করা সাত জন্ম আমার ক্ষমতার বাইরে, তার ছিটেফোঁটার ভাগও তার কাছে থেকে আমি পেতাম। বলতে পার যেটা এখন তোমাকে দেখে হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি।''

অভী তাকে থামায়, ''দাঁড়াও দাঁড়াও, এর মধ্যে বিপদও আছে। আমি এই কথাই ভাবছিলাম। যেমন ধর আমি যা বলে যাচ্ছি তা আমার ঠিক মনে হচ্ছে তাই বলে যাচ্ছি। তুমি এসব শুনছো আর বিশ্বাস করছ কারণ এসব যাচাই করা তোমার পক্ষে হয়তো অসম্ভব।''

সোমা হাত নেড়ে যোগ করে, ''ক্ষমতাও নেই।''

অভী মাথা নাড়ে, ''যাই হোক, তুমি এসব বিশ্বাস করছ মানুষটাকে দেখে অর্থাৎ মানুষটার কথাগুলোতে তুমি সন্তুষ্ট। কিন্তু মানুষটা যদি ভুল বলে যায় তাহলে সে ভুল কিন্তু সারাজীবন তুমি শিখে রইলে। ঐজন্য মুরশিদরা ভাল পীর-পয়গম্বর খোঁজে, অন্তত যাঁর টীকা-ভাষ্যে ভুল কম থাকবে। ঐ শিব্রামের ভাষায় সুপারম্যানিয়া।''

সোমা হাত নাড়ে, ''তুমি থামো, ওসব করতে হলে ঠক বাছতে গাঁ উজাড় হবে, সবই তো সেই গঙ্গারামের মত পাত্র।''

অভী হো হো করে হেসে উঠে বলে, ''তাহলে সেই ইনব্রিডিং হবে, নতুন কোন গুণ এর মধ্যে ঢুকবে না। সেই শিব্রামের ইতুর গল্পের মত, আমাদের ঘরে ঘরে বিয়ে হয়।''

সোমা হাত নেড়ে বলে, ''তাই হোক।''

একটু থেমে দম নিয়ে সে আবার বলতে শুরু করে, ''জানবে আমাদের মত মেয়েরা ভোগসুখ চাইলেও তারা এটাও চায়, যে মানুষকে সে মন থেকে গ্রহণ করবে সে মানুষটা যেন অনেক বড় মাপের হয়। ছেলেরা তো এমনিতেই বাইরে মেশে আর খেলাধুলা করে বলে

উদারমনের হয়, মেয়েদের মত এত সংকীর্ণমনা হয় না। কিন্তু জ্ঞানবান-বুদ্ধিমান তো সবাই হয় না।"

অভী অবাক হয়ে তাকায়, "এতসব হিসাবপত্র চলে নাকি?"

সোমা মুখে হুঁ হুঁ শব্দ করে বলে, "চলে চলে বাছাধন। এ ব্যাপারে মেয়েরা খুব হিসেবী। কিন্তু আমি খুব ভাল করে জানি, এমন কোন মানুষের চাহিদাও অনেক বেশি হবে, সেই চাহিদা আমি পূরণ করতে পারব না। সুতরাং আমার এই বিকলাঙ্গ অবস্থায় প্রদীপের মত প্রায় একজন জড়বুদ্ধিকে নিয়েই আমায় সারা জীবন সন্তুষ্ট থাকতে হবে। আবার টাকাপয়সার ব্যাপারে প্রদীপ প্রথম থেকেই চেয়েছিল একটা যৌথ খরচের ব্যাপার, আর ও সেটা কর্তৃত্ব করবে।"

অভী শব্দ করে হাসে।

সোমা তার দিকে তাকিয়ে চোখ বড় বড় করে বলে, "না ভাল অর্থেই বলছি। আমিও তাই চেয়েছি। ও মোড়লি করুক, সংসারে একজনকে মোড়লি করতেই হয়। তাছাড়া আমার ওসব ভালও লাগে না। কিন্তু দেখলাম, নানারকম সমস্যা তৈরি হচ্ছে। ও আমার প্রয়োজনটা বুঝছে না, আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে কোন গুরুত্ব দিচ্ছে না, আমাকে সামান্য ব্যাপারে হাত পাততে হচ্ছে — তখন বাধ্য হয়ে আমায় ব্যবস্থা নিতে হল।"

অভী প্রশ্ন করে, "কেন প্রদীপ বুঝল না বলে তোমার মনে হয়?"

সোমা হাসে, "অত গভীর জ্ঞানতত্ত্ব তোমায় বলতে পারব না। তবে আমার যেটা মনে হয় ও তো ছেলেবেলা থেকে ওর মা'কে দেখেছে বাবার কাছে কেঁচো হয়ে থাকতে। সুতরাং তারই প্রতিফলন এখানে ঘটবে, এটাই স্বাভাবিক।"

অভী জিজ্ঞাসা করে, "তাহলে এ তো এ প্রজন্মের সমস্যা!"

সোমা তার মতামতে অত্যন্ত দৃঢ়, "নিশ্চয়ই তাই, এটা পরের প্রজন্মে থাকবে না। কারণ আমাদের বাচ্চারা অনেকেই মা'কে বাইরে বেরিয়ে উপার্জন করতে দেখছে। যাক্ ছাড় এসব কথা।"

অভী উঠি উঠি করে।

সোমা তাকে থামায়, "দাঁড়াও এইটুকু বলে নিই। এখন তোমায় বলতে ইচ্ছে করছে পরে হয়তো এই মেজাজটা আর থাকবে না।"

অভী একটু লজ্জা পেয়ে বলে, "হ্যাঁ বল।"

"তারপর সংসারে আমাকে কতটুকু ভার বহন করতে হবে এটা আমরা দু'জনে মিলে ঠিক করে নিলাম, এরপর থেকে তাই চলছে। ও মেনে নিয়েছে, বলা যায় মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। হয়তো ও নরম স্বভাবের বলে মেনেছে, অন্য রকমের হলে এই নিয়ে চূড়ান্ত অশান্তি করত। আমাদের সহকর্মীদের কাছে শুনি, এইসব সম্পত্তি আর টাকাপয়সা নিয়ে সংসারে কী কুৎসিত রকমের ঝগড়া হয়।"

অভী হেসে তাকায়, "তখন এদের একেবারে গেছো মনে হয় নিশ্চয়ই।"

সোমা বলে যায়, "আবার যখন দেখি একের প্রয়োজনে অন্যে ঝাঁপিয়ে পড়ছে তখন অবাক হয়ে যাই! ঠিক ঐ গেছো দাদা গেছো বৌদির মত, তখনই লাথালাথি করছে, দাঁত খেঁচাচ্ছে। আবার তারপরেই একে অপরের গা চাটছে, উকুন বাছছে।"

অভী সোমার কথা শুনে হেসে ওঠে, " বলা যায়, মিলনপিয়াসী অতিসাবধানী দুই শজারু। তাহলে প্রবৃত্তি আর নিবৃত্তির খেলাটায় ওরা বিশেষজ্ঞ বল।"

সোমা গা ঝাড়া দিয়ে বলে ওঠে, "বলতে পারো, এও তোমার ভাষায় নিওটেনি — প্রয়োজনের সম্পর্ক, নির্ভরতার সম্পর্ক, দায়িত্ববোধের সম্পর্ক, স্বত্ব বলতে পার সম্পত্তির সম্পর্ক, ভয় তাড়ানোর সম্পর্ক এইসব।"

তারপর একটু অন্যমনস্ক হয়ে দূরের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, "তবে অন্যরকম কী কিছু দেখিনি! দেখিছি বইকি! তখন মনটা ভরে উঠেছে। আমাদের এক পুরুষ সহকর্মী আছে, তার স্ত্রী নিছক গৃহবধূ; কিন্তু বরকে সন্দেহ করে। ভদ্রলোক এত ভাল, তোমরা কল্পনাও করতে পারবে না। মাঝে মাঝে ভদ্রমহিলা আত্মহত্যা করতে যায়, তখন ছেলেপিলে নিয়ে সংসারে এক জেরবার অবস্থা। কিন্তু ভদ্রলোক যেন মাথায় বরফ চাপিয়ে সব কাজ করে যান। আর একজন মহিলা আছে সে যা শ্বশুর-শাশুড়ির সেবা করে তা আজকালকার দিনের মেয়েদের ধর্ম নয়। আমি বলি, তুমি কর কী করে? সে হাসিমুখে উত্তর দেয়, কী করব বল আমার বাবা-মা হলেও তো করতে হত। সত্যি বলছি অভী, নিজেরা পারি না; কিন্তু এইসব মানুষদের এমন মন আছে জানলে মনটা ভরে যায়, পৃথিবীটাকে তখন সুন্দর মনে হয়।"

অভী উঠে দাঁড়িয়ে সোমাকে প্রশংসা করে বলে, "দারুণ দারুণ! এই মুহূর্তে তোমাকে দু'হাত দিয়ে তুলে ধরতে ইচ্ছা করছে!"

তারপর সোমার রাঙা মুখটার দিকে তাকিয়ে বলে, "তুমি একেবারে আমার মনের কথা বলেছো। মানুষের হিংসা দেখলে মনে হয় এটাও আমাদের মধ্যে আছে। আবার মহত্ত্ব দেখলে মনে হয় এটাও তো আমাদের মধ্যে আছে। তখন মনে হয় হাজার বছর লাগুক; কিন্তু পরিশেষে ঠিক এই মহত্ত্বেরই জয় হবে। সব মানুষ একদিন সম্পূর্ণ হয়ে উঠবে, কারণ এই গুণ নিশ্চয়ই কোন না কোনভাবে আমাদের অস্তিত্বের মধ্যে রয়েছে। একে বাইরে থেকে আমদানি করতে হবে না।"

তারপর হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে অভী চেয়ারে বসে পড়ে, যেন একটা কিছু ভাবে, তার যেন কিছু মনে পড়ে যায়, "একদিন কী হয়েছে জানো, হঠাৎ সকালবেলায় দেখি আকাশটা কালো আঁধার হয়ে এল। এমন আঁধার যেন মনে হল রাত্রি নেমে আসছে। এমন ঘন কালো মেঘে চারপাশ ছেয়ে ফেলা, আমি কখনো দেখেছি বলে মনে পড়ে না। ঐ যে চারপাশের ছোট ছোট নেড়া দল্লী-রাজহারা পাহাড়, তাদের থেকে মেঘকে তুমি তফাত করতে পারবে না। চারপাশে কেমন একটা থমথমে ভাব। আমার মনটা অমনি নেচে উঠল।"

অভী থেমে যেতেই সোমা অস্ফুট স্বরে বলে, "তারপর।"

অভী আস্তে আস্তে যোগ করে, "কিন্তু তখন সকালবেলা, সারাদিনে প্রচুর কাজ; তবু আমার কোন কাজ করার ইচ্ছা হচ্ছে না। মনে হচ্ছে চুপটি করে বসে, দু'চোখ ভরে প্রকৃতির এই অপূর্ব রূপ দেখি। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঝড়ের তাণ্ডব শুরু হবে, তারপর অঝোর ধারায় বৃষ্টি শুরু হবে। এমনিতে এটা খরার দেশ, আকাশ থেকে চারপাশে প্রাণ যেন গলে গলে পড়বে। কিন্তু সময়টা হচ্ছে সকাল আটটা, ঠিক সাড়ে আটটা থেকে অপারেশন শুরু করতে হবে। ছোট-বড় মিলিয়ে অন্ততপক্ষে আটটি কেস আছে, তার মধ্যে কয়েকটি খারাপ কেস।"

সোমা হাত নেড়ে অনুরোধ করে, "একটু ভাল করে বল, ভারি ভাল লাগছে তোমার মুখ থেকে শুনতে।"

অভী এবার উঠে দাঁড়ায়, "বালিকে তোমায় এখন গল্পে পেয়েছে, অবশ্য আমারও যে খারাপ লাগছে তা নিশ্চয়ই নয়। কিন্তু আমাকে এখন উঠতেই হবে নইলে তুমিই পরে নিজেকে অপরাধী মনে করবে। এ গল্প আমি তোমায় শোনাবই; কিন্তু ফিরে এসে।"

সোমা উঠে দাঁড়ায়, "বেশ বেশ তুমি স্নান করে এস, আমি একটু খাবার বানাই। তুমি আপত্তি করলেও আমি শুনব না, কারণ তোমার ফিরতে দুপুর গড়িয়ে যাবে।"

অভী তাকে আশীর্বাদ দেবার ভঙ্গিতে বলে ওঠে, "তথাস্তু!"

মা বলত, গল্পে গোয়াল মাটি। আজ একটু তাড়াতাড়ি হাসপাতালে যাওয়ার কথা, আর আজকেই দেরি হল। অভী রুটি চিবোয় আর বার বার হাতঘড়ি দেখে। হঠাৎ হুড়মুড় করে চাঁদনী ঘরে ঢুকে হাঁফাতে থাকে। বিছানায় বসে সোমা হকচকিয়ে যায়। অভী চুপ করে বসে দেখে। অল্পক্ষণের মধ্যেই বোঝা যায়, একটা বড় ধরনের প্রজাপতির পেছনে ধাওয়া করে চাঁদনী তাকে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে ফেলেছে।

সে বেচারি তাড়া খেয়ে সারা ঘরময় উড়ে বেড়াচ্ছে, আর চাঁদনী তাকে ধরে ফেলার জন্য ইতস্তত দাপাদাপি করে। অবশেষে সোমার হস্তক্ষেপে চাঁদনী নিরস্ত হয় এবং প্রজাপতিটি রক্ষা পায়।

অভী তার কাজ ভুলে চুপ করে বসে দেখে, প্রকৃতির এক অপরূপ সৌন্দর্যের নাগাল পাবার জন্য দুই নারীর ব্যস্ততা। তার মনে কত কথা অনর্গল ভেসে আসে। প্রজাপতিটাও ভারি সুন্দর, বেশ বড় ধরনের। ঠিক এই জাতের প্রজাপতি এখানে অভীর চোখে পড়েনি। যেমন তার পাখার বাহার তেমনি তার দেহের রঙের সৌন্দর্য।

সোমা হাসে, "কী ভাবনায় এমন তন্ময় হয়ে আছো?"

অভী সম্বিৎ ফিরে পায়, "হ্যাঁ তোমাদের দেখছি, একজন একে হাতে নেড়েচেড়ে বুঝতে চাইছে, আর অন্যজন দূর থেকে এর সৌন্দর্য উপভোগ করতে চাইছে।"

তখনও প্রজাপতিটা ওপরে গুটিয়ে রাখা মশারির ওপর চুপ করে বসে আছে। সোমা বলে, "আমরা খুশি হয়ে বলি, প্রজাপতির নির্বন্ধ।"

অভীর যেন সে কথায় মন নেই। সে কাছে গিয়ে সেটাকে একবার ভাল করে দেখে নেয়। তারপর মাথা নাড়িয়ে বলে, "আচ্ছা ওকে এই রূপ দেওয়ার পেছনে প্রকৃতির গূঢ় উদ্দেশ্য কী থাকতে পারে?"

সোমা অভীর খাবার থালাটা তুলে বলে, "রূপের বিচারটা তোমাদের, ওর রূপ নিয়ে প্রকৃতির কোন মাথাব্যথা নেই।"

অভী আবার মাথা নাড়ায়, "তা ঠিক, তবে কিনা পৃথিবী জুড়ে ওর রূপের খ্যাতি, তাহলে আমাদের মাথায় ওর রূপের কোন ভিত্তি আছে বল।"

সোমা যেন কিছু ভাবে, "তা নাও হতে পারে।"

অভীর এই নিয়ে তর্ক করার সময় নেই, "বেশ ধরে নিলাম এর বিউটি, নন্দনতত্ত্ব সব মানুষের রচনা। কিন্তু একে জানতে হলে তো কাটাছেঁড়া করতে হবে, তখন এর বিউটির জন্য আমার মন হাহাকার করে উঠবে না?"

সোমা অভীর ভাবনার গতিপ্রকৃতি আন্দাজ করে ম্লান হেসে বলে, "তা হলেও আমাকে মেনে নিতে হবে, আমার কান্নার, আমার হাহাকারের অনেক গভীরে হয়তো লুকিয়ে আছে অনেক ঐশ্বর্যশালী সত্য ভাবনা!"

অভী সোমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বলে, "তাহলে এক্ষেত্রে মন দুটি ভাগে ভাগ হয়ে যাবে। একজন সত্যকে খুঁজবে, অন্যজন সুন্দরকে উপভোগ করতে চাইবে।"

সোমা তার সঙ্গে হাত নাড়িয়ে যোগ করে, "একজন বার বার পরীক্ষানিরীক্ষা করে তার ফলের মধ্যে সত্যকে ধরার চেষ্টা করবে। অন্যজন নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে একে নানারূপে সৃষ্টি করবে, রচনা করবে।"

অভী 'গুড গার্ল' বলে লাফিয়ে ওঠে, "কিন্তু আমি কোথায় সমর্পণ করব তা নিয়ে ধাঁধায় পড়ে গেছি — নিতাই-গোকুল, গোকুল-নিতাই, ট্রুথ-বিউটি, বিউটি-ট্রুথ।" এসব বলে শরীর দুলিয়ে প্রায় নেচে ওঠে।

সোমা হাতে তালি দিয়ে প্রজাপতিটাকে বাইরে বার করতে চেয়ে বলে ওঠে, "তোমার মাথার ব্যামো হইয়াছে।"

অভী হাসতে হাসতে বেরিয়ে যায়। চাঁদনী হাঁ করে বাঈকে তাকিয়ে দেখে।

দুপুরে হাসপাতাল থেকে ফিরবার পথে অভী দেখে তাদের ঘরের সামনের ছোট ছোট গাছগুলোয় সোমা রাবারের নলটা ঘরের চৌবাচ্চায় লাগিয়ে জলদান করছে। এই দৃশ্য দেখে অভীর মনে যেন একটা হিল্লোল বয়ে যায়।

একটা বইয়ে দেখা ছবি যেন দ্রুত তার চোখের সামনে কেউ টাঙ্গিয়ে দেয়। সোমা যত্ন করে ওদের জল সিঞ্চিত করছে আর পাশে চাঁদনী বাঈ ফরমাশ খেটে তাকে সাহায্য করছে।

অভী সন্তর্পণে পিছন দিয়ে ঘরে ঢুকে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে সুর করে বলে চলে, "তাহাদের জল না করি দান যে আগে জল না করিত পান ...।"

সোমা তার দিকে মুখ ঘুরিয়ে হাসি মুখে তাকায়।

অভী তখন শাসনের ভঙ্গিতে বলে, "কিন্তু বালিকে এইসব ঠাণ্ডা জল ঘেঁটে এক্ষুনি তোমার শ্বাসকষ্ট শুরু হবে। তখন আমি অপরাধী হয়ে যাব।"

সোমা সঙ্কুচিত হয়ে বলে, "আমি আর কী করছি, ওই সব করছে।"

অভী তাকে গল্পের লোভ দেখিয়ে বলে, "বেশ হয়েছে, এবার তুমি ঘরে এস, তোমায় নিয়োগীজীর লাগানো বকুল গাছের গল্প শোনাচ্ছি।"

খেতে খেতে অভী খাদ্যরসিক নিয়োগীজীর গল্প শোনায়, ঝিঙে পোস্ত, মোচার ঘণ্ট, থোড়ের তরকারি, সরষে দিয়ে মাছের পাতলা ঝোল —।

শুনতে শুনতে সোমা বলে, "একেবারে ভেতো বাঙালি।" অভী সায় দেয়, "হ্যাঁ, তবে সবটা তা নয়, বিভিন্ন জায়গা থেকে রান্না শিখে আসতেন, আর কোন সময় কাজের চাপ না থাকলে সবাই মিলে হৈ হৈ করে সেইসব রেঁধে খাওয়াতেন।"

সোমা খাওয়া শেষ করে বলে, "আসলে মানুষটা খুব প্রাণবন্ত আর উচ্ছল ছিলেন।"

অভী কী একটা কথা চিন্তা করতে করতে বলে ওঠে, "নিয়োগীজী যে নিজে সংসার দেখতে পারতেন না, এই নিয়ে তাঁর মনের মধ্যে একটা বেদনা ছিল। তিনটি ছেলেমেয়ে নিয়ে আশোজীর সত্যি খুব কষ্ট হত। কিন্তু তাঁদের শিক্ষাই হচ্ছে নিজেদের কষ্টের কথা অন্যকে না বলা। তাই আমাদের ভাবতে হত। আমরা করতাম কী, মাঝে মাঝে 'ভৌজি' 'ভৌজি' ডেকে গিয়ে দেখতাম, কোথায় কী সমস্যা হচ্ছে!"

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে অভী বলে, "এইরকম অবস্থায় থেকে বোধহয় আমাদের পার্টি কমরেডদের নৈতিক অধঃপতন হয়, যা এখানে নিয়োগীজী কঠোর সংগ্রাম করে ঠেকিয়েছিলেন।"

সোমা সায় দেয়, "হবে না বা কেন, তারাও তো মানুষ। তাদের ছেলেমেয়েরা বড় হয়, বাবা-মায়ের ক্ষমতা দেখে। এটা ওটা চায়, সংসারকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য কমরেড তখন ক্ষমতার অপব্যবহার করে।"

অভী যোগ করে, "সেই কমরেড সাচ্চা মানুষ হলে অল্পেই নিজেকে সামলে নেয়, নইলে অপকর্মের তালিকা বাড়তে থাকে।"

সোমা হেসে ওঠে, "আর ঐসবই হয় পার্টির নামে, আমি কী আর কিছু করছি, যা করছি পার্টির জন্যই করছি।"

অভী খুব দৃঢ়ভাবে বলে, "এসব ব্যাপারে নিয়োগীজী যেন প্রথম থেকেই খুব সতর্ক ছিলেন।"

হাত ধুয়ে এসে অভী চেয়ারে বসে। সোমা ফিরেই অভীকে মনে করিয়ে দেয়, "আমায়

কিন্তু সেই সকালবেলার গল্প বলা বাকি আছে।''

অভী মাথা নাড়ে, হাত দিয়ে তাকে একটু থামায়, যেন দম নেয় তারপর নাটকের পাঠ বলার মত প্রস্তুতি নিয়ে, গলাটা কেশে পরিষ্কার করে বলতে শুরু করে, ''ওদিকে হাসপাতালের কাজ আমায় আয় আয় করে ডাকছে; কিন্তু আমার পুলকব্যাকুল মন সেই মুহূর্তে চাইছে — সকালের প্রকৃতির এই মোহিনী রূপের ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তনটুকু প্রাণ ভরে দেখি। বাঞ্ছিত বিপুল তরঙ্গের আসন্ন আবির্ভাবের বার্তা যেন আর সব প্রয়োজনকে ঢেকে ফেলেছে। তোমাদের সাহিত্যের ভাষায় বলতে হলে তখন আমার চিত্তাকাশে ভাবনার স্বর্ণ মুকুলগুলি যেন ঐ গম্ভীর মেঘাস্তরণের তলে ধীরে ধীরে জেগে উঠছিল। কারণ প্রকৃতি তো ক্ষণে ক্ষণে বা নিত্যনতুন এমন আনন্দরূপ সৃষ্টি করে না। অন্তত আমার এই হৃদয়ের সুপ্ত সুর গভীর আনন্দে বেজে ওঠে না। আমার এই সর্বগ্রাসী বিস্মৃত স্রোতের ওপর প্রকৃতির এই ক্ষণিকের দান আজ আমি মর্মে স্পর্শে গ্রহণ করব। প্রকৃতির এই খেয়ালের স্রোত আমার চোখের সামনে কয়েক নিমেষের জন্য এসে দাঁড়িয়েছে।''

সোমা গুণমুগ্ধ হয়ে তাকায়, ''খেয়ালের স্রোত, বাব্বা তুমি এত ভাষা শিখলে কোথা থেকে তাই ভাবছি!''

অভী হাসে, ''দাঁড়াও বেগ এসেছে এখন কোন মন্তব্য নয়।''

সোমা ঠোঁটে আঙ্গুল দিয়ে নীরবতার ভঙ্গি করে।

অভী বলে চলে, ''আর হয়তো কোনদিনই দেখতে পাবো না। আর চারপাশের অবস্থাটাও এমন দ্রুত পাল্টাচ্ছিল যে প্রায় ছেলেমানুষের মত সব কিছু ভুলে হাঁ করে তাকিয়ে আছি। অন্য ডাক্তাররা তৈরি হয়ে বেরুচ্ছে। তারা সাধারণত আমাকে এমন দেখতে অভ্যস্ত নয় তাই তাদেরও জিজ্ঞাসা, কী এখনো তৈরি হওনি! আমি প্রায় অপরাধীর মত তাকিয়ে হাসলাম। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার টনক নড়ল, এটা একটা চরম দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় হবে। কারণ যে কর্মীদের আমিই দায়িত্বজ্ঞানহীনতার জন্য বকুনি দি-ই তারা সবাই প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করবে। সুতরাং এবারকার মত একটা পরম প্রাপ্তি আমার জীবন থেকে হারিয়ে গেল। রাগ হচ্ছিল নিজের ওপর, এইটুকু স্বাধীনতা উপভোগ করার ক্ষমতাও আমার নেই।''

সোমা বিছানায় আধশোয়া হয়ে গালে হাত দিয়ে সম্মোহিতের মত শুনে যায়।

অভী বলে চলে, ''তারপর আর কী, ঠাণ্ডা মাথায় যখন ভাবলাম তখন সেই পুলকবেদন অবস্থায় মনে পড়ল। একদিন রামকৃষ্ণদা হাতিবাগানের চেতনার পাঠশালায় আমাদের সামনে বসে বুঝিয়েছিলেন, এঙ্গেলসের 'ফ্রিডম ইজ দা রেকগনিশন অব নেসেসিটি' এই কথাটা। অর্থাৎ কেমন করে মানুষ তার কাজে আর ভাবনায় সম্পূর্ণ হতে পারে। মনে হয়, এই ধরনের একটা অবস্থা বোধহয় আমাদের সকলের জীবনে চিরকালীন সত্যি হয়ে সামনে এসে দাঁড়ায়। যেমন ধর এই সকাল থেকে প্রকৃতির তাণ্ডব শুরু হয়ে গেল, এর জন্য কত মানুষ কাজে পৌঁছাতে পারবে না। তারা হয়তো দিনমজুরি করে সংসার চালায়, কত শিশু হাসপাতালে না

পৌঁছাতে পারার জন্য মারা যাবে। আর আমি বসে বসে প্রকৃতির এই হৃদয়হরণকারী রূপ উপভোগ করব, এর জন্য আমার এতটুকু গ্লানিবোধ হবে না! এইসব সাতপাঁচ না ভাবলে ব্যাপারটা মোটের ওপর ঠিকই আছে। কিন্তু আমি যখনই ভাবি, আলোর মত এ গ্রহ থেকে অন্য গ্রহে ছুটে চলে যাবো তখন কে যেন আমার মাথায় করাঘাত করে জানিয়ে দেয়, তোমার এই আলোর উৎস যে মানুষ এটা কখনো ভুলে যেও না, মানুষ ছাড়া তোমার এই আলোর জ্যোতি আসবে কোথা থেকে!"

আগ্রহী শ্রোতাকে আরও চমকে দেবার জন্য অভী যেন আজ কথকের ভূমিকা নিয়েছে। হঠাৎ উঠে কিছুক্ষণ ঘরের মধ্যে পায়চারি করে আবার এসে বসে।

"এই ফিলিংসটা ঠিক কী আমি জানি না; কিন্তু অন্য একটা ঘটনা তোমায় বলছি যাতে আমার মন কেমন আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। একদিন রাত্রি তখন একটা, হাসপাতাল থেকে ডাক এল। দেখি একটা দেড় বছরের ছেলের ঘাড় শক্ত হয়ে গেছে। ছেলেটি যেমন সুন্দর তেমনি ওর মায়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। ওরা মুসলমান, ছেলেটি প্রথম সন্তান। আমার দেখে মনে হল, এর মেনিনজাইটিস হতে পারে; কিন্তু লাম্বার পাংচার না করে নিশ্চিত হতে পারছি না। আমাদের একজন ভাল টেকনিশিয়ান আছে, সে একটু দূরে থাকে। তাকে ডেকে পাঠালাম, ও সঙ্গে সঙ্গে চলে এল। মাইক্রোস্কোপে দেখলাম মেনিনজাইটিস, সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা শুরু হল। সকালে এসে দেখি মা ঘুমিয়ে পড়েছে বাচ্চাটি বিছানায় বসে খেলছে। এইরকম অসংখ্য ঘটনা আমার জীবনে ঘটেছে তাতে যা আনন্দ পেয়েছি, তা আমার সব পাওয়ার চেয়ে বড় পাওয়া।"

সোমা অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে, "এইবার যেন আমি একজন শিল্পীকে স্পষ্ট চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি যিনি ছেনি হাতুড়ি দিয়ে পৃথিবীকে গড়ছেন।"

অভী হাসে, "এ সত্য সকলই, তোমায় কী বলব, বিজ্ঞানসম্মত ভালবাসা ব্যাপারটা ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি; কিন্তু সেটা কী জিনিস এখন কাজ করতে গিয়ে বুঝতে পারি। আর আমাদের কাছে ঠিক এই ভালবাসা পাবার পর মানুষ যে কী পরিমাণ কৃতজ্ঞ হয়, তার সেই হাসি দেখে আমার যেন স্বর্গীয় সুখ হয়। তখন মনে হয় এইটুকু পাবার জন্যই বোধহয় বেঁচে থাকার অসংখ্য গ্লানি, কষ্ট নির্দ্বিধায় সহ্য করা যায়।"

সোমা হাসিমুখে তাকায়, "তোমার এই একা একা আনন্দ উপভোগ করা দেখে আমার খুব হিংসে হচ্ছে। মনে হচ্ছে, কেন আমি এই আনন্দ থেকে বঞ্চিত হলাম। অথচ তার আর কোন উপায় নেই। চাইলে তো আমরা কেউ আর একটা জীবন নতুন করে শুরু করতে পারি না।"

তারপর অভীর দীর্ঘশ্বাসের মধ্যেই সোমা বলে চলে, "তোমরা কত ভাল আছো। আমার তো মাঝে মাঝে জীবনটাকে এত কালো মনে হয়, যেন মনে হয় কোন অন্ধকূপে পড়ে থেকে শুধু শুধু এটাকে টেনে নিয়ে চলেছি। বই পড়ি, ভাল বই, তখন খানিকটা সান্ত্বনা পাই, মাঝে

মাঝে বেরিয়েও পড়ি; কিন্তু সব সাময়িক। মানুষের উষ্ণ সান্নিধ্যের সুখ যেন কোন কিছু দিয়ে মেটে না।"

সোমার বিষণ্ণ ভাব দেখে অভী যেন প্রসঙ্গটা পাল্টাবার চেষ্টা করে, "সোমা, এইরকম টানাপোড়েন বোধহয় আমাদের অনেকের জীবনে নিত্যসঙ্গী। একদিকে তাৎক্ষণিক বা বলতে পার সংসারের দৈনন্দিন আশু অভাববোধের অধীরতা, অন্যদিকে যেন নিরন্তর চার্চের ঘণ্টার মত বেজে চলা নিত্য সত্যের আবেদন অনুভব করে অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হওয়া। তাই মাঝে মাঝে ভাবি, এইসবের ভারসাম্যের মধ্যে জীবনটাকে পূর্ণ করতে পারি না তো! কোথাও যেন পূর্ণতা প্রাপ্তির পথে একটা জগদ্দল পাথর বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।"

এইরকম বলতে বলতে হাতের তালুতে ঘুঁষি মেরে গলাটা খাটো করে বলে, "বন্দেগী জাঁহাপনা, যতই কল্পনার রঙ চড়াই, আমাদের ভালবাসা সম্পূর্ণ শ্রেণীনির্ভর এটা ঐ হরে রাম হরে কৃষ্ণের মত জপ করবে। আপন শ্রেণীর বাইরে আমরা একটা সর্ষে দানার থেকে বেশি পরিমাণে আমাদের ভালবাসার পূর্ণতা দান করতে পারি না।"

সোমা জিজ্ঞাসু চোখে তাকায়, "সবটুকুই কী তাই বলবে?"

অভী আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে বলে, "হ্যাঁ হ্যাঁ সবই তাই। মাঝে মাঝে ভাবি, মার্কস নামে যে মানুষটি নিজের জীবনে অর্থের কী সুখ তা ভোগ করলেন না; কিন্তু সারাজীবন ঐ অর্থের সঙ্গে লড়াই করে গেলেন।"

সোমা বিষণ্ণ চোখে তাকায়।

অভী তার মাথা নাড়িয়ে বলে, "জোর করে তুমি যদি অন্য কিছু করতে যাও তাহলে হয়তো তার ভার বইতে হবে জীবনভর — এক সম্পূর্ণ জীবনবোধ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তা পরম বাধা। সুতরাং এসো ওসব ঝামেলা এড়িয়ে আমরা আমাদের নিজেদের ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে কূপমণ্ডুক হয়ে ক্রমাগত ঘুরপাক খেয়ে চলি, আর তাই হয়ে দাঁড়াবে আমাদের জীবনচর্চার একমাত্র সত্য ও শাশ্বত বিষয়।" এই পর্যন্ত বলে সে চুপ করে যায়।

তারপর হঠাৎ নড়েচড়ে বসে বলতে শুরু করে, "অথচ ভাবো সমাজের কত অসংখ্য মানুষ তাদের দৈনন্দিন জীবনে কী অসম্ভব টানাপোড়েনের মধ্যে দিয়ে তাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আশা-আকাঙ্ক্ষা-স্বপ্ন নিয়ে কোন অপরূপ সৌধ গড়ে তুলছে, এর কতটুকু খবর আমরা রাখি! আর যদি সেটা দৈবাৎক্রমে দেখি, তাও সেটা হয় আমাদের মত অর্থাৎ আমরা যেন আমাদের মত করে তাদের দেখছি। ফলে তারাও তাদের যথার্থরূপে আমাদের সামনে হাজির হয় না।"

সোমা তাকে সমর্থন করে হাসে, "কী করে হবে, তারা তো পোকামাকড়ের মত। ওসব ছেড়ে তুমি মহিলাদের কথাই ধর। শিল্প-সাহিত্যে তাদের যে ভাবে চিত্রিত করা হয় তারা কী সত্যিই তাই! এমনকি মহিলা শিল্পীরাও যেন মনে হয় পুরুষদের চোখ দিয়ে আমাদের দেখে। কারণ পুরুষদের চোখটাই সমাজে চালু। সুতরাং তাকে সমাজে গণ্য হতে হলে অভিনব কোন সত্তার বিকাশ ঘটিয়ে সে হালে পানি পাবে না, তা বোঝে। তাই সে বাঁধা ছকেই হাঁটে। আর

তোমরা পুরুষরা যুগ যুগ ধরে আমাদের সামন্ততান্ত্রিক চোখে দেখে এসেছো।''

অভী হেসে প্রতিবাদ করে, ''না না, সবাই কী তাই।''

সোমা দৃপ্ত ভঙ্গিতে তাকিয়ে বলে, ''সব সব গো মহারাজ! কেউ কম আবার কেউ বেশি। আজ পর্যন্ত এমন কোন মানুষ আমার চোখে পড়েনি যিনি স্ত্রী-জাতির সমস্যাটা সঠিকভাবে উপলব্ধি করেছেন।''

অভী আপত্তি করে, ''এটা তুমি কী বলছো এ তো নারীবাদীদের মত কথা।''

সোমা তার মতামতে অনড়, ''সে যার মতই কথা হোক, যা সত্য তা না মানলেও সত্য। আমি কখনো বলছি না যে সমাজ-পরিবারে মেয়েদের বিশেষ কোন ভূমিকা নেই। সংসার গড়ে তোলা, সন্তান পালনের ব্যাপারটি এখনও অনেকখানি মেয়েদের ওপর রয়েছে। সে থাক্ তাতে আপত্তির কিছু নেই। সমাজেও তো আমরা মেনে নিয়েছি, যে কাজটা যে ভাল পারে যার দ্বারা যা হয় আমরা তাকে তাই দায়িত্ব দি-ই। কিন্তু তার জন্য তাকে সাহায্য না করলে সে কী করে এ কাজ করতে সক্ষম হবে।''

তারপর হঠাৎ বিছানার মধ্যে খাঁড়া হয়ে উঠে বসে সোমা যেন বিদ্রোহিণীর ভূমিকা তৈরি করে, ''দেখ তোমরা চাও সারাদিন ঘুরেফিরে যখন বাড়ি ফিরবে তখন তোমার সংসারটি তুমি ছবির মত হাতের কাছে পাবে। কোথাও কোন বিশৃঙ্খলা নেই, বেসুরো আওয়াজ নেই — সমস্ত এক চমৎকার ঐকতানে বেজে চলছে। আর তোমার যাবতীয় গার্হস্থ্য সুখ হাতের কাছে এসে যাচ্ছে। খুব ভাল কথা, আমরাও তাই চাই, সব ভাল জিনিসই সবাই চায়। কিন্তু এটা করবে কে? সারাদিন যদি হিসাব করে দেখ তাহলে এই সমস্ত কাজ করার জন্য একটি মানুষকে একেবারে পশুর মত পরিশ্রম করতে হয়। একজন মহিলা সংসারে তাই করে; কিন্তু তারপর সে আর মানুষ থাকে না। তুমি তোমার সৃষ্টিশীল চিত্তের উন্মাদনা দিয়ে তাকে স্পর্শ করতে চাইলে, মাছের আঁশটে গন্ধ বাচ্চার হাগু-হিসুর গন্ধ এইসব পাবে। তোমার সত্তার উদ্বোধনের প্রয়োজনে সে হবে একেবারেই বাসি, ভোঁতা, অকিঞ্চিৎকর ও সর্বোপরি অর্থহীন।''

অভী যেন প্রতিজ্ঞা করেছে সে কোন কথা না বলে সোমা যা বলে তাই শুনে যাবে। চিকিৎসা করার সময় রোগী যেমন তার কাছে এক নম্বর পাঠ্যপুস্তক হয়ে দাঁড়ায়, তেমনি আজ সোমা যেন তার কাছে জীবনের পাঠশালার একনম্বর পাঠ্যপুস্তক। তাই আজ অভীর যে কথাই মনে থাক্ না কেন তার তুলনায় সোমার নিজের জীবন দিয়ে বোঝা এই কথাগুলো অনেক অনেক দামী। কোন বই পড়ে বা কোন তত্ত্ব কথা পড়ে এই উপলব্ধি অভী কোনদিন করতে পারবে না। তাই অভী মনে মনে পরাজিত হয়েও জয়ী।

অভীকে চুপ করে থাকতে দেখে সোমা অল্পক্ষণ চুপ করে যায়।

তারপর নিজের আত্মবিশ্বাসে ভরপুর হয়ে ধীর গলায় বলে, ''তোমরা আমাদের কাছে কী চাও জানো, আমরা যেন মৌমাছি আর মাকড়সার একটা সংকর হয়ে তোমাদের সংসার ধরে থাকি। একদিকে তোমার আর সন্তান-সন্ততিদের জন্য সারা সংসার থেকে মধু আহরণ করে

মধুভাণ্ডে অমৃত ভরে রাখবো, মোম দিয়ে সংসারে সর্বক্ষণ আলো জ্বালিয়ে রাখবো আর মাকড়সার মত উত্তর-আধুনিক জ্যামিতি দিয়ে তোমাদের জন্য কল্পনার জাল বুনে দেব, যাতে চড়ে তোমরা বিহার করবে।"

মুগ্ধ দৃষ্টিতে অভী কিছুক্ষণ সোমার দিকে তাকিয়ে থাকে।

অভী অবাক হয়ে তাকায়, "কিন্তু নর-নারীর সম্পর্ক নিয়ে রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবি, তার সমস্তই মিথ্যা বা ভ্রান্তি বলবে!"

সোমা এতখানি একটানা বলে হাঁফিয়ে উঠেছে। তাছাড়া বলার পর নিজের মনে হয়েছে হয়তো একটু বাড়াবাড়ি করে ফেললাম, তাই খানিকটা যেন দমে যায়, চুপ করে থেকে বলে, "আবার সেই সুপারম্যানিয়া, বেশ তাই সত্য হোক তোমাদের চেনা পথই ভাল। তাতে অশান্তির ভয় নেই। ঐ পথেই হাঁটি তাহলে হয়তো হোঁচট কম খাবো।"

অভী আঙ্গুল তুলে আপত্তি করে, "না এ শুধু চেনা পথ নয়, এটা হাজার হাজার বছর ধরে আমাদের পূর্বসূরিদের অনেক পরিশ্রমে তৈরি করা ধ্রুপদী পথ, ঐতিহ্যমণ্ডিত পথ, ঐশ্বর্যে ভরপুর পথ। ঐসব মহাজ্ঞানীরা কেউ কেউ এর জন্য জীবনদান পর্যন্ত করেছেন। সুতরাং আমরা চাইলেই এ পথ আমাদের খেয়ালখুশি মত পরিত্যাগ করতে পারি না। যতই সুপারম্যানিয়া বল ঐ মহাজনের ঘাড়ে চেপেই আমাদের বৈতরণী পার হতে হবে।"

সোমা গম্ভীরভাবে বলে, "তাহলে নতুন কোন পথ তৈরি করার প্রয়োজন নেই বলছো!"

অভী দাঁড়িয়ে পায়চারি শুরু করে, হেসে সোমার দিকে তাকিয়ে বলে, "তাই কী বলতে পারি, বললে তাকে মূর্খ বলবে লোকে। বিজ্ঞান-প্রযুক্তির অভাবনীয় অগ্রগতি ঘটেছে, আমাদেরও সেই তালে লয়ে নিজেদের বদলাতে হবে; কিন্তু —" বলে সোমার দিকে নাটকীয়ভাবে ঘুরে বলে, "তা হবে সমস্ত ঐতিহ্যকে আত্মস্থ করে। হঠাৎ করে, বিচ্ছিন্নভাবে নিশ্চয়ই কিছু গজিয়ে উঠবে না।"

সোমা যেন এ ব্যাপারে আর কোন কথা বাড়াতে চায় না, হেসে বলে, "বেশ তুমি বল আমি শুনছি।" হঠাৎ দরজায় শিকলের আঘাত পড়তে অভী উঠে দাঁড়ায়, সোমা নড়েচড়ে বসে।

অভী মুখ বাড়িয়ে কার সঙ্গে নিচু স্বরে কথা বলে। তারপর ঘরে ঢুকে কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। সোমা তার দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে কিছু আঁচ করে। অভী গায়ে জামা গলায় সোমার দিকে একবার তাকায়, "আমি একটু ঘুরে আসছি।"

অভীর মুখচোখের ভঙ্গি দেখে সোমা উদ্বিগ্ন চোখে তাকায়, "কিছু সমস্যা হয়েছে?"

অন্যমনস্ক অভী চুপ করে থেকে বলে, "না, তেমন কিছু না, আমরা আমাদের জন্য অনেক সমস্যা তৈরি করে রাখি। যাক্ আমি এসে তোমায় বলছি। তেমন কিছু নয়, তুমি দুশ্চিন্তা করো না।"

অভীর চলে যাবার পথটায় সোমা কিছুক্ষণ উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে তারপর হঠাৎ

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বাইরের বারান্দায় বসে। তার চোখের সামনে যেন এক অন্য জগতের পর্দা খুলে যায়। সে ভেবে চলে। কখন চাঁদনী তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে সে খেয়ালও করেনি।

কিছুক্ষণ পর ব্যস্ত হয়ে কার সঙ্গে অভী ঘরে ঢোকে, সোমা উঠে দাঁড়ায়। কিছু কাগজ নিয়ে লোকটি চলে যাবার পর অভী জামা খুলতে খুলতে এগিয়ে আসে। তাড়াতাড়িতে চশমাটা ছিটকে পড়ে। সোমা মুখে 'আহা' শব্দ করে সেটা তোলে। অভী হাসে, "খুব তেমন দেরি করিনি, কী বল।" সোমা হেসে তার দিকে তাকায়, "সমস্যা কী হয়েছে?" অভী 'দাঁড়াও' বলে ঘরে ঢুকে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে আসে।

তারপর কিছুক্ষণ অন্যমনস্কভাবে এদিক ওদিকে তাকিয়ে বলতে শুরু করে, "কলকাতার একজন নামজাদা বামপন্থী বুদ্ধিজীবী এখানে কয়েকদিন হল এসেছেন। তার ইচ্ছা, এখানকার মানুষের জীবন নিয়ে একটি কাহিনী লিখবেন। এসেছেন তা প্রায় দিন সাতেক। এদিক ওদিক ঘুরছেন। কিন্তু সন্ধ্যে হলেই তার মূর্তি পাল্টে যায়। তিনি নিয়মিত সুরা পান করেন এবং এ ব্যাপারে সঙ্গী খোঁজেন।" সোমা দীর্ঘশ্বাস ফেলে!

অভী তার দিকে তাকায়, "এদিকে আমরা মদ তাড়াবার জন্য প্রাণপণ লড়াই করেছি। আমি ঐ দাদাকে আগেই বুঝিয়ে বলেছি, যদি একান্তই থাকতে না পারেন তাহলে সাবধানে লুকিয়ে —। কিন্তু কে শোনে কার কথা! আজকেও তিনি কয়েকজনকে জুটিয়ে আসর জমিয়েছেন। আমি যখন গেছি তখন বেশ তরলাবস্থা। কোন উপায় না দেখে আমায় আসর ভেঙ্গে দিয়ে দাদাকে বলতে হল আপনি এখানে আর এ কাজ করবেন না।"

সোমা তাকায়, "দাদা কি এই কথা বোঝার মত অবস্থায় আছেন?" অভী সে কথার উত্তর না দিয়ে যেন কিছুটা বিরক্তিভরে বলে ওঠে, "ছেড়ে দাও। ভাবলে খুব অশান্তি হয় মনে, ও কথা আর ভাবব না।" তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, "এখন কী যে হয়েছে! মানুষের সম্পর্কে খারাপ কথা ভাবতে ইচ্ছা করে না, মানুষের কালো দিকগুলো দেখতেও ইচ্ছা করে না।" সোমা হেসে ওঠে, "সে তুমি রোমান্টিক বলে।"

অভী হেসে তাকায়, "আশীর্বাদ কর, এই মনটা যেন জীবনের শেষ দিন অব্দি বজায় রাখতে পারি।" তারপর অভীর যেন কী কথা মনে পড়ে যাওয়ায় বলে ওঠে, "হ্যাঁ, এবার মনে পড়েছে, রাস্তায় যেতে যেতে ভাবছি, কিছুতেই মনে করতে পারছি না। ঐ যে ঐখানটায় —।"

তারপর সোমার স্থির জিজ্ঞাসু চোখের দিকে তাকিয়ে বলে, "ঐ যে 'শেষের কবিতা'য় অমিত লাবণ্যকে যে কথা বলছে এবং রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিভিন্ন লেখায় যে কথা বহুভাবে প্রকাশ করেছেন — নারী ও পুরুষে ভিন্নরীতি প্রেমের সেই মৌলিক একত্বের সত্য —।"

কিছুক্ষণ ধৈর্য ধরে শুনছিল সোমা, হঠাৎ যেন একটু গলা চড়িয়ে বলে ওঠে, "শোন

মধ্যম পুরুষ, ঠিক এই জায়গাতেই আমার আপত্তি। এই বিষয়টি তোমাদের রবি ঠাকুর একেবারেই বুঝতেন না।"

অভী অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকে, "বলছ কী, এমন চমৎকার উপমা দিয়ে এই যে রবি ঠাকুর বলেছেন, বাবলাকাঠ আর শিমুলকাঠ যখন জ্বলে তখন একই আগুন বেরোয়।"

সোমা যেন কিছু জয় করে ফেলেছে তাই সে মাথা নাড়িয়ে বলে, "শোন মশাই, ও সে রবি ঠাকুর বলুন আর যে গুরু ঠাকুরই বলুন, মানুষ গাছ-কাঠ নয়, মানুষ মানুষই, এসব ভাবাটাই কবিত্বের বিকার।"

অভী সে কথা প্রায় গ্রাহ্য না করে বলে যায়, "একটা জিনিস জানবে রবীন্দ্রনাথের এই শ্রেষ্ঠ প্রেমগাথাগুলি মানবহৃদয়ের বিচিত্র লীলাক্ষেত্রের ওপর এক অসাধারণ কল্পনাশক্তির পাতনের ফল; এক অসাধারণ সেনসিবিলিটির কম্পন থেকে এদের ভাবৈশ্বর্য এবং শিল্পরূপ দুই-ই উদ্ভুত। তাই মনে হয়, সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে মানুষের মন যত সংস্কৃত হতে থাকবে, সংকটে উত্তীর্ণ জীবনের স্নিগ্ধতর পরিবেশে মানুষের অনুভূতি যতই পরিশোধিত হতে থাকবে, এই জাতীয় আর্টের আবেদনও ততই গভীর ও ব্যাপক হয়ে উঠবে। অবশ্য যদি মানবসভ্যতা কোন অনির্দিষ্ট পথে অভাবনীয়ভাবে মোড় না ফেরে।"

সোমা হাত নেড়ে বলে, "আমি তোমায় এবার সত্যি কথাটা বলছি তাতে তুমি যা-ই মনে কর, রবীন্দ্রনাথ কোন রক্তমাংসের মানবীর কাছে প্রেম নিবেদন করতে চাননি। তিনি প্রকৃতির সঙ্গে প্রেমলীলায় মত্ত হতে চেয়েছেন। কারণ সেটা অনেক বেশি নিরাপদ।"

অভীক দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে ওঠে, "বৃথা বাক্য!"

সোমা যেন অনেকদিন ধরে কথাগুলো কাউকে বলবে বলে জমিয়ে রেখেছিল, "ঐজন্য দেখবে এই সমস্ত ব্যাপারে তাঁর বাস্তবজ্ঞান এত কম ছিল যে কোন লেখাই উপন্যাস হিসাবে দাঁড়ায়নি।"

অভী অবাক হয়ে সোমার মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে, বলে, "তুমি এসব বলছ কী?"

সোমা বেশ গম্ভীর মুখে বলে, "হ্যাঁ যা বলছি ঠিকই বলছি, একথা সবাই জানে, খুব বেশি কবিত্ব করো না। জীবনটা অনেক জটিল ও কঠিন, জীবনটা মোটেই কবিতা নয়। ভোরের ফুরফুরে হাওয়া, ভ্রমরের গুঞ্জন এইসব দিয়ে কী তোমার সকাল শুরু হয়! তোমার দিন শুরু হয় আর্ত মানুষের কান্না দিয়ে। ভবিষ্যৎ কালের মানুষ তাদেরটা বুঝে নেবে আমরা এখন আমাদের সময়টা নিয়ে ভাবলেই হবে!"

অভী হাসতে হাসতে তাকে থামায়, "না, তুমি বড্ড রেগে গেছো। উত্তেজনা কমাও, না হলে তোমার আবার শ্বাসকষ্ট শুরু হবে।"

কিন্তু সোমা থামার পাত্রী নয়, সে যেন আজ একটা সুযোগ পেয়েছে, তার মনের অর্গল খুলে গেছে, "না তুমি যা ভাবছো তা নয়, আমি মোটেই নারীবাদীদের মত কথা বলছি না।

আমি কথাগুলো বলছি অনেক খেদের সঙ্গে। আমাদের মহিলা সংগঠনে এই নিয়ে অনেক কথা হয়েছে, আর আমাকে সবাই ঠাট্টা করে আমি পুরুষবাদী বলে। আমি তাদের সব সময় বলি, পুরুষদের ছাড়া আমাদের কোন গতি নেই। সংসারে পুরুষ লাগে, পুরুষ ছাড়া কোন মহিলার দিন চলে না — তা সে ঘরেই হোক আর বাইরেই হোক। কারণ পুরুষদের অনেক গুণ আছে যা মেয়েদের নেই আর ঘরে-বাইরে সমাজে সংসারে কাজ করতে হলে, বেঁচে থাকতে হলে পুরুষদের কাছ থেকে ঐসব আয়ত্ত করে আমাদেরও চলতে হবে। তবেই আমরা যে ছেলেমেয়ের জন্ম দি-ই, তারা ভালভাবে মানুষ হবে। আর্থিক দিক থেকে স্বনির্ভর না হলে মেয়েদের সব মুক্তিই ঐ নুন ছাড়া খাবরের মত।"

অভী হাসে, "তোমরা মিটিং-এ পুরুষদের ওপর নিন্দাসূচক প্রস্তাব নাও না।"

সোমা বেশ ঝাঁঝের সঙ্গেই বলে, "শোন অভী, আমি মেয়ে নিশ্চয়ই; কিন্তু আমার এ কাণ্ডজ্ঞানটা আছে যে প্রকৃতি জরায়ুর কাজটা মেয়েদের ঘাড়েই ফেলেছে। আমাদের মেয়েরা যখন পুরুষের নিন্দা করে তখন আমি শুনিয়ে দি-ই আমরাও ধোয়া তুলসী পাতা নই। বাচ্চারা যে খারাপ জিনিসগুলো ছেলেবেলা থেকে শেখে তার অনেকটাই শেখে তাদের মা-ঠাকুমার কাছ থেকে। ছেলেরা দিনরাত বাইরের জগতে বেড়ায় খেলাধুলা করে তাই তাদের মন অনেক বড় হয়। মেয়েরা অনেক সংকীর্ণ, কারণ তারা পায় কম আবার একটা ছোট গণ্ডির মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু তার জন্যে তো সে দায়ী নয়। তোমরাই তো বল, একজন মানুষ পশুর মত জীবনযাপন করলে তার কাছে জীবনের নন্দনতত্ত্ব বলে কিছু থাকে না।"

সোমা যেন আজ অকুতোভয়।

কিছুক্ষণ থেমে দম নেওয়ার পর বলে ওঠে, "আর তুমি বিজ্ঞান বিজ্ঞান করছো, তোমাদের বিজ্ঞানী মহাপুরুষদের কী মেয়েদের সম্পর্কে ভাল ধারণা ছিল? বেকন থেকে আরম্ভ করে ডারউইন হাক্সলি অব্দি সবার ধারণা ছিল, বিজ্ঞান হচ্ছে পুরুষ আর নারী প্রকৃতি। তাই পুরুষের কাজ হল প্রকৃতি মানে নারীর কাছ থেকে জোর করে বিজ্ঞানের সূত্রগুলো আদায় করা। সেসব ভাষা পড়লে এমন মনে হয় যে বিজ্ঞানের প্রয়োজনে পুরুষ, নারীর ওপর যেমন জোর করে তেমনি প্রকৃতির ওপর বলাৎকার করবে!"

এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলে সোমা হাঁফাতে থাকে।

অভী শুধু মাথা নাড়ে, "ওফ্, তুমি একেবারে হত্যা করার পরিকল্পনা করেছো!"

সোমার উত্তেজনা তখনও থামেনি, "আরও শোন, এক্ষুনি আমি এক ডজন মহিলা বিজ্ঞানীর নাম করতে পারি যাঁরা মহিলা হওয়ার জন্য বেঁচে থেকে তাঁদের গবেষণার কোন স্বীকৃতি পাননি। আজ মরে ভূত হয়ে যাবার পর তোমরা আফসোস করছো, কত অবিচার তাঁদের ওপর করা হয়েছে।"

অভী হাতজোড় করে বলে, "আমার ঘাট হয়েছে, আমি রণে ভঙ্গ দিচ্ছি। কিন্তু তুমি যখন মাকড়সার কথা তুললে তখন তো তোমাকে শুনতেই হবে কেমন করে এই চমৎকার উত্তর-

আধুনিক জ্যামিতি দিয়ে গড়া জালের মধ্যে জড়িয়ে ধরে তোমরা মাথায় বিষ মিশিয়ে দিচ্ছো। আর এই মাকড়সাটি কিন্তু স্ত্রী-জাতির।"

এই শুনে সোমা একটু অপ্রস্তুতের হাসি হাসে!

অভী শুরু করে, "তোমার কাছে আমি একটি অন্য প্রসঙ্গ তুলব, অনেকদিন ধরে ভেবেছি; কিন্তু আজকে উপযুক্ত মওকা পেয়েছি।"

সোমা শাড়ির আঁচলে মুখ মুছে হাসে, "বল, বলে ফেল, অবাধ্য বালক।"

অভী মাথা নেড়ে তাকায়, "হ্যাঁ ঐ কথাটি হচ্ছে, আমাদের মেহের আলির কথা।"

সোমা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে, বোঝা যায় সে এতক্ষণ নিজের ভাবনায় মশগুল হয়েছিল, "কোন্ মেহের আলি, আমি কোন মেহের আলিকে চিনি না।"

অভী দুষ্টুমির চোখে তাকায়, "চেনো চেনো ভুলে গেছো। 'ক্ষুধিত পাষাণে'র মেহের আলি।"

সোমা হাঁফ ছাড়ে, "ও তাই বল, তুমি এমন হেঁয়ালি করছো।"

অভী অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকায়, "জীবনটাই তো হেঁয়ালি, যাক্ এই নিয়ে আর কথা বাড়াবো না। এখন মেহের আলির কথায় আসি।"

সোমা নড়েচড়ে বসে, "হ্যাঁ বল।"

"মেহের আলির এই পরিণতি সম্পর্কে তোমার কী মনে হয়?"

সোমা যেন হঠাৎ একটু থমকে যায়, "কোন্ পরিণতি, ও কী আর মনে হবে, সে কোন নারীর মোহিনী মায়ার আকর্ষণে একদিন মজেছিল; কিন্তু সেই আলেয়াকে ধরতে পারেনি।" তাই উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে সে নিজে কষ্ট পাচ্ছে, ফলে গায়ে পড়ে সবাইকে জানাতে চায়, "তফাত যাও, তফাত যাও। সব ঝুঁট হ্যায়, সব ঝুঁট হ্যায়।"

অভী মুগ্ধ হয়ে সোমার দিকে তাকিয়ে থাকে, "এত চমৎকারভাবে তুমি বললে, আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি! আচ্ছা আগে শুনি, তুমি গায়ে পড়ে বললে কেন?"

সোমা এবার হেসে মুখ মোছে, "গায়ে পড়ে ছাড়া কী, তোমরাও গায়ে পড়ে লোকের ভাল করার চেষ্টা কর।"

তারপর সম্ভবত কোন একটা কথা মনে করে সোমা হাসে, "একদিন একটি মেয়ে রাগ করে আমায় বলেছিল, আমার ভাল আমি বুঝি না। বরং তুমি আমার ভাল আমার থেকে বেশি বোঝ। আমিও ততোধিক চেঁচিয়ে বলেছি, তোমার কিসে ভাল হয় যদি তা তুমি বুঝতে পারতে তাহলে আমাকে তোমার জন্য এই কষ্টটা করতে হত না। একেই বলে গায়ে পড়ে উপকার করা। মেহের আলি জানে সে চেঁচালেও যে মায়ায় মজে সে একদিন পতঙ্গের মত আলোর দিকে ছুটেছিল, ঐরকম সবাই চিরকাল ছুটে আসবে; কিন্তু এখন ঐ সাবধানবাণী বলতে বলতে তার এমন একটা অভ্যাস হয়ে গেছে যে না বলে থাকতেও পারে না। যেমন তোমরা আমাদের কতকগুলি কথা অভ্যাস করাও 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ, করতে হবে, দিতে

হবে, নইলে গদি ছাড়তে হবে'।"

অভী হাসে, "বেশ তা না হয় হল; কিন্তু এখানে আমার দুটো কথা আছে। মেহের আলির এই কথাটা কী নেতিবাচক আর চরম কথা নয়! এর জন্যে কী নারী-পুরুষ সম্পর্ক বলতে পার টান-ভালবাসার ব্যাপারে একটা নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করবে না।"

সোমা তাকে থামায়, "দাঁড়াও দাঁড়াও, তুমি কী আমাকে দার্শনিক ঠাওরেছো, তাই সুযোগ পেয়ে এই অবলা, কচুর শাক, ডাঁটার চচ্চড়ি আর চালতের টক খাওয়া নারীর ওপর অবলীলাক্রমে এমন বুদ্ধিজীবীসুলভ অত্যাচার করছো।"

অভী ছাড়বে না, "না, এ ব্যাপারটা তোমায় একটু তলিয়ে ভাবতে বলছি, আমি অনেকদিন ভেবেছি।"

সোমা কপট রাগ দেখায়, "তোমার দেখছি হিং টিং ছট চিন্তাগুলো এখনো মাথার মধ্যে মাঝে মাঝে কামড়ায়। এসব নিয়ে তোমরা ভাব, তোমাদের মানাবে, আমাদের ছা-পোষাদের কিন্তু একদম মানাবে না।"

তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আনমনে বলে ওঠে, "কী জানি কী হয়, কেন এমন হয় — এখনই ভাবছি, কখনো তো ভেবে দেখিনি। নারীর মোহিনী মায়াও এ জীবনে সত্য।"

অভীও চিন্তামগ্ন হয়, "এখানে আমার যে কথাটা মনে হয় নারীর প্রয়োজন পুরুষের কাছে শুধু তো সংসার আর সন্তান প্রতিপালন নয়, তার থেকেও অনেক অনেক গভীর। আবার শুধুমাত্র দৈহিক সৌন্দর্য যদি নারীর মোহিনী মায়ার আকর্ষণের মাপকাঠি হয় তাহলে আমাদের সভ্যতাই ব্যর্থ হয়ে যাবে। নারীর স্পর্শ পুরুষকে অনেক গভীরভাবে মানবিক করে তোলে। তাই এই ধরনের একটা 'সব ঝুঁট হ্যায়' দৃষ্টিভঙ্গি থাকলে কী চরম ক্ষতি হয়ে যাবে না?"

সে একটু থামে তারপর চোখ বড় বড় করে বলে, "এ অবশ্য আমার কথা নয়, মহাকবি গ্যেটের কথা।"

তারপর সোমাকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকতে দেখে যোগ করে, "ও তার অর্থ এই খবরটা তুমি রাখ না। বেশ তাহলে গল্প শোন।"

এই বলে সে গল্প বলার ভঙ্গিতে সুর টেনে টেনে বলে, "সত্যি মিথ্যা জানি না। গ্যেটে তাঁর শ্রেষ্ঠ লেখা **ফাউস্ট** লিখেছিলেন ষাট বছর ধরে; কিন্তু একে শেষ করতে পারছিলেন না। মারা যাবার পনেরো দিন আগে লেখাটা শেষ করলেন বটে; কিন্তু পাছে সমালোচনার মুখে পড়তে হয় তাই বন্ধ করে রেখে দিলেন। মৃত্যুর পর দেখা গেল, শেষ দুটি লাইনে লিখে দিয়ে গেছেন, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অর্থ হল নারী জাতির মাধুর্য।"

অভী সোমার প্রতিক্রিয়া দেখার জন্য চুপ থেকে মুখ টিপে হাসে।

সোমা হাঁ করে শুনছিল, অভী থেমে গেলেও তার শোনার রেশ যেন কাটতে চায় না। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিছানা ছেড়ে উঠে পায়ে চটি গলায়, হাত দিয়ে অভীকে ইশারায় বলে, আসছি।

ফিরে এসে সোমা আনমনে কিছুক্ষণ ভেবে চলে, পরে নরম গলায় বলে, "অভী, মেয়েদের দেহের সৌন্দর্য নিয়ে আমি কোনদিন মাথা ঘামাতাম না। হয়তো আমি সুন্দরী নই বলে। কিন্তু ক্রমশ যত দিন যাচ্ছে দেখছি, এই ব্যাপারটা কত কঠিন বাস্তব। আমার অত বালাই নেই, তবু তো মনে হয়, আমার যেটুকু লাবণ্য আছে সেটুকু যখন থাকবে না তখন প্রদীপও আমার দিকে ফিরে তাকাবে না। আমার সহকর্মীদের দেখেছি, যাদের বয়স বাড়ছে, লাবণ্য কমে যাচ্ছে, এর জন্য তাদের কত দুশ্চিন্তা! তাদের স্বামীরা আর তাকাবে না, অন্য মেয়েদের প্রতি আকর্ষিত হবে আর তারা নিজেরাও অন্য পুরুষদের নজর কাড়তে পারবে না।"

অভী হাসে, "বড্ড বাড়াবাড়ি করছো!"

সোমা গম্ভীরভাবে দৃঢ় গলায় বলে, "না অভী, আমি ঠিক বলেছি তুমি মিলিয়ে দেখো। আমাদের সহকর্মীরা এইসব নিয়ে ঠাট্টা করে, অনেকে অযথা এসব ব্যাপারে তাদের স্বামীদের গৌরবগাথা রচনা করে; কিন্তু বুঝি এটা তাদের অন্তরের ব্যথাও। সব সময় যে তারা সচেতনভাবে এসব কথা বলে তাও না। হয়তো এটা তাদের ছেলেবেলা থেকে শেখানো হয়েছে, আর এখন তাই স্বাভাবিকভাবে এটা এসে যায়। তখন ভাবতে খুব খারাপ লাগে!"

তারপর সে অভীর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে, "তুমিই বুকে হাত দিয়ে বল, তোমার কাছে একটি সুন্দরী মহিলা আর একটি সুন্দরী নয় এমন মহিলা যদি একই সঙ্গে রোগী হয়ে আসে তাহলে তোমার মনোযোগ কে বেশি পাবে? ভাবের ঘরে চুরি করে তো লাভ নেই মশাই? নিশ্চয়ই তোমাদের মত মানুষের কাছে উঁচু মানের কালচার একটা বাড়তি গুরুত্ব পায়; কিন্তু এটাও নিশ্চয়ই মানবে যে তাতে দেহের সৌন্দর্যটা খাটো হয়ে যায় না।"

অভী প্রশ্ন তোলে, "পরিণত মানুষদের ক্ষেত্রেও এ কথা সত্যি বলে মনে হয় তোমার?"

সোমা খুব দৃঢ়তার সঙ্গে বলে, "সব মানুষদের ক্ষেত্রে এটা সত্যি, কারো কম আবার কারো বেশি। তফাতটা কেউ করে গোপনে আর কেউ প্রকাশ্যে। হবে নাই বা কেন, আমার যদি চমৎকার গানের গলা থাকে তাহলে সবাই আমাকে চাইবে। ঠিক তেমনি আমি যদি দেখতে সুন্দরী হই তাহলে আমার যা গুণই থাক্ না কেন রূপের জন্য একটা বাড়তি সুবিধা আমি পাবই।"

এই বলে সোমা হাসে, "অভী, তাহলে আমাদের কে নেবে বল। না আছে রূপ, না আছে কোন গুণ। অগত্যা বুঝতেই পারছো কানা খোঁড়া যা পাই তাতেই প্রদীপ জ্বালাতে হবে। তার জন্য অবশ্য আর যাই হোক, **অক্ষয় দত্ত** বা **মস্কো কাম পণ্ডিচেরী** পড়িনি বলে বকুনি খেতে হবে না।"

অভী তার নিজের ভাবনায় মশগুল, "তাহলে টিভি-র বিজ্ঞাপনে নারীদেহ নিয়ে সৌন্দর্য প্রদর্শনের নামে যে যথেচ্ছাচার চলছে তারও একটা যৌক্তিকতা আছে বল।"

এবার সোমা যেন একটু নড়েচড়ে বসে, "তা তো আছেই, তবে সেটা বিজ্ঞাপন আর বেওসার বাজার, অল্পবয়সী মেয়েদের দেহের চটকের বাজার। আমাদের এই বাজারটা আছে

বলেই না আমরা বিকোচ্ছি। বাজারটা না থাকলে কী তোমাদের সবার সামনে এমন উলঙ্গ হয়ে দাঁড়াতাম!"

তারপর কী একটা কথা ভেবে বলে, "অভী তুমি শুনলে হয়তো বিশ্বাস করবে না, কথাটা খারাপ তবু বলছি, আমার ধারণা অধিকাংশ বিবাহিত বয়স্ক মানুষ এইসব নারীদেহের বিজ্ঞাপন আর গভীর রাতের ছবি রীতিমত উপভোগ করে। অথচ তুমি হয়তো দেখবে এদের অনেকের বাড়িতে ঐ বয়েসের মেয়ে আছে। সবার কাছে শুনি; কিন্তু আমি বিষয়গুলো অত ভাল বুঝতাম না।"

একটু দম নিয়ে সে আবার শুরু করে, "অনেকদিন ধরে লক্ষ্য করেছি, প্রদীপ রাত অব্দি টিভি দেখে। আমি ক্লান্ত থাকি, ঘুমিয়ে পড়ি। একদিন মনে হল দেখি তো ও কী দেখে, মুখে বলে বিবিসি-র খবর দেখি। তারপর বুঝলাম, ও যখন আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয় তখন ঐসব নারী ওর চোখের সামনে ভাসে, আমি আর ওর মধ্যে থাকি না।"

অভীর বিমর্ষ মুখের দিকে তাকিয়ে সোমা বলে ওঠে, "হায় হতভাগ্য নারী, সে ভেবে চলেছে তার মানুষটি তাকে কত ভালবাসে! এতদিনে সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করে আমি আরও নিশ্চিত হয়েছি, এটা শুধু প্রদীপের দোষ নয়, পৃথিবীর প্রায় সমস্ত পুরুষরাই এইরকম।"

এই পর্যন্ত বলে সোমা দম নেয়, তারপর উঠে যাবার আগে হাত নাড়িয়ে বলে, "এই তো তোমার প্রেম ওগো —।"

অভী ভাবটা এমন করে যেন হিট উইকেটে আউট হয়ে গেছে, সেমসাইডে গোল দিয়ে ফেলেছে। বোকার মত মুখটি করে সে কিছুক্ষণ থমকে বসে থাকে, তারপর সোমা ফিরে এসে, হাতে চায়ের গ্লাসটা দিতেই সে যেন সম্বিৎ ফিরে পায়।

একদৃষ্টে সোমার দিকে সে তাকিয়ে থাকে, সোমা চোখমুখ মুছে স্থির হয়ে বসতে সে যেন অস্বস্তির ভাবটা কাটিয়ে কাতর কণ্ঠে বলে, "তুমি একেবারে উৎসে আঘাত করেছো। এত নির্মম, নিষ্ঠুর আঘাত আমি ইদানীংকালে পেয়েছি কিনা সন্দেহ।"

সোমা শান্ত গলায় বলে, 'সরি'।

অভী তার কথার খেই ধরে বলে যায়, "এভাবে আমাদের পায়ের তলা থেকে মাটি কেড়ে নিও না! এত কঠিন হয়ো না।"

সোমা শান্ত অপলক দৃষ্টিতে অভীর দিকে তাকিয়ে যেন স্নেহের মায়া বুলিয়ে দেয়, "না অভী তা হইনি, হইনি বলেই সংসারটা চলছে। নিশ্চিন্তে থাক, কোনদিন তা হব না, কারণ আমরা যে মায়ের জাত।"

তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সোমা বলে, "তুমি মানবে কিনা জানি না; তবু আমি জানি, আমি প্রদীপের কাছে যতখানি স্ত্রীর মত তার থেকে অনেক বেশি মায়ের মত। কিন্তু এমন অনেক সত্যি কথা আমরা জানি অভী; হয়তো নিজেদের কাছে ছোট হবার ভয়ে বলি না।

আবার আমরা যে এটা মুখ বুজে সহ্য করি তাও কিন্তু নয়।"

সোমা চুপ করে গেলেও অভী যেন কথা বলার শক্তি হারিয়ে ফেলে, তার অবস্থা দেখে সোমা বলে, "আমি বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি, আমরা যেন তোমাদের ওপর আস্থা-ভরসা রাখার একটা গভীর ইচ্ছা থেকেই এসব করি। তাছাড়া এর মধ্যে কোন অগৌরব কিছু আমার বন্ধুরা দেখতে পায় না। তাদের ভাবটা এইরকম, ওমা এইজন্যে তো সবাই সাবধান করে, কেবল টিভিতে ছেলে খারাপ হয় না, তার বাবা খারাপ হয়! এই বহুগামিতা তো পুরুষের স্বভাব অর্থাৎ এই নিয়েই তারা জন্মেছে। এ ব্যাপারে এত নাকে কাঁদার কী হয়েছে; কিন্তু ওদের গুণগুলো দেখো, এমন ক্ষমতা কী আমাদের আছে!"

অভী যেন পরাভূতের মত স্বগতোক্তি করে, "বেশ তাহলে মানছো, কিছু মহিলা তাদের রূপ দেখিয়ে কিছু বাড়তি সুবিধা সুযোগ নেয়।"

সোমা বেশ জোর দিয়ে বলে, "অবশ্যই, আমার চেয়ে হাড়ে হাড়ে কে এই কথাটা বুঝবে। এটা তারা চিরকাল নেয়, ভবিষ্যতেও নেবে, ডায়ানা রানীকে দেখো না। আজকের দিনের কেষ্টবিষ্টু হল ওরা। তোমাদের ভাষায় রূপের বাজারটা বুর্জোয়ারা করে দিয়েছে, আর এই রূপসীরা বিকিকিনির হাটে হাটে রূপ দেখিয়ে করে-কম্মে খাচ্ছে।"

তারপর নিজেই কথাটা সংশোধন করার জন্য যোগ করে, "অবশ্য শুধু এরা কেন, এদের রূপের বাজারের ওপর নির্ভর করে পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের সংসার চলেছে, ভোগসুখ চলছে। আর সব কিছুই অর্থহীন হয়ে গেছে, মায় তোমার মেরি কুরি পর্যন্ত। এতে অবশ্য মেয়েদেরই চরম ক্ষতি হচ্ছে। কারণ তারা ভাবছে, এইভাবেই দুনিয়া জয় করে নেবে। কিন্তু ক'দিন, যৌনকর্মীর মত যতদিন যৌবন থাকবে। তারপর টুপ করে একদিন আকাশ থেকে নক্ষত্রের মত খসে পড়বে।"

অভী যেন মিনমিনে গলায় একটু যোগ করার চেষ্টা করে, "শুধুই ঢঙ বলবে, ললিত লোভন লীলা —।"

সোমা যেন আরও ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে, ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলে, "আর কতদিন দু'চক্ষু কচলাবে —!"

অভী দীর্ঘশ্বাস ফেলে, "তাহলে মেহের আলি ঠিকই বলেছিল বল। দেখ, বুর্জোয়াদের বিজ্ঞাপনের মহিমাটা যেন মেহের আলি সেই জুতা আবিষ্কার-এর মুচির মত আগাম কেমন করে ধরতে পেরেছিল।"

সোমা জানলা দিয়ে তাকিয়ে থাকে, তারপর হেসে অভীর দিকে তাকিয়ে বলে, "অবশ্যই, তবে বিপদ হল সত্যি কথাটা আড়াল করার জন্য তোমরা নানা টীকা-ভাষ্য দিয়ে কথাটার অনেক ব্যঞ্জনা বানাও। কারণ আমাদের শিল্পী-সাহিত্যিকদের আর কোন কাজকর্ম ভাবনার কিছু আছে বলে তো মনে হয় না। সেই থোড় বুড়ি খাড়া —।"

কাপড় চাদর ঠিক করে বালিশটা কোলের কাছে টেনে নিয়ে বলে, "তবু মনে হয়, মেহের

আলি তো আমাদের গভীর বেদনাবোধের সঙ্গী।"

তারপর উঠে যাবার আগে একটা কী কথা মনে করে দাঁড়িয়ে পড়ে, "আর একটা বিষয় খেয়াল করেছো। মাঝে মাঝে ভাবি, অবস্থা কতখানি গভীর দেখ, নারীদেহের কোন্ কোন্ অংশগুলি সৌন্দর্যের মাপকাঠি তাও ওরা হিসাবনিকাশ করে আমাদের জানিয়ে দেবে। এই হাজার হাজার বছর ধরে নারীদেহের সৌন্দর্য সম্পর্কে যেন আমাদের কোন ধারণাই তৈরি হয়নি।"

অভী যেন লাফিয়ে ওঠে, চেঁচিয়ে বলে, "সাব্বাশ, সোমা রানী যুগ যুগ জিও। এই না হলে বিশ্বায়ন, তোমার সকল রসের ধারায় আমি হারিয়ে গেলাম!"

সোমা লজ্জা পেয়ে দ্রুত উঠে চলে যায়।

রান্নাঘর থেকে সে যেন কী ভেজে নিয়ে এসে পাশে বসা চাঁদনীর হাতে দেয়, অভীর হাতে দেয়, নিজের জন্যেও একটু রাখে।

অভী হাত নেড়ে বলে, "নারীদেহের মাপজোকের এই বিজ্ঞানে কে হাতেখড়ি করেছেন জানো, ডারউইনের ভাতিজা গ্যালটন!"

সোমা চোখ বড় বড় করে তার দিকে তাকায়, "কী রকম!"

অভী হেসে মাথা নাড়ে, "বেচারির কী যে মাথায় ভূত চাপল, পকেটে একটি কাঠের ক্রশ আর দু'আঙ্গুলে একটা সূচ নিয়ে রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে মেয়েদের দেখেন আর নিজের মত করে মন্দ, ভাল, খুব ভাল এইরকম কাঠে সূচ ফোটাতে লাগলেন।"

সোমা হেসে ওঠে, "বিচারের মানদণ্ড?"

অভী অবাক হয়ে তাকায়, "আর কিছু না, এসবই তাঁর নিজস্ব বিজ্ঞান-সাধনা।"

সোমা যেন প্রসঙ্গ এড়াবার জন্য বলে ওঠে, "নিকুচি করেছে তোমার বিজ্ঞান, এ বদ্ধ উন্মাদের কাজ।"

অভী যেন তাকে রাগানোর জন্য যোগ করে, "বলছ কী? এই নিয়ে শেষমেশ একটা ঢাউস বই লিখে ফেললেন।"

সোমা মুখ ঝামটা দেয়, "বাদ দাও।"

অভী কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে কী যেন ভাবে। সোমার অস্বস্তি হবে বলে বাইরে গিয়ে সিগারেট খেয়ে আসে, ফিরে এসে বলতে শুরু করে, "আমিও ভেবেছি, কেন এমন হয়? কিন্তু আমাদের এই সময়টা যে বড় দুরন্ত তা কী আমরা কোনভাবে অস্বীকার করতে পারি? একদিকে দেখো সামগ্রিক মূল্যক্ষয় ও অবিশ্বাস আমাদের প্রতিনিয়ত যে কোন বিষয়ে সন্দিগ্ধ করে তুলছে। আর এইসব নিয়ে সংঘাত টানাপোড়েন চলছেই। বাস্তবটা শুধু কঠিন নয়, মনে হয় খণ্ডিতও।"

অভীর কথা শেষ করতে না দিয়ে সোমা হাত তুলে তাকে থামায়, "দাঁড়াও দাঁড়াও, তুমি এমন সাহিত্যের ঢেউ দিয়ে আমায় আঘাত দিতে শুরু করেছো এখুনি আমি উল্টে পড়ে যাব। তোমাদের মত পণ্ডিতদের এই আরেকটা খারাপ স্বভাব। যখন তোমরা সোজা কথা সোজাসুজি বলতে গিয়ে হার মানো তখন জোর করে জেতার জন্য এইসব সাহিত্যের প্যাঁচ কষতে থাকো।"

অভী হেসে ধীরে ধীরে ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে বলে, "আমি একটু ভাল ভাষায় বলছি, কারণ বিষয়টা এতই গুরুগম্ভীর যে একে আটপৌরে ভাষায় প্রকাশ করতে পারা যাবে না, উচিতও নয়। তাছাড়া — ।" এ কথা বলে সে চুপ করে যায়, মুচকি হেসে বলে, "তোমার চেনা ভাষায় না বলার সুবিধা হচ্ছে তুমি কিছুই বুঝবে না, আমার জয় হবে।"

সোমাও হাসে, "সে কী আর জানি না। এই চালাকিই তো তোমরা যুগ যুগ ধরে আমাদের সঙ্গে করে এসেছো।"

হঠাৎ প্রসঙ্গ পাল্টাবার ভঙ্গিতে অভী বলে, "একটা কথা বলি, মনে পড়ে গেল। কলকাতায় একবার বিজ্ঞানী বার্নাল এসেছিলেন, তখন হলডেন ছিলেন বরানগর আই. এস. আই-এ। তিনি তাঁর জিগরি দোস্তের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। তাঁদের সঙ্গে অন্য লোকজন রয়েছেন, সুতরাং নিজেদের মধ্যে একান্ত হন কী করে। আমাদের লোকজনরাও এত আহাম্মক, অন্যত্র সরে যাবার নামটি পর্যন্ত করে না। অগত্যা তারা দু'জনে জর্মান ভাষায় আলাপ করতে শুরু করলেন।"

সোমা হেসে অসহায়ত্বের ভান করে বলে, "বেশ তুমি বল, আমাদের সেই মারীচের দশা। রামও মারবে রাবণও মারবে, তা রামের হাতেই মরি অন্তত পুণ্যিটা হবে।"

অভী গলাটা কেশে পরিষ্কার করে নিয়ে বলে, "আজকের পরিস্থিতিতে একটা জিনিস তোমায় মানতেই হবে যে এই খণ্ডিত কঠিন বাস্তবের মধ্যেই ক্ষণিক সুখাবেশের মোহের অবিরাম হাতছানি আছে। মানুষ তো চাইবে তার প্রতিদিনের সংগ্রামের এই কষ্টটুকুকে জয় করার জন্য প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত ভাললাগার কোন ব্যবস্থা করতে। তা সে সাময়িক ভোগসুখ হোক, আপাতমধুর চিত্তবিনোদন হোক। অথচ আমাদের দৈনন্দিন কামনা-বাসনার অন্তরালে ছায়ায় ঢাকা দূরে প্রচ্ছন্ন রয়ে গেল আরও একটা স্বপ্নময় জগৎ — তাও আমাদের অলক্ষ্যে হাতছানি দেয়, জানায়, জীবনের অর্থ কী! কিন্তু বহু সময় আমরা তা যেন দেখতে পাই না, কারণ আমাদের সামনের ক্ষণিক সত্যের এই খণ্ডিত তুচ্ছতা, বহুবিক্ষিপ্ত চাঞ্চল্য, এই দিগ্‌ভ্রান্তির অনিশ্চয়তা, এই দ্রুতসঞ্চরণের অধীরতা যেন অনেক বেশি সত্যি হয়ে ওঠে।"

খুব মনোযোগ দিয়ে সোমা শুনছিল, অভী শেষ করলেও সে কোন প্রশ্ন না করে চুপ করে থাকে। অভীর ভারি ভারি কথাগুলো যেন নিস্তব্ধ ঘরের মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকে। আর তারই কিছু শোষণ করে সোমা যেন আত্মস্থ করার চেষ্টায় মগ্ন হয়ে যায়।

তাই দেখে অভী আরও উৎসাহিত হয়, উপসংহার টানে, "বুঝেছ, আমার মনে হয় এর থেকে মানুষকে বাঁচাতে পারে অশেষ, অবাধ, অপরিমেয় প্রেম — যা একমাত্র মানুষেরই

সম্পদ। জীবনে যা কিছু মহৎ, মধুর, উদার, তার প্রতি প্রাণের গভীর উদ্বেলিত ভালবাসা তৈরি করতে হবে। খেয়াল করতে হবে মানুষের গভীর হৃদয়বত্তা, মহৎ কর্মপ্রচেষ্টা, প্রকৃতির মনোমুগ্ধকর বৈচিত্র্য, নারীর মোহময় রূপ ও হৃদয়মাধুরী — এই সবই পূর্ণিমার চাঁদের মত যেন আমাদের প্রাণের সমুদ্রে জোয়ার জাগাতে পারে।''

সোমা হেসে ওঠে, তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, ''বুঝেছি তোমার গৌরীদাও এই কথাই বলেছেন তাঁর বই-এ। কিন্তু তা হয় না অভী, এ তোমার নিছক রোমান্টিক আদর্শবাদের কথা। কারণ যে মানুষ এত সৌন্দর্যবিভোর, এত প্রেমপ্রবণ, তার গভীর প্রেমপিপাসা জীবনের সাধারণ ক্ষেত্রে কী করে মিটবে? কাকে, কোন্ বস্তুকে, কোন্ সাথী-হৃদয়কে আশ্রয় করে এই মহান প্রেম তার সার্থকতা খুঁজে পাবে?''

সোমার কথা শুনে অভী যেন লাফিয়ে ওঠে, ''দাঁড়াও দাঁড়াও, তুমি একেবারে আমার মনের কাছাকাছি চলে এসেছ। জানবে, মানুষ তার প্রেমকে বিশ্বসৌন্দর্যের স্পর্শে উদ্দীপ্ত করে তোলে। কিন্তু সে প্রেম আপনার প্রকাশ-পরিণতি খোঁজে মানুষেরই ভালবাসায়, মানুষেরই মঙ্গলকামী কর্মপ্রচেষ্টায়, বন্ধুর প্রীতি-সাহচর্যে, নারীর সংবেদনশীল লীলায়িত প্রেমে।''

সোমার মাথা নাড়ার ভঙ্গিতে জানায় সে অভীর একথা মানতে পারছে না। তবু অভী ছাড়বে না।

সে বলে চলে, ''শোন, এই ব্যাপারে তোমায় আমি বলতে পারি রবীন্দ্রনাথের চিন্তা আর অনুভূতি দুই-ই অসাধারণ হওয়ায় এই প্রেমপরিণতির প্রয়োজন তাঁর জীবনে খুবই গভীর ছিল। কিন্তু এই প্রকাণ্ড চাহিদার কতটুকুই বা পূর্ণ হওয়া সম্ভব? অসাধারণ মনের অধিকারী অধিকাংশ মানুষের মত তিনি তাঁর কাজ নিয়ে সৃষ্টিশীল কল্পনা নিয়ে সারাজীবন ঘুরেছেন নিঃসঙ্গ হয়ে। হয়তো মাঝে মাঝে পেয়েছেন কোন সঙ্গ; কিন্তু তাঁর প্রয়োজনের তুলনায় সেসব কিছুই নয়। প্রায় সারাজীবনই তাকে ঘুরতে হয়েছে এমন সব সংকীর্ণ মানুষের মধ্যে — যাদের সঙ্গ তাঁকে ক্লান্তিই এনে দিয়েছে।''

সোমা হেসে যোগ করে, ''কিন্তু সত্যি কথা হল, এইসব গেছো দাদা-বৌদিদের সঙ্গ লাভ করে তিনি মোটেই অখুশি ছিলেন না।''

অভী হাসে, বলে চলে, ''কারণ মানুষটি ছাড়বার পাত্র নন। তাই জীবনের এই কঠিন ধূসরতার মধ্যেই তিনি ফুটিয়ে তুললেন তাঁর ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ের মাধুরী মেশানো চিরকালীন বিশ্বজয়ী ভাবনা।''

তারপর দম নিয়ে অভী শেষ করে, ''আসলে কী জানো, আমরা চাই মানবীয় প্রেমের এক পরম আত্মিক পরিণতি। নরনারীর প্রণয়-আকুতির এই ভাবমোক্ষণে নিশ্চয়ই শরীরকে বাদ দিয়ে কিছু হয় না। কিন্তু স্থূল দেহতেও তা পূর্ণ নয়, কারণ আমরা মানুষ পশু নই। অনেকদিন রামকৃষ্ণদাকে জিজ্ঞাসা করেছি, 'বিজ্ঞানী বার্নালের এই অসম্ভব পিঙ্ক-প্রীতির আচরণের অর্থ কী?' রামকৃষ্ণদা যেন খানিকটা এড়িয়ে গেছেন। তাঁর বক্তব্য, 'ব্রেখট, চ্যাপলিন এদেরও এই

স্বভাব ছিল, এর মধ্যেও একটা কমপ্যাশন আছে, ব্যাপারটা নিছক দেহজ নয়।' কিন্তু মানতে পারিনি। পরে মনে হয়েছে, এটা বোধহয় এক একজন মানুষের ব্যক্তিত্বের, গড়ে ওঠার ধরন। যেমন রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেই ধর ইন্দ্রিয়লোভন রূপ ঐশ্বর্যে মুগ্ধ হয়েও সে প্রেম তাকে অতিক্রম করে হৃদয়ের গভীরতর রূপলোকে প্রবেশ করেছে।"

সোমা যেন ওৎ পেতে ছিল, "আর দেহকামনা? সব মানুষ কী রবীন্দ্রনাথ না সন্ন্যাসী?"

অভী হাত দিয়ে তাকে থামায়, "তা নিশ্চয়ই নয়, তবে তোমাকে আগে যে কথা বললাম, এই ব্যাপারে মানুষের ছেলেবেলা থেকে গড়ে ওঠা শিক্ষা নির্ধারক শক্তি। দেখবে, ছেলেবেলা থেকে প্রতিটি মানুষের অপর লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণের ব্যাপারটি ভিন্ন ধরনের। জৈবিকভাবে আমাদের সবার আকর্ষণপ্রবণতা এক রকমের হয় না। এরই মধ্যে আমরা ক্রমাগতভাবে শিখে চলি, নর-নারীর আন্তঃসম্পর্কের বিষয়টি। নিশ্চয়ই এর আদর্শ বা মডেল বলে কিছু নেই, তবে কিছু মানুষ এ ব্যাপারে আমাদের গড়ে উঠতে যথেষ্ট সাহায্য করেন। যেমন আমার স্থির বিশ্বাস, আমাদের দেহমনের প্রেম-ভালবাসার অনুভূতি, কামনা-বাসনা এমনকি যৌন-আচরণ এইসব শিখে বেড়ে ওঠার জন্য রবীন্দ্রনাথ প্রায় আদর্শস্থানীয়। অর্থাৎ কোন ছেলেমেয়ে যদি রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করে তাহলে সে সব থেকে বেশি লাভবান হবে।"

তারপর সোমার মুখের বিরক্তি দেখে অভী হেসে ফেলে, "আসলে তুমি এখন আমার কাছে শুধু রবীন্দ্রনাথ পাবে।"

সোমা অভিযোগ করে, "পালিয়ে যাবার রাস্তা।"

অভী হাসে, "বলতে পার, তবে আসল কথাটা হল নিয়োগীজী মারা যাবার পর মনটা যেন আরও আঘাতের ভয়ে সাপের মত কুণ্ডলী পাকিয়ে ভেতরের দিকে ঢুকে যেতে চাইছে। প্রাণপণে তার লেজ আমি টেনে ধরে রেখেছি। এটা নিশ্চয়ই মানবে, অতি বড় বীরও আরও আঘাতের ভয়ে নিরাপদ আশ্রয় চায়।"

সোমা কপট রাগ দেখিয়ে বলে, "বুঝেছি, এইরকম টানাপোড়েনের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের প্রেমই এখন তোমার একমাত্র ভরসা।"

অভী মুচকি হাসে, "এবার একটু রসভঙ্গ করি। প্রেম-ভালবাসা নিয়ে রামকৃষ্ণদার বক্তব্য শোন।"

সোমা নড়েচড়ে বসে, আগ্রহী হয়। "উনি বলেন, লোকে প্রেমে চোট খায়, তারপর তাই নিয়ে গল্প-গাথা লেখে। তাই পড়ে কিছু লোক প্রভাবিত হয়, তারা আবার ঐ দলে গিয়ে ভেড়ে। এইভাবে ক্রমশ দল ভারি হয়। এসব প্রেম-ভালবাসার মহিমাকীর্তন যারা করে ও লেখে তারাই ঐসব পড়ে। এইভাবে একটা বড় দল তৈরি হয়।"

সোমা অবাক হয়ে অভীর দিকে তাকায়, 'মানে'!

অভী তার কৌতূহল নিবৃত্ত করার জন্য বলে, "মানে সব ব্যাপারটা হল গণ-সম্মোহন আর গণ-অভিভাবন।"

সোমা তাকায়, "শত শত বছরের শিল্প-সাহিত্য সব এই।"

অভী তাকায়, "সব সবই।"

সোমা হাসে, "উনি ক্লাসে এইসব কথা বললে তো ছেলেমেয়েরা পরীক্ষায় নম্বর পাবে না।"

অভী হেসে বলে, "তোমার বুদ্ধির তারিফ করছি; কিন্তু এ ব্যাপারেও আমি খোঁজ নিয়েছি। উনি পড়ান **সাহিত্যের ইতিহাস, ইডিপাস, ম্যাকবেথ, জুলিয়াস সীজার** — নো প্রেম, নো রোমান্স।"

সোমা যেন কিঞ্চিৎ দুশ্চিন্তায় পড়ে যায়, "তোমারও কী তাই মনে হয়?"

অভী চুপ করে থাকে তারপর সোমার আগ্রহী দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে দেখে একটা উত্তর কিছু তাকে দিতেই হবে। হঠাৎ তার কী কথা মনে পড়ে যায়, হাসপাতালে রোগী দেখতে দেখতেই এটা সে ভেবে রেখেছিল।

অভী উঠতে যাবে সোমা তাকে বসিয়ে দেয়, "এবার আমি একটু রসভঙ্গ করি। আমাদের একবার মিটিং হচ্ছে, তখন রামের প্রসঙ্গ এল, ঐ মন্দিরের ব্যাপারে, রামলীলার প্রেম, দেখো মগর পেয়ার সে। কী ভাবে এটার মোকাবিলা করা যায় এ সম্পর্কে সবাই যে যার বক্তব্য রাখছে। আমি তখন বললাম, এ সম্পর্কে আমি কোন পরামর্শই আপনাদের দিতে পারব না, কারণ রাম সম্পর্কে বাঙালিদের কোন পেয়ার নেই। এই বলে আমি রামপাঁঠা, রামদা, রামধাক্কা — এইসব বলতে শুরু করলাম।"

অভী হো হো করে হেসে গড়িয়ে পড়ে, "দারুণ দারুণ!"

এরই মাঝে চাঁদনীর সঙ্গে একজন কমরেড মেস থেকে টিফিন কেরিয়ারে খাবার পৌঁছে দিয়ে যায়। সোমা উঠে পড়ে। অভী লোকটিকে সঙ্গে নিয়ে বাইরে যায়।

কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে অভী চেয়ারে বসে আপনমনে ভেবে চলে। তারপর সোমা ফিরে এসে গুছিয়ে বসে ঘাড় নারাতেই চেয়ারে হাতল ধরে সে প্রায় লাফিয়ে ওঠে, ঘরের দেওয়াল আলমারিটার দিকে উঠে যায়, **শেক্‌সপীয়র সমগ্র**টা হাতে টেনে নিয়ে আসে।

একটা বড় ঢেকুর তুলে চেয়ারে বসে খুলে ফেলে, "তোমাকে এবার একটা অন্যরকম কিছু শোনাই। আসলে এইসব কথা বলার মানুষ পাই না, তাই যাকে পাই তাকে বিরক্ত করে ছাড়ি। অবশ্য এই কথাগুলো তোমাকে বলার সঙ্গে সঙ্গে আমারও আর একবার জানা হচ্ছে।"

সোমা হাসে, "তোমার নিজেকে জানা তাহলে ফুরুচ্ছে না?"

অভী দৃঢ় কণ্ঠে বলে ওঠে, "কখনোই না।"

চুপ করে আনমনে বসে, অভীকে একা হাসতে দেখে সোমা বলে, "এ আবার কী কথা,

আমি জলজ্যান্ত বসে রয়েছি আর তুমি আপন মনে হাসছ, ভাগ পাচ্ছি না, আমার হিংসে হবে না।''

অভী হেসেই চলে, ''দেখো ভাবনাটা বিরিয়ানি, কাবাব হলে তার ভাগ দিতে ভাল লাগে; কিন্তু সেটা যদি ইসবগুল বা নিম পাতার রস হয়, তাহলে সঙ্কোচ হয়। এর ভাগ হাতে তুলে দি-ই বা কী করে?''

সোমা হাসে, ''তাই-ই দাও অন্তত আমাদের কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হোক।''

অভী হাসে, ''বেশ তাহলে শোন, একদিন একটা বড় জাতের পোকা, নাম জানি না, ঘরের মধ্যে ঢুকল। তার বাহার দেখে আমি হতবাক! তারপর অনেকক্ষণ তাকিয়ে শুধু ভেবেই চলেছি, যদি কোনভাবে এমনটি সম্ভব হয় যে ওর স্নায়ুতন্ত্রের মধ্যে আমি ঢুকে গেলাম আর ওর অনুভূতিগুলো জানতে পারলাম। অনেকক্ষণ পর মনে হল, ও তো কোন্ ছার নিজের অনুভূতিগুলোই কী ঠিকমত বুঝতে পারি।''

সোমা গম্ভীর হয়ে ওঠে, ''একেবারে খাঁটি কথা বলেছো।''

তখন শেক্সপীয়রের বইটার ওপর চাপড় মেরে অভী বলে, ''তাহলে এই মানুষটি অন্যদের মন এত ভালভাবে বুঝলেন কী করে?''

সোমা হাঁ করে তাকিয়ে বলে, ''জানি না।''

সোমা ইনহেলারটা হাতের মধ্যে নিয়ে বার কয়েক ঝাঁকিয়ে, খুলে শ্বাস নেয়, তারপর সে একটু স্থির হয়ে বসলে অভী বলে, ''আচ্ছা তোমার **অ্যান্টনি ক্লিওপেট্রা**র গল্পটা জানা আছে তো।''

''জানা মানে ঐ সুনীলবাবুর অনুবাদ যা পড়েছি।''

অভী মাথা নাড়ে, ''হ্যাঁ ওতেই হবে।'' তারপর কী একটা কথা মনে পড়ে যায়, সে হাসে, ''হ্যাঁ, বিজ্ঞানী হলডেনকে একবার তাঁর বন্ধুরা জিজ্ঞাসা করল, এই জীবজগতের অপূর্ব সৃষ্টি, বৈচিত্র্য সম্পর্কে তোমার কী মনে হয়। তখন গম্ভীর হয়ে হলডেন সাহেব উত্তর দিলেন, মনে হয়, ভগবান পোকমাকড়দের প্রতি একটু যেন পক্ষপাতদুষ্ট।''

তারপর সোমার হাসি থামলে খুব যত্ন করে বলতে শুরু করে, নাটক পড়ার ভঙ্গিতে।

এই একটা ব্যাপার অভী নিজেও খেয়াল করেছে, কেউ কিছু মন দিয়ে বলতে চাইলে তার জন্য প্রয়োজন হয় চোখের সামনে দেখতে পাওয়া আগ্রহী মনোযোগী শ্রোতা। যাকে অভিজ্ঞরা বলে সমঝদার শ্রোতা। অভীর এ কয়েকদিনে এত কথা বলার উৎসাহ, আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু সোমা। এ ব্যাপারে সোমার আহামরি কোন গুণ আছে এমন নিশ্চয়ই নয়। কিন্তু সে ভাল শ্রোতা, ধৈর্য ধরে সব কথা শোনে। সে অভীর গুণমুগ্ধ আর অভীর মতো এই সমস্ত বিষয়ে জানতে সমান আগ্রহী। সে মাঝে মাঝে অভীর কথায় প্রতিবাদ করে, তাতে অভীর ভাবনাগুলো পরিষ্কার হয়; কিন্তু কখনো সে অভীকে আঘাত করে না। সে ওরই মধ্যে নিজের মতটাও রাখে। এটা যেন সোমার শিক্ষাদীক্ষা, রুচিবোধ। আবার ব্যক্তিত্বের ধরনও হতে পারে।

আরও পাঁচটা দিনের মত বাইরে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে।

অভী বলে চলে, সোমা যেন লক্ষ্মীর ব্রতকথা শুনছে, "এই জায়গায় দেখো — একটি হতদরিদ্র, নোংরা লোক নীলনদের গাঙ থেকে অতি বিষাক্ত কয়েকটি সাপ ধরে এনেছে। সে জানে এই সাপ যাকে স্পর্শ করবে তার ভবলীলা সাঙ্গ। পৃথিবীর কোন শক্তি তাকে বাঁচাতে পারবে না। এই সাপ হাঁড়িতে ভরে সে ক্লিওপেট্রার আদেশে তার সামনে হাজির করল। পৃথিবীতে এমন কোন মানুষ থাকার কথা নয় যে ক্লিওপেট্রার রূপে সম্মোহিত হবে না। তাই লোকটি হাতে ঐ হাঁড়ি নিয়ে চোখের সামনে ক্লিওপেট্রাকে অর্থাৎ জাঁহা'র নূরকে দেখছে। সে বিস্ময়ে বিহ্বল, কারণ এই মহিলাটি তার কাছে এইসব বিষাক্ত সাপ কিনে নিচ্ছে মোটা অর্থের বিনিময়ে।"

অভী ঢোক গিলে বলে, "মানুষটি বোকা, দরিদ্র, নোংরা; কিন্তু তারও তো একটা মন আছে। সে শুধু ভাবছে, এই সাপগুলি নিয়ে এই মহিলাটি কী করবে, যে মহিলা ধনে রূপে এত ঐশ্বর্যশালী! আবার ক্লিওপেট্রা তাকে জিজ্ঞাসা করছে, সাপগুলি কাজের কিনা। একটু ভেবে দেখ, মানুষ চায় মানুষকে ভাল জিনিস দিতে। কিন্তু এখানে এই মানুষটির খারাপ লাগছে সে এই মহিলাটিকে কয়েকটি বিষাক্ত সাপ দিয়ে যাচ্ছে। হয়তো দিতে গিয়েও তার বুক কাঁপছে, কারণ তার এতদিনের অভিজ্ঞতা দিয়ে এই বিষাক্ত সাপ কী জিনিস তা সে জানে। কিন্তু এই মহিলা জানে না, এদের কী ভাবে নাড়াচাড়া করতে হয়? সুতরাং মানুষটি নিশ্চিত, মহিলাটি যখনই এই হাঁড়ির ঢাকনা খুলবে সাপের ছোবলে নীল হয়ে যাবে। অথচ লোকটি এইসব জেনেশুনেও অসহায়, তার উলঙ্গ অভাব তাকে এই কাজ করতে বাধ্য করছে।"

সোমা মন্ত্রমুগ্ধের মত তাকিয়ে আছে দেখে অভী মুচকি হাসে, "বল, পৃথিবীর কোন শিল্পী এইরকম দৃশ্য আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরতে পেরেছেন!"

সোমা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, "কত সহজ-সরলভাবে কত নির্মম কথা উনি বলতেন, ভাবতেই পারি না।"

তারপর আনমনে তাকিয়ে থাকে, "জানো অভী, মাঝে মাঝে আমার যখন বাঁচতে ইচ্ছা করে না তখন এইসব পড়ে আমার বাঁচার ইচ্ছা প্রবল হয়ে ওঠে। ঠিক একবার এইরকম হয়েছিল বাচ্চাটা মারা যাবার পর। কী খারাপ লাগছিল অভী আমি তোমায় বোঝাতে পারব না! তখন **ওয়ার এন্ড পীস** আমায় বাঁচিয়েছিল।"

সোমার কথা অভীকেও স্পর্শ করে।

"আমার এই অসুস্থ শরীর নিয়ে পেটে একটা বাচ্চা নিলাম। কী কষ্ট পেয়েছি তা বোধহয় কাউকে বোঝাতে পারব না। শুরুতে এত বমি হত, খেতে পারতাম না! তখন আবার প্রদীপের বাড়িতে আছি, অশান্তি চলছে। ওর মা দিদিদের কটু কথা শুনতে হচ্ছে, তারাও ছেলের জন্ম দিয়েছেন; কিন্তু এমন আদিখ্যেতা তাদের ছিল না! তাই বলছি অভী, মেয়েরা মেয়েদের জন্যে যে কী দুঃখ-কষ্ট তৈরি করে দেয়। সে সময় অফিসেও ছুটি পাচ্ছি না। এই শরীর নিয়ে অফিস

করতে হচ্ছে।"

অভী অধৈর্য হয়ে ওঠে, "প্রদীপ কী করছিল?"

সোমা হাসে, " প্রদীপ এমনই নির্বোধ এসব কোন কিছু বোঝার ক্ষমতাও ওর নেই। এটা ওর বুদ্ধির অভাব আছে বলেই মনে হয়। তাছাড়া আমার প্রতি মনোযোগ দিলে ওকেও বাড়ির কোপে পড়তে হবে, ফলে ও এড়িয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমি তো ধরা পড়ে গেছি, আমি কোথায় পালাই! ডাক্তার দেখানো, পরীক্ষানিরীক্ষা করা, সব এই শরীর নিয়ে আমাকে করতে হয়েছে। প্রদীপকে আমার বন্ধুরা যখন গালাগালি দিয়ে বলে তখন ওর হুঁশ হয়। আর আমরা তো নিজের জন্য কাউকে বলতে পারি না। যা পারি, যতক্ষণ পারি নিজে করি।"

তাকে বাধা দিয়ে অভী শুধায়, "মা'কে ডাকলে না কেন?"

সোমা হাসে, "মা'কে যে ডাকব তার উপায় নেই। তাকে এই বাড়িতে থাকতে হবে, আর নানা কথা শুনতে হবে। তাতে আমার অবস্থা হবে মৃত্যুর শামিল। অথচ আমি তোমাকে বলছি, এই বাচ্চা নেবার ব্যাপারে আমি যে এত কষ্ট করেছি, তা সব ঐ প্রদীপের মুখ চেয়ে। কারণ আমার নিজের সামর্থ্য তো আমি জানি।"

তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে বলে, "তাছাড়া যা প্রসব করব তা তো ঐ প্রদীপের মতই হবে। যাক্ এখন ভাবি, তোমাদের মত একজন ডাক্তার পেলে ছেলেটাকে হয়তো বাঁচাতে পারতাম। ডাক্তারদের দায়িত্বজ্ঞানবোধ যা দেখলাম তা জীবনেও ভুলব না। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই ডাক্তার, নিজেদের নার্সিংহোমে আমায় ভর্তি করে দিয়ে তারা বেপাত্তা। আমার কষ্ট হচ্ছে আমি বলছি; কিন্তু কাকে বলব? ওরা প্রায় মাঝরাতে আমার পেট কাটল, জন্মেই ছেলের শ্বাসকষ্ট শুরু হল। কোথাও নার্সারি নেই, আর প্রদীপও কী তেমন ছেলে! পুরো একটা দিন ছেলেটা বেঁচে ছিল। তার পরেও আমায় শুনতে হল, ছেলে পাবার কপাল করে আমি জন্মাইনি!"

সোমার ছলছলে চোখ দেখে অভী ব্যাপারটাকে হালকা করার চেষ্টা করে।

সোমা শাড়ির আঁচলে মুখ মোছে।

অভী উঠে পড়ে, "আচ্ছা এই প্রসঙ্গটা আপাতত ঝুড়ি চাপা দেওয়া থাক্, আমায় হাসপাতাল যেতে হবে।" এ কথা বলে সে তড়াক করে উঠে পড়ে।

সোমাও উঠি উঠি করে, "আমি একটু অল্প করে খাবার করে রাখি, তুমি ফিরে এসে খেয়ো।"

অভী তাকায়, "এ সময় খাবার অভ্যাস নেই; কিন্তু তুমি বললে তো আর না করতে পারি না সোমাবাঈ। তবে তুমি অভ্যেসটা খারাপ করে দিয়ে যাবে। এর পর সব সময় খাই খাই মনে হবে। আমায় এত খাবার যোগাবেই বা কে?"

সোমা হাসে, "এটুকু ব্যবস্থা করার ক্ষমতা তোমার আছে, আসলে ছেলেদের অভ্যাস নেই তাই কোনকালে তারা পারে না।"

অভী তার পথ আটকায়, "দাড়াও দাঁড়াও, এ তোমার একেবারে ভুল ধারণা, আমার

এখানে যারা সঙ্গী তারা এসব কাজে এত পটু যে গৃহিণীরা হার মানবে।"

সোমা হাসে, "তাই নাকি, সে এক একজন নিশ্চয়ই পারে; কিন্তু তুমি পার না এটা অন্তত আমি জানি —।"

তারপর মুখ ফিরিয়ে হেসে বলে, "আর আমিও যে ভাল পারি না, সেটাও তুমি জানো।"

অভী তাকে ঠাট্টা করে, "শোন, আমার এটুকু বোঝার ক্ষমতা আছে, যে মেয়েকে পড়াশোনা করে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌকাঠ ডিঙোতে হয় অধিকাংশ সময় তার কাছে নিজের সংসারটাও অচেনা থাকে।"

সোমা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, "তবু সংসার তো করতেই হয়, কেউ ছেড়ে দেয়?" এর মধ্যেই সে চাঁদনীকে কী ইশারা করে, চাঁদনীও প্রস্তুত।

অভী জামা গায়ে দিতে গিয়ে প্রসঙ্গ পাল্টায়, "বেশ বেশ, কী যেন বলতে গেলুম ভুলে গেলুম।"

সোমা হেসে রান্নাঘর থেকে তাকে মনে করিয়ে দেয়, "ঝুড়ি চাপা দেওয়া।"

অভী হাসে, "ঠিক, হ্যাঁ ঐ ঝুড়ি চাপা দেওয়ার গল্পটা। সে কী রকম জানো তো, গাঁয়ের দুই ঝি-এর ঝগড়ার মত। সকালবেলায় তারা ঝুড়ি নিয়ে গোবর-জ্বালানি কুড়োতে বেরিয়েছে। তাদের একে অন্যের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হতেই ঠেস দিয়ে একে অপরের অগৌরবের তালিকা জানান দেয়, ব্যস অন্যজন ফোঁস করে ওঠে। শুরু হয়ে গেল শরীর নেড়ে হাত নেড়ে কবিগানের তর্জার মত ছড়া কাটতে কাটতে কথোপকথন — কার জামাই কার মেয়েকে ভাত দেয় না, কে কবে কার সঙ্গে 'রঙ' করেছে ইত্যাদি ইত্যাদি। ইত্যবসরে কোনদিক থেকে হয়তো কারো মানুষটি হাঁক পাড়ছে, তুই আছিস কোন্ পাড়া? অমনি একটি ঝি তার ঝুড়িটি ঐখানেই চাপা দিয়ে বলে উঠল, এই রইল আমি আসছি।"

সোমা খিল্‌খিল্ করে হেসে ওঠে।

হাসপাতাল থেকে ফিরে এসে অভী দেখে সোমা চাঁদনীকে ধরে লেখাপড়া শেখাবার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

অভী হাসিমুখে তাকিয়ে বলে, "তোমার যাত্রা শুভ হোক।" তখন চাঁদনীকে ছেড়ে অভীকে খাবার দেবার জন্য সোমা উঠে পড়ে, "ওর কিন্তু বুদ্ধি আছে।"

তারপর কী একটা চিন্তা করে সোমা বলে, "আচ্ছা ওকে কী আমার সঙ্গে নিয়ে যাব?"

অভী থমকে দাঁড়ায়, কী একটা কথা ভাবে, পরে উত্তর দেয়, "প্রস্তাবটা মন্দ নয়, আমি এদের বলে দেখতে পারি; কিন্তু আমার মনে হয় এসব হাঙ্গামা তোমার না করাই ভাল। এখানে ওর নিজের পরিবেশের মধ্যে ও আছে ভালই। তোমার ওখানে গিয়ে যদি ওর মন না টেকে তাহলে তুমি সমস্যায় পড়বে। তখন সেই ছুটি গল্পের মত অবস্থা হবে। আবার প্রদীপকে

ওকে ফেরত দিয়ে যেতে হবে।"

সোমা যেন ঘরপোড়া গরুর মত বলে ওঠে, "তা বটে, এ কথাও ভুল বলনি।"

খেতে খেতে অভী বলে, "তোমার আসল কথাগুলো কিন্তু আমায় এখনো বলনি। আমি কিন্তু সেসব শুনবই, তোমাকে বলতেই হবে, এড়িয়ে গেলে চলবে না।"

সোমা হাসে, "কী আছে, ঐসব ম্যাড়মেড়ে কথায়।"

অভী জেদ ধরে, "না, তবু তুমি বলবে।"

তখন বিছানায় ভালভাবে গুছিয়ে বসে, ইনহেলারে শ্বাস নিয়ে সোমা শুরু করে, "ঐ তো তোমাদের শিবমন্দির আকুপাংচার সেন্টারে আমার যেন কী দুর্ঘটনা ঘটল?"

অভী উত্তর দেয়, "স্পন্টেনিয়স নিউমোথোরাক্স।"

"হ্যাঁ, তারপর থেকে তুমি আমার ওপর দুর্বল হয়ে পড়লে। আমার সেবা যত্ন করলে, আমার চিকিৎসার দায়িত্ব নিলে; কিন্তু আমার তখনই বোঝা উচিত ছিল যে এটা ভালবাসা নয়, প্রেম নয়, একজন চিকিৎসকের দায়িত্ব-কর্তব্যবোধ।"

অভী আপত্তি করে, "সবটাই তা নয়, রোমান্টিসিজমও ছিল।"

"থাকলেও ছিটেফোঁটা, সে বলার মত কিছু নয়। কিন্তু অধিকাংশটাই ছিল দয়া-মায়া। আমি যে এটা বুঝিনি তা নয়, বুঝলেও মনে মনে অনেক স্বপ্নের জাল বুনতে থাকলাম, কাঙাল তো! এর পেছনের কারণ ছিল তোমার আবেগ। তুমি এত আবেগপ্রবণ যে তোমাকে সামলানো মুশকিল ছিল। যা করবে মনে করছো তা করবেই। কোনভাবে তোমাকে নিরস্ত করা যাবে না। যাই হোক, পরে ভেবে দেখেছি, ভালই হয়েছে, আমার যা অবস্থা তাতে কষ্ট আমাকে পেতেই হবে! সুতরাং যা হয়েছে তা মেনে নেওয়া ছাড়া আমার আর কী উপায় থাকতে পারে। তাই যখন ক্রমশ বুঝতে পারলাম তখন মেনে নেবার চেষ্টা করলাম। বুঝলাম, তোমাকে পাওয়া যাবে না। যা আমাদের ধর্ম, নানা অনুরোধ-উপরোধ, যুক্তি, মান-অভিমান; কিন্তু তখন কী আর এমন করে ভেবেছিলাম যে তুমি সব কিছুর বাইরে চলে গেছ। যখন বুঝলাম, তারপর আর তোমাকে একটি কথাও বলিনি।"

অভী মাথা নিচু করে থাকে।

"না একেবারে নিষ্ঠুর তুমি তা আমি বলবো না। কারণ তুমি রেজিস্ট্রি করতে চেয়েছিলে, আর সে ব্যাপারে কাগজপত্র সই করে আমায় দিয়েও গেলে। কিন্তু তখনই আমার কেন জানি মনে হয়েছিল, এতে তোমার প্রসন্নমনের সায় নেই। করতে হয় করছো, একটা নিছক দায়িত্ববোধের খাতিরে। তাছাড়া বাড়িতেও ঠিক এইরকম কিছু চাইছিল না। ফলে আমি চুপ করে গেলাম।"

তারপর সোমা হেসে ওঠে, "যাক্ ওসব কথা বাদ দাও। কী লাভ ঐসব পুরানো কাসুন্দি ঘেঁটে, কী পাওয়া যাবে ওসব তেতো স্মৃতির মধ্যে। তার থেকে ভাল, তুমি নিয়োগীজীর কথা বল।"

এসব পুরানো কথায় সোমা যে কষ্ট পাচ্ছে এটা অভী সোমার মুখ দেখে বুঝতে পেরে ব্যাপারটা মেনে নেয়।

তারপর মুখ ধুয়ে এসে গামছায় হাত মুছতে মুছতে যাত্রার নায়কের ঢঙে বলে, "দল্লী-রাজহারা হল নিয়োগীজীর অনুভূতি-নির্মিত জগতের রোমাঞ্চলোক। এখানে প্রবেশ করতে হলে সবার আগে চাই তোমার পরিণত জীবন ও শিল্প-অনুভূতি, আর পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ। বালিকে তুমি কী অন্তরে প্রস্তুত?"

হঠাৎ কী যেন একটা কথা মনে পড়ে যাওয়ায় সোমা তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, "আচ্ছা একটা কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করি। এই যে অনেককে দেখেছি জীবনের একটা পর্যায়ে সমাজটাকে বদলাবার জন্য প্রাণটা দিতে পারলে যেন বেঁচে যান। আবার সেই মানুষ অন্য সময়ে যেন বলে ওঠেন, সব ভুল সব ভুল! এটা কেন হয়!"

অভী হাসে, "এ আর নতুন কথা কী? এক সময় সে ভুল করে পরে সেই ভুল সংশোধন করার চেষ্টা করে।"

সোমা হাসে, "মোটেই ব্যাপারটা অত সহজ-সরল নয়। এটা তুমি একটা কথার কথা বললে।"

তখন অভী দীর্ঘশ্বাস ফেলে নড়েচড়ে বসে, "অন্যের কথা বলতে পারব না। আসলে ব্যাপারটা আমার কী মনে হয় জানো — মেহের আলি বলেছিল 'সব ঝুঁট হ্যায়', আসলে সে ছিল ভুক্তভোগী। তার ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্নকে সে বাস্তবে দেখতে চেয়েছিল। আমাদেরও বোধহয় তাই হয়। আমাদের তো একটাই জীবন। এই ছোট জীবনেই সমাজটাকে বদলে দেবার যে স্বপ্ন আমরা দেখি তাকে বাস্তবায়িত করতে পারি না। ফলে কমবেশি আমাদেরও মনে হয় 'সব ঝুঁট হ্যায়'। বাস্তব জীবনটা যে বড় কঠিন আর জটিল। কিন্তু মানুষ তো স্বপ্ন দেখবেই বিশেষ করে যুবক-যুবতীরা, নইলে সমাজটা এগোবে কী করে!"

সোমা অনুযোগের সুরে বলে, "কী ব্যাপার বল তো, তোমাকে এমন মেহের আলিতে পেল কেন!"

অভী কানমোলার ভঙ্গিতে কানে হাত দেয়, তাই দেখে চাঁদনী হেসে ওঠে, "ঘাট হয়েছে আর মেহের আলিকে ডাকব না। এও নিঃসঙ্গতা, কোন একজনকে পেলে আর ছাড়তে চাই না।" এই বলে সোমার দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

তারপর উঠে জামা খুলতে খুলতে বলে, "বেশ তাহলে এবার রাত্রের ব্যবস্থা হোক, বাইরের কোলাহলও শান্ত হয়ে এসেছে।"

সোমার যেন কী একটা কথা মনে পড়ে যায় সে বলে ওঠে, "হ্যাঁ ভাল কথা, কে একজন নির্মলবাবু এসেছিলেন, অনেকক্ষণ আমার সঙ্গে গল্প করলেন। আমায় তার বাড়িতে দুপুরে খেতে যাবার নেমন্তন্ন করলেন। আমি বলেছি আমি কিছু জানি না, ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কথা বলবেন। লোকটি দেখলাম বেশ মিশুকে, এখানে কটন মিলে কাজ করেন।"

অভীর হাসি দেখে সোমা কথা থামিয়ে দেয়, অভী বলে, "হ্যাঁ আমি ভাবছি, দেখো ভদ্রলোক তোমার কাছ অব্দি ধাওয়া করেছেন। মানুষটা ভাল, আমাদের এখানে আকুপাংচারের কাজটা উনিই করেন। কিন্তু সমস্যা হল নতুন কোন ভ্যাঙালি এলেই তাকে নেমন্তন্ন করে খাওয়াতে হবে। আমার কাছেও গিয়েছিলেন, আমি খুব বকে দিয়েছি। হয়তো একটু খারাপ ভাষাই বলেছি। খুব রাগ হয়েছিল, একজন সাধারণ চাকুরে, বাড়ির ওপর কী পরিমাণ চাপ পড়ে চিন্তা কর।"

সোমা হাসে, "কত ধরনের মানুষই থাকে!"

সকালবেলায় ঘরে এখানকার থানার পুলিস অফিসার এসে হাজির। অভী তখনও ঘুমিয়েছিল। চাঁদনী দরজা খোলে, পুলিস দেখে সোমা ভয় পেয়ে যায়, কিছুটা ইতস্তত করেই অভীকে তোলে। কারণ সে যে কত রাত্রে শুয়েছে সোমা জানে না।

অভী ধড়মড় করে উঠে বসে, সব শুনে হাই তোলে, "ও, তাই বল, আমি ভাবছি কী না কী হল?"

তারপর সোমার মুখ দেখে বলে, "আরে ও নিজের কাজে এসেছে, বসতে দিয়েছো তো।"

সোমা হাসে, "হ্যাঁ চাঁদনী বাইরে চেয়ার দিয়েছে। তুমি একবার দেখা করে এস। পুলিস দেখলে বাবা বড্ড ভয় করে।"

অভী চশমাটা খোঁজে, "এই সাহস নিয়ে তুমি বিপ্লব করবে, আরে ও নিজের কাজে এসেছে।"

তারপর লম্বা হাই তুলে বলে, "জানো, এখানে একবার আমরা জেলে ছিলাম প্রায় তিন সপ্তাহ, একটা মিটিং করতে গিয়ে সবাইকে গ্রেপ্তার করেছিল। নিয়োগীজীর কী চিন্তা, চতুর্দিকে ছোটাছুটি, ডাক্তারসাব ফটককে অন্দর। পরে এই নিয়ে কী হাসাহাসি! আমরা তো দিব্যি ছিলাম, ফিরে আসতেই বীরের সম্মান।"

সোমা হাসে, অভীকে ঠ্যালা দেয়, "বেশ তোমরা সব বীরপুরুষ, যাও ওঠো, ভদ্রলোক বসে আছেন।"

অভী হাই তোলে, হাসে, তারপর সোমার দিকে হাত নাড়িয়ে বলে, "কত কী ভেবে রাখলাম — গেল আজ সকালটা, এই বাসি মুখে লোকে মালিকের নাম করবে না পুলিসের জেরা।"

সোমা হাসে, "কিসের জেরা?"

অভী জামাটা পরে, পায়ে চটি গলায়, "এসে বলছি।"

সোমা বিছানাটা ঠিক করতে করতে বলে, "আমি কিন্তু চা করছি।"

অভী মাথা নেড়ে চলে যায়।

অফিসারকে বিদায় দিয়ে অভী চেয়ারটি টেনে নিয়ে ঘরে আসে, ঢুকেই হাতঘড়ি দেখে, আরও এক কাপ চা পেয়ে খুশি হয়।

চায়ের কাপটা চাঁদনীর হাত থেকে নিয়ে সোমার দিকে তাকিয়ে বলে, "পাক্কা পঁয়তাল্লিশ মিনিট।" তারপর সোমাকে দেখে বুঝতে পারে সে ব্যাপারটা শোনার জন্য উৎকর্ণ হয়ে আছে।

চাঁদনী শব্দ করে অন্য চেয়ারটি ঘরে ঢোকায়।

অভী চেয়ারে বসে, চুপ করে থাকে, পরে বলে ওঠে, "তোমার আজকে কর্মসূচি কী, আমি তো হাসপাতালে চলে যাব।"

সোমা হাসে, "হ্যাঁ ওকে নিয়ে একটু বাজারে যাব।"

অভী যেন ধরে ফেলেছে, "নিশ্চয়ই বাঈয়ের বরাত খুলে গেছে?"

সোমা ওর দিকে তাকিয়ে বলে, "কী আর, ওর তেমন জামা-কাপড় নেই, দেখি এখানে কী পাওয়া যায়। হ্যাঁ, কী হল তোমার জেরা, শুনি।"

অভী হাসে, "জটিল, বড্ড জটিল এই জীবন।"

চাঁদনী যেন সোমার কোন নির্দেশের অপেক্ষায় ছিল, সোমা তাকে নির্দেশ দিতেই সে চলে যায়।

অভী চুপ করে কিছুক্ষণ বসে থেকে বলে, "মাস খানেক আগে একটা ঘটনা ঘটেছিল। একজন নতুন পাশকরা ডাক্তার কাছেই মিশনারি হাসপাতালে কাজ করত। আমাদের এখানেও মাঝে মাঝে আসত। নতুন বিয়ে করেছে; কিন্তু মেয়ের সঙ্গে, বলা উচিত তার বাপের বাড়ির সঙ্গে ছেলেটির বনিবনা হচ্ছিল না। শুনছি দেনাপাওনা নিয়েই নাকি গোলমাল ছিল। মেয়েটি নাকি বাড়ির খুব আদরের, দিল্লী থেকে পড়াশোনা করে এসেছে। এই একটু দূরেই বাড়ি। তা মেয়েটি একদিন তার বাপের বাড়িতেই সন্ধ্যেবেলায় পেট ব্যথায় কাতরাচ্ছিল। ছেলেটিও তখন সেখানে ছিল। তার কিছুক্ষণ আগেই নাকি ওদের ঝগড়া হয়েছে। ছেলেটি চেয়েছিল তার মায়ের কাছে মেয়েকে রাখবে। মেয়ে যাবে না, সে চায় ছেলে ঘর-জামাই থাক্। যাই হোক, আরও কিছু অন্তরে থাকলেও থাকতে পারে, জানি না।"

সোমা জিজ্ঞাসা করে, "বাঙালি?"

অভী আলমারি থেকে একটা কাগজ বার করার জন্য উঠে যায়, "হ্যাঁ, তখন ঐ পেট ব্যথার চিকিৎসা ছেলেটি করেছে। দূরে ওষুধের দোকান থেকে ইনজেকশন নিয়ে এসে তাকে দিয়েছে। কিন্তু তাতে ওর ব্যথা কমেনি, বেড়েছে। তারপর আমাদের এখানে ওকে গাড়ি করে নিয়ে আসে। কেবিনে রেখে কয়েক ঘণ্টা ওর চিকিৎসাও করেছি; কিন্তু কিছু বুঝতে না পেরে ভিলাই হাসপাতালে পাঠিয়ে দি-ই। ওখানেই মেয়েটি মাঝরাতে মারা যায়। মৃত্যুর সময় বলে যায়, তাকে ছেলেটি এমন ইনজেকশন দিয়েছে যে তাতেই তার সারা শরীর জ্বলে গেল।"

সোমা আশ্চর্য হয়ে তাকায়, "মারা গেল। তুমি কিছু ধরতে পারোনি।"

অভী একটু চিন্তিত মুখে বলে, "শুধু ধরতে পারিনি তাই নয়, ব্যাপারটা যে এতটা গুরুতর তাও ভাবিনি। ভেবেছিলাম মেয়েটির হয়তো কোন মানসিক সমস্যা হচ্ছে। বলতে পারো, কিছুটা ঝামেলা এড়াবার জন্যেই আমরা পাঠিয়ে দিয়েছি। কারণ মেয়েটির বাড়ির লোক অত্যন্ত প্রভাবশালী। যদি এখানে কিছু ঘটে তাহলে আমরাও সামলাতে পারব না। কিন্তু মেয়েটা যে মারা যাবে তা আমার কল্পনাতেও ছিল না। তারপর এই নিয়ে হুলস্থূল, ছেলেটি এখনও জেলে। ওর বাড়ির অবস্থা তেমন ভাল নয়, দাদা সেদিন এসেছিল।"

এই পর্যন্ত বলে অভী চুপ করে যায়।

সোমা ধীর গলায় বলে, "তোমার কী মনে হয়?"

অন্যমনস্ক অভী কাগজে চোখ রেখেছিল, আস্তে আস্তে মুখ তুলে সোমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। তারপর আনমনেই বলে ওঠে, "ওর দাদা পোস্টমর্টেম রিপোর্টের কপি নিয়ে এসেছিলেন; কিন্তু তাতেও স্পষ্ট করে মানে নির্দিষ্ট করে কিছু বলা নেই। ঠিক বুঝতে পারিনি। চিকিৎসা করতে গিয়ে ভুল হতেই পারে; কিন্তু একজন চিকিৎসক কাউকে মারার উদ্দেশ্যে এইভাবে একটা কাণ্ড করবে, বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে না।"

সোমা যোগ করে, "আর এর ভবিষ্যৎ যে সাঙ্ঘাতিক এই কথাটাও সে একবার ভাববে না!"

অভী উঠে পড়ে, "বুঝতেই পারছো, ছেলেটি ডাক্তার তাই আমাদের একটা স্বাভাবিক সহানুভূতি আছে; কিন্তু ওকে বাঁচানো মুশকিল।"

সোমা যেন একটু দৃঢ় গলায় বলে, "আর সত্যি যদি ও অপরাধ করে থাকে তাহলে ওর শাস্তি পাওয়া উচিত। তোমরা কেন ওকে বাঁচাবার চেষ্টা করবে? যদিও ও তোমার মেয়ে নয় তবু চাঁদনীর ক্ষেত্রে যদি এমন কেউ করে তুমি ছেড়ে দেবে?"

অভী যাবার আগে হেসে সোমার দিকে সেলাম ঠুকে বলে, "ধন্য আপনার বিচার, জাঁহাপনা।"

দুপুরে অভী ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে চাঁদনী যেন অপেক্ষা করেছিল, তার নতুন জামাকাপড়গুলো বিছানার ওপর ফেলে অভীকে দেখায়। অভী খুব খুশি হয়ে সোমার দিকে তাকায়, "আসলে তো তোমরা মায়ের জাত।"

সোমা কোন উত্তর দেয় না। পরে সবাই মিলে খাওয়া শেষ করে অভী আয়েস করে বসতেই সোমা তাকে ধরে, "হ্যাঁ, তখন কী বিচারের কথা বলছিলে?"

অভী হাসে, "ওরে ব্যস, তুমি এখনো ঐসব ধরে বসে আছো।"

সোমা হাসে, "না এমনি ভাবছিলাম, মেয়েটা মারা গেল, আমরা বোধহয় নিরপেক্ষ হতে পারি না, নিরপেক্ষ হওয়া কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়।"

অভী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, ''আমি কিন্তু তোমায় ব্যঙ্গ করে কিছু বলিনি। আমি শুধু ঐ কথাটার মধ্যে নিজেকে বোঝাতে চেয়েছি, আমি যদি কোন অন্যায় করি তাহলে তার শাস্তি আমাকে পেতেই হবে। কিন্তু সব অপরাধীরা কী এ সমাজে শাস্তি পায়, আর এইসব বিচার করছে কে? আমাদের সমাজে বিভিন্ন স্তরে যাঁরা এইসব বিচার করে থাকেন তাঁরা কী সব সাচ্চা মানুষ?''

সোমা হাঁটু মুড়ে বসে, ''তাহলে কী বলতে চাও সব অপরাধের সাজা না হওয়া অব্দি কোন অপরাধের সাজা হবে না।''

অভী হাসে, ''না, আমি তাও বলতে চাইনি —।''

অভী আরও কিছু বলতে চায়, সোমা বাধা দেয়, ''থাক্ অভী এই প্রসঙ্গটা বাদ দাও, কেন জানি ভাল লাগছে না। তোমার কথা বল, তুমি কিন্তু তোমার কথা বলবে বলে আমায় কথা দিয়েছিলে।''

অভী হাসে, ''অবশ্যই, তা না বলে আমার যে রেহাই নেই তা আমি জানি।''

তারপর গলা ঝেড়ে বলতে শুরু করে, ''মানসীর সঙ্গে সম্পর্কটা খারাপ হবার পর আমার নানা পরিবর্তন দেখা গেল।''

সোমা বাধা দেয়, ''কেন খারাপ হল?''

অভী একটু চিন্তা করে বলে, ''ঠিক কী কারণে আমি জানি না, তোমায় বলতেও পারব না। তবে সে আমাকে আর তার জন্য উপযুক্ত মনে করছিল না।''

সোমা গালে হাত দিয়ে বলে, ''বেশ, বল।''

অভী বলে যায়, ''ঠিকই, খুব মুষড়ে পড়েছিলাম। বুঝতেই পারছো, জীবনটাকে যখন একভাবে মাপজোক করে প্রায় বসিয়ে ফেলেছি, তখনই এমন একটা অবস্থার মুখে পড়লাম।'' এ কথা বলে একটু চুপ করে থাকে।

আবার শুরু করে, ''আটাত্তর সালের বন্যায় মুর্শিদাবাদে জজান, পাঁচথুপিতে বন্যাত্রাণ করতে গিয়ে বিপ্লবী কমরেডদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। এবার আমার নিঃসঙ্গতার সুবাদে সেই পরিচয় আরও ঘনিষ্ঠ হল। ওদের নানা কাজে নিজেকে জড়িয়ে ফেলতে লাগলাম। তখন এদিকে শুনছি, ক্রমশ পশ্চিম দিনাজপুরে সংগঠন ভারি হয়ে উঠছে। প্রতিনিয়ত নানা খবর আসছে, তাই মাঝে মাঝে সেখানে যেতাম। ছোটখাট কাজও করতাম, মনের মধ্যে একটা উত্তেজনাও হত। খবর পেতাম শিগ্‌গির আমাদের মুক্তাঞ্চল গড়ে উঠবে। পুলিসের রাইফেল ছিনতাই হচ্ছে, গ্রামদখল হচ্ছে; কিন্তু আমার ঠিক পোষালো না, নানা কারণে। সে আর তোমায় ব্যাখ্যা করছি না। তবে এটুকু বলতে পারি, বার বারই মনে হত যে এভাবে হবে না, আরও অনেক ছোটখাট কাজ বহুদিন ধরে লেগে থেকে করে সংগঠন মজবুত না করতে পারলে এভাবে ওপর ওপর কাজ করে কিছু টেকানো যাবে না। বহুদিন ধরে নিপুণতার সঙ্গে কাজ করলে তবে যদি কিছু দাঁড়ায়।''

সোমা তাকায়, ''পুলিসে ধরেনি তোমায়?''

অভী আনমনা হয়ে বলে, ''না অনেক চেষ্টা করেছে পারেনি। এর জন্য দাদা-দিদিরা খুব বিরক্ত হয়েছিল আমার ওপর। ওখান থেকে পালিয়ে কলকাতায় আমার পাড়ায় চলে এলাম; কিন্তু বাড়িতে থাকতাম না। রামকৃষ্ণদার গালাগালি শুনে বিজ্ঞান আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। ভুপালের গ্যাসকাণ্ড ঘটার পর সে আন্দোলন উত্তাল হয়ে উঠল। কিন্তু পেট চালাতে হবে, তাই এদিক ওদিক সার্জারি করি আর বিজ্ঞান আন্দোলন করি, এভাবে কিছুদিন চলল। তাতেও ঠিক পোষাচ্ছে না। আমাদের ওখানকার আকুপাংচার সেন্টারগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করে এখানেও কিছুদিন আকুপাংচার করলাম। চীন আর নর্মান বেথুন তখনও মাথায় ঘুরছে। ভারতবর্ষের বহু জায়গায় ঘুরলাম, দেখলাম; কিন্তু তাতেও পোষালো না।''

সোমা হাসে, ''কিন্তু জব্বলপুর যাওনি।''

অভী হাসে, ''না, যাই হোক, ঠিকমত কাজের জায়গা পাচ্ছি না। তারপর একদিন মুসলিম ইনস্টিটিউটে নিয়োগীজীর বক্তৃতা শুনলাম, মুগ্ধ হয়ে গেলাম। এক বন্ধুকে নিয়ে তাঁর সঙ্গে খিদিরপুরে দেখা করলাম। তাঁরা রাজহারায়, ছত্তিশগড়ে হাসপাতাল খুলবেন, ডাক্তার লাগবে। প্রথম দিনই নিয়োগীজীর সঙ্গে কথা বলে এত ভাল লাগল, বলতে পার আমি যেন এমন একজনকেই মনে মনে খুঁজছিলাম। মনে হল ইনিই হচ্ছেন খাঁটি মানুষ, যে মানুষের গায়ে এখনও মাটির গন্ধ লেগে আছে। সিদ্ধান্ত নিলাম, সেখানে চলে যাব, যা-হোক, একটা কাজের কাজ কিছু হবে। নতুন করে একটা স্বাস্থ্য আন্দোলন তৈরি করার ডাক যেন কানে বার বার শুনতে পেলাম।''

রান্নাঘর থেকে চাঁদনী ইশারায় কিছু জানালে সোমা তাড়াতাড়ি উঠে যায়, আবার ফিরে এসে বসে অভীর প্রতি মনোযোগী হয়।

''এখানে যখন এসেছিলাম তখন এখানে প্রায় কিছুই ছিল না। সমস্ত কিছু নতুন করে আমাদের গড়ে তুলতে হয়েছে। আমাদের যা করতে হয়েছে তার থেকে অনেক বেশি কাজ করতে হয়েছে মুক্তিমোর্চাকে। তবে দেখলাম এক একটা মানুষের ভূমিকা অনেক বড় হয়ে ওঠে, নিয়োগীজীর ভূমিকাও সেরকম। আমি এখন নিশ্চিত যে, ইতিহাসে ব্যক্তির ভূমিকা কোনভাবে অস্বীকার করা যায় না, যাবে না। একক ব্যক্তি যে কোন কাজের ক্ষেত্র এবং সমস্ত অবস্থাকে বদলে দিতে পারে। নিয়োগীজী না থাকলে এখানে এইসব কর্মকাণ্ড কিছুই হত না। তাঁর সঙ্গেও এই নিয়ে অনেক কথা হয়েছে। আমরা স্বীকার করে নিয়েছি, নিয়োগীজীর মত এমন মাঝারি মাপের বহু মানুষ আমাদের দেশে জন্মেছেন; কিন্তু একটা লেনিন বা বলতে পার একটা মাও-সে-তুং-এর অভাবে আমাদের দেশে কিছু করা যায়নি।''

সোমা জিজ্ঞাসা করে, ''এই হাসপাতালে কত বেড আছে?''

অভী হিসাব করে, ''কাগজে-কলমে পঞ্চাশ; কিন্তু কখনো একশ' পর্যন্ত রোগী থাকে। বাড়াবার চেষ্টা চলছে। এখানে কাজ করতে এসে দেখলাম, সার্জারির কাজের অসম্ভব চাহিদা;

কিন্তু আমাদের মধ্যে ঐ যোগ্যতা কারো নেই। অথচ অনেক কাজ করা দরকার এবং তার জন্য সার্জারিটা ভাল করে শেখা দরকার। আমরা যা কাজ জানি তা দিয়ে এখানকার অনেক কাজ ভালভাবে করা সম্ভব নয়। তখন নিজেদের মধ্যে তর্ক শুরু হল, এর সমাধান কী? মানুষ সমস্যা নিয়ে আমাদের কাছেই আসছেন, আর আমরা তাদের জন্য কিছু করতে না পেরে এদিক-ওদিক পাঠিয়ে দিচ্ছি। এতে তারা কী ভাবে হয়রান হচ্ছে তাও চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি।"

সোমা জানতে চায়, "এখন এখানে সব কাজ হয়।"

অভী হাসে, "পাগল হয়েছো!"

তারপর একটু থেমে আগের কথার খেই ধরে বলে, "তখনই আমরা বুঝলাম এত কম ক্ষমতা-সামর্থ্য দিয়ে আমাদের পক্ষে একটা হাসপাতাল চালানো মুশকিল। অনেক জরুরি রোগী আসছে, তাদের আমরা সাহস করে কিছু করতে পারছি না। তখন আমরা ভাবলাম, মাঝে মাঝে কলকাতায় গিয়ে ট্রেনিং নিয়ে আসা যায় কিনা। এইরকম অনেক ভাবনাচিন্তার মধ্যে দিয়ে আমরা শেষতক বিষয়টা সিদ্ধান্ত নেবার জন্য নিয়োগীজীর ওপর ছেড়ে দিলাম। তিনি পরিষ্কার বলে দিলেন, আপনাদের কাউকে পাশকরা সার্জেন হতে হবে, তাতে যত কষ্টই হোক। সুতরাং আমাকে দায়িত্ব দেওয়া হল। আমি ভোপালে চলে গেলাম, পাশ করে এখানে চলে এলাম।"

সোমা হাসে, "যাক্ তাহলে শেষ পর্যন্ত তোমাদের মনোভাব পাল্টেছে। আমার স্পষ্ট মনে আছে, আগে তোমরা বিশেষজ্ঞ তৈরি হওয়াকে বুর্জোয়া উচ্চাকাঙ্ক্ষা এইসব বলে ব্যঙ্গ করতে; কিন্তু আজকের যুগে বিশেষজ্ঞ না হয়ে উপায় কী, তুমি তো কাজই করতে পারবে না।"

অভী একটু চিন্তামগ্ন হয়, "বিষয়টা অত সহজ-সরল নয়, অন্তত তুমি যেমন সহজ করে ভাবছো অতখানি সহজ নয়। এ ব্যাপারে এখানে আমরা দেখেছি যা অগ্রাধিকার পায় তা হল, সংগঠনের প্রয়োজনটা কী! কিন্তু মানতেই হবে, এই সমস্ত ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি কাজ করতে চায় তার প্রয়োজনকে যদি সংগঠনের প্রয়োজনের সঙ্গে না মেলানো যায় তা হলে কোন কাজই শেষ পর্যন্ত টিকে থাকে না। নিজেদের মধ্যে একটা অসম্ভব বিশৃঙ্খলা শুরু হয়ে যায়। কাজের তুলনায় ঐসব সমস্যা সামলাতে অনেকখানি শক্তি ক্ষয় হয়।"

সোমা হাঁ করে তাকিয়ে থাকে, "কী রকম!"

অভী এই কথাগুলো অনেককে বলে নিজেকে যেন প্রস্তুত করে রেখেছে, তাই সোমাকে বলে যেতে তার কোন অসুবিধা হয় না, "হ্যাঁ, আমরা এই ব্যাপারে নিয়োগীজীর সঙ্গে দীর্ঘদিন কথা বলেছি। সুতরাং এখানে তাঁর কথা তোমায় বলতে পারি। এ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য ছিল অত্যন্ত পরিষ্কার। যেমন তুমি যদি হিসাব কর তাহলে অনেকগুলি স্তরে আমাদের কাজ হয়। যেমন ধর প্রথমে আছে পার্টি, তারপর আছে গণ-সংগঠন, তারপর আছে আমাদের কাছাকাছি

ংগঠন, তাদের সঙ্গেও কর্মসূচিভিত্তিক আমাদের একটা সম্পর্ক আছে, তাদের সঙ্গে বহু সময় ক্য তৈরি হবে আবার লড়াইও থাকবে। তারপর বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে কাজ রয়েছে। এইভাবে হসাব করলে দেখা যাবে, আমরা যেন সমস্ত সমাজটাকে ধরে ফেলতে চাইছি। উদ্দেশ্য কিন্তু একটাই, খেটে খাওয়া মানুষদের সংগ্রামকে তীব্রতর করা, তাদের শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভাষা যুগিয়ে যাওয়া। কিন্তু এই কাজের জন্য যত বেশি সংখ্যক ভাল মানুষদের তুমি তোমার কাছাকাছি টানতে পার ততই ভাল।"

সোমা গাল হাত দিয়ে বসে দীর্ঘশ্বাস ফেলে, "এ বেশ কঠিন কাজ।"

অভী হাসে, "ঐজন্যে তো মার্কস এই কাজটা করার জন্য কামিয়েনিস্ থুড়ি কমিউনিস্টদের দায়িত্ব দিয়েছেন, যাঁরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ। তাঁর ধারণা ছিল বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীরা একদিন সেখানে পৌঁছে যাবেন। মার্কস তাঁর জীবনের শেষের দিকে একেই গ্র্যান্ড পার্টি বলতেন। ভাবলে এটাও হচ্ছে একটা বড় সংগঠন, এখানে কে কতখানি কাজ করবেন, নিজেকে এই কাজের জন্য উৎসর্গ করবেন, তা তিনিই ঠিক করবেন। আর অনেক সময় অবস্থা-পরিবেশ আমাদের এই কাজ করতে উৎসাহিত বা নিরুৎসাহিত করে একথাও অস্বীকার করা যায় না। মোদ্দা কথাটা হল আদর্শ, যে যেমনভাবে আদর্শকে ধরে রাখতে পারে, যে যেমনভাবে এর জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে পারে।"

সোমা বিছানায় আঙ্গুল দিয়ে আঁক কষে নিজে বোঝার জন্য বলে, "তাহলে পেঁয়াজের খোলসের মত অনেকগুলো বৃত্ত হল, একেবারে ভেতরে ছোট বৃত্ত, তাকে ঘিরে বড় বৃত্ত, তাকে ঘিরে — বেশ!"

অভী তার দিকে প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে, "হ্যাঁ, খোসা ছাড়াও আর চোখের জল ফেল। এখন ধর, এই সংগঠনকে চালাবার জন্য এর অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে একটা তালিকা তৈরি করা হল। সেখানে যেটা আগে প্রয়োজন সেটা আগে করতে হবে এবং তার জন্য আমরা নিজেদের কাজে লাগাব। আবার অন্যদিকে বহু সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে, গুণী মানুষ, কাজ জানা মানুষ আমাদের সংস্পর্শে আসছেন। তারাও হয়তো এ ব্যাপারে কিছু কাজ করতে চান। সুতরাং তাদেরকেও আমরা দূরে সরিয়ে রাখতে পারি না। তাদের কাছে আমরা আবেদন করি, ক্ষমতা অনুযায়ী যতটুকু যা পারেন খেটে খাওয়া গরিব মানুষদের স্বার্থে কাজ করুন। তবে এটাকে মেলানো বা সমাধান করা অত সহজ ব্যাপার নয়, একথাও মানি।"

সোমা দীর্ঘশ্বাস ফেলে যোগ করে, "কিন্তু প্রবল শত্রুতার বিরুদ্ধে নিজেদের টিকিয়ে রাখতে হলে এছাড়া আর কোন উপায় আছে কী?"

অভী মাথা নাড়ে, "একটা উদাহরণ দিচ্ছি তোমায়, এখানে হাসপাতাল তৈরির ব্যাপারে কেমন সমস্যায় মুক্তিমোর্চাকে পড়তে হয়েছে। প্রথম কথা, এখানে চিকিৎসার ব্যবস্থা এত খারাপ যে একটা হাসপাতালের চাহিদা দীর্ঘদিন ছিল। আর জানো তো আমাদের চিকিৎসায় জন্য কী বিপুল পরিমাণে খরচ হয়। এখন প্রশ্ন হল, আমরা কতখানি কাজ এখানকার

মানুষজনদের দিতে পারি। মানুষের চাহিদা তো অনেক; কিন্তু আমাকে দেখতে হবে কোন্‌টা আমায় আগে করতে হবে, আর সেটা হবার পর আমার সামর্থ্য থাকলে তবে আমি পরের ধাপে যাব। তারপর রোগচিকিৎসা আর রোগপ্রতিরোধের মধ্যেও দ্বন্দ্ব রয়েছে।"

সোমা হাত নাড়ে, "এখানটায় একটু বাধা দিচ্ছি, এটা একটু বুঝিয়ে বল।"

অভী হাসে, "তুমি কী আমাদের নিয়ে বই লিখবে নাকি? এত আগ্রহ তোমার। যাক্ যা বলছিলাম, আমাদের অভিজ্ঞতা থেকেই আমরা বুঝি— এখানে পেটের রোগে যে প্রচুর বাচ্চা মারা যায়, বহু মানুষ দৈহিকভাবে অক্ষম হয়ে পড়ে, তার একটা বড় কারণ পরিষ্কার পানীয় জলের অভাব। সুতরাং তুমি কত ওষুধ দিয়ে এর চিকিৎসা করবে। তাছাড়া দেখা গেছে ডায়ারিয়াতে যদি শুরুতে লবণ-জলের শরবত খাওয়ানো যায় তাহলে একটি শিশুও মরবে না। এখন এসব তো দীর্ঘদিনের বঞ্চনা, অশিক্ষার ব্যাপার। এ তুমি চিকিৎসা করে কতটুকু ঠিক করবে। এ ব্যাপারে রোগপ্রতিরোধই আসল কথা। এর জন্য পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু তার জন্য প্রচুর সামর্থ্য দরকার। সেখানেও সামর্থ্য মানে শুধু সংগঠনের সামর্থ্য হলেই চলে না, কাজ করার জন্য দক্ষ মানুষজন চাই, তাদের কাজের আন্তরিকতা থাকতে হবে, তারা একনিষ্ঠ হবে। নইলে সংগঠন চাইলেই সবকিছু করতে পারে না। আবার দেখা যাচ্ছে, শুধু রোগপ্রতিরোধের কচকচানিতে মানুষ সন্তুষ্ট নয়। তারা চিরকাল দেখে এসেছে চিকিৎসা মানে নাড়ি টিপে ডাক্তারের ওষুধ দেওয়া বা পেট কাটা, সুতরাং মানুষের এই ধারণা তুমি রাতারাতি পাল্টে দিতে পার না।"

সোমা প্রশ্ন করে, "এ দুটোকে তোমরা মেলালে কী করে?"

অভী দীর্ঘশ্বাস ফেলে, "খুব কঠিন কাজ; কিন্তু তারপরেও দেখা যায়, যে দক্ষ মানুষজনদের আমরা পাচ্ছি তারা হয়তো এখানে কাজ করে তৃপ্তি পাচ্ছেন না। হয়তো তারা মনে করছেন সব দিক থেকে তাদের পাওনা আরও বেশি অর্থাৎ তারা এখান থেকে যা পাওয়ার কথা ভেবেছেন তা তারা পাচ্ছেন না। জানবে, এই ধরনের বহু সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম টানাপোড়েন সংগঠনের মধ্যে কাজ করে চলে। ফলে এমন দেখা যায়, বহুক্ষেত্রে 'ছোট আমি', 'বড় আমি'র থেকে বড় হয়ে ওঠে!"

সোমা হাসে, "এও তো সেই আদর্শবোধের লড়াই।"

আনমনা অভী বলে চলে, "অনেক ভেবে দেখেছি, এখানে কে ভুল কে ঠিক এ বিচার করা যুক্তিহীন কারণ প্রতিটি মানুষের কাজের, জীবনের একটা হিসাব তার নিজের কাছে থাকে। অন্তত সেই মুহূর্তে না থাকলেও পরে সে নিশ্চয়ই এ ব্যাপারে হিসাব করে। এই হিসাবের জন্য মনের মধ্যে সব থেকে বেশি কাজ করে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারবোধের সঙ্গে আদর্শের টানাপোড়েন। কার যে কোথায় কখন তার ছিঁড়ে যায়, তা বোঝা বেশ মুশকিল। নিয়োগীজীর সঙ্গে মাঝে মাঝে অন্তরঙ্গ কথা বলে দেখেছি তো, তিনি এইসব ব্যাপারে অসম্ভব ভাবতেন। তাঁর সংগঠনের প্রতিটি ঘনিষ্ঠ মানুষজনের তিনি যেন চুলচেরা মনস্তত্ত্ব

বিশ্লেষণ করতে পারতেন।"

সোমা হেসে বলে, "তাঁর ভুল হত না?"

অভী যোগ করে, "অবশ্যই তাঁর ভুল হত। তিনি ভুল স্বীকারও করতেন। কিন্তু মানুষটা এতখানি মানবিক ছিলেন যে কেউ তাঁর ধারে-কাছে পৌঁছাতে পারত না, তাঁকে দোষারোপ করা তো দুরের কথা। আর নিজে অসম্ভব পরিশ্রম করতে পারতেন। ফলে কোন কাজের ব্যাপারে অন্যের ওপর নির্ভরশীলতা ছিল তাঁর অনেক কম। তারপর কোন কাজ করার যদি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তাহলে তা করতে হবে, কোন অজুহাত তিনি শুনবেন না। কেউ না করলে তিনি একা নিজেই করবেন। এর জন্য তিনি কাউকে দোষারোপ করবেন না। সবার ক্ষমতা যে সমান নয় — এই কথাটি তিনি মানতেন। আর একটা বিষয় তিনি অসম্ভব জোর দিতেন তা হচ্ছে নিজেরা ভেবে সমস্যার সমাধান করুন, আপনার সমস্যা আপনারই, অন্যের ওপর ভরসা করবেন না।"

সোমা প্রায় স্বগতোক্তির মত বলে ওঠে, "অপূর্ব!"

অভী হাসে, "হ্যাঁ, যেমন কোন একটি সমস্যা নিয়ে হয়তো তাঁর কাছে গেছি, উনি বললেন, আপনারাই ভাবুন না কী ভাবে এটার সমাধান হতে পারে। আপনারা চেষ্টা করলে ঠিক এর সমাধান বার করতে পারবেন, আমায় কী করতে হবে বলুন আমি করে দিচ্ছি। তারপর সমস্যাটা সমাধান করতে গিয়ে দেখা গেল, সব থেকে কঠিন কাজটাই তিনি হয়তো করতে চাইলেন। এর ফলে তাঁর কাছে সমস্যা নিয়ে যেতে আমাদের সঙ্কোচ হত। শুধু যেটা দেখতাম আমাদের দ্বারা হবে না, তাঁকে নাক গলাতেই হবে শুধু সেই অংশটুকু বলতাম। এইভাবে আমাদের এখানে কাজের একটা চমৎকার পরিবেশ তৈরি হয়ে গেছে। আর নিয়োগীজী কদাচ হাসপাতালে আসতেন, নিজের চিকিৎসা প্রথমে উনি নিজে করতেন। কিছু বলতে গেলে বলবেন, এদেশের ক'টা মানুষের চিকিৎসা আপনারা করেন। এ কথা শুনলে আশ্চর্য হবে, তাঁর বাচ্চা ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত হাসপাতালের লাইনে দাঁড়িয়ে চিকিৎসা করায়।"

কী কথা যেন অভীর মনে পড়ে যায় হেসে ওঠে, "কত টুকরো টুকরো কথা মনে পড়ে যাচ্ছে, ছেলেমেয়েদের কথায় মনে পড়ল। ওনার বাচ্চাদের নাম ক্রান্তি, জিৎ, মুক্তি। আমরা বলতাম, নামগুলো খাসা হয়েছে। নিয়োগীজী হেসে বলতেন, দেখুন আমরা ভগবানের নাম যাতে সর্বক্ষণ মুখে মুখে রাখি সে জন্য আমাদের কারো নাম কৃষ্ণ কারো নারায়ণ কারো শঙ্কর। তাই ভেবে দেখেছি আমার কাছে যা ভগবানের মত —।"

সোমা হেসে ওঠে।

অভী খেই ধরে আবার বলে চলে, "হ্যাঁ যা বলছিলাম, বাইরের কোন প্রতিনিধি হয়তো হাসপাতাল দেখতে এসেছেন, উনি তাদের সামনেই এমন একটা ভাব দেখাবেন যেন আমরা ডাক্তাররা হাসপাতালটা চালাচ্ছি। আবার তারা যদি সবার মুখের সামনে সমালোচনা করে কোন কটু কথা বলেন, তবু নিয়োগীজী তা হাসিমুখে মেনে নেবেন। আমাদের রাগ হতো।

বলতাম, এভাবে ছেড়ে দিলেন কেন, নিজেরা করে দেখাক কতখানি করতে পারে, সমালোচনা করা খুব সহজ কাজ। উনি হেসে বলতেন, ওদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটা কী, ওরা যদি আমাদের দুটো খারাপ কথা বলে আনন্দ পায় বলুক। কিন্তু আমরা কোন প্রতিবাদ করলে ওরা আমাদের চরম ক্ষতি করে দেবে। বাইরে যা খারাপ প্রচার আছে তার সঙ্গে ওরা সুর মিলিয়ে আরও ব্যাপারটাকে ভয়াবহ করে তুলবে। বাইরের মানুষজন প্রভাবিত হবে! তবু এখানে এতদিন এইরকম সংগঠনের বড়কর্তা থাকা সত্ত্বেও জেনে রাখো এর মধ্যে নানা অসন্তোষ ছিল, এখন যার একটু একটু করে ফোঁড়ার মত মুখ দেখা যাচ্ছে। প্রধানত তাঁর জন্যেই সংগঠনটা টিকে ছিল, মজবুত ছিল; কিন্তু এ কথা তো বাইরের লোককে বলা যাবে না।"

সোমা হাঁ করে শুনছিল, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মন্তব্য করে, "অবস্থা কতখানি জটিল, তাই ভাবছি!"

অভী যোগ করে, "শুধু জটিল নয়, নির্মম এবং নিষ্ঠুর। অথচ এই অবস্থার মধ্যে থেকে তোমায় কাজ করে যেতে হবে। চোরের ওপর রাগ করে মাটিতে ভাত খাওয়ার কোন সুযোগ এখানে নেই। কী অসম্ভব ক্ষমতা লাগবে চিন্তা কর — একদিকে তোমায় রোমান্টিক হতে হবে এবং স্বপ্নও দেখতে হবে। অন্যদিকে তোমায় পাথর হয়ে যেতে হবে আবার যন্ত্রের মত অমানুষিক পরিশ্রম করতে হবে। তোমার অভিমানের কোন দাম নেই, যার কাছে যতটুকু কাজ পাও, আদায় করে নিতে হবে। এইসব যন্ত্রণার মধ্যে পড়ে মুখ ঘুরিয়ে তুমি যদি নিঃস্পৃহ হয়ে যাও, তাতে আখেরে মানুষের কোন লাভ হয় না। এখন আমার নিজের অবস্থাটা করে ফেলেছি অনেকটা সেই শামুকের মত, চলমান শামুক। এগিয়ে চলেছি, যেখানে বাধা পাচ্ছি গুটিয়ে যাচ্ছি, একটু সময় নিচ্ছি, আবার চলছি। কিন্তু কখনো একেবারে থেমে যাচ্ছি না বা বলতে পারো উল্টো পথে হাঁটছি না।"

সোমা জিজ্ঞাসু চোখে তাকায়, "একটা কথা বলি, এই যে রকম কাজ তোমরা করছো এটা তো সংস্কারধর্মী কাজ; নিয়োগীজীকে তো এখানকার লোক ছত্তিশগড়ের গান্ধী বলে। কিন্তু তোমাদের কাছেই শুনেছি, বিপ্লবী কাজ করতে হলে এসব সংস্কারের কাজ বাধার সৃষ্টি করে।"

অভী হাসে, "হ্যাঁ এক সময় আমরা এই ধরনের কথা বলেছি তখন ঐরকমই শিখেছিলাম। কথাটা এখনও যে মিথ্যে তা নয়; কিন্তু তার সবটুকু নির্ভর করবে পারিপার্শ্বিক অবস্থার ওপর। আমাদের সারা দেশের যা পিছিয়ে পড়া অবস্থা ও অসম বিকাশ তাতে এই সামাজিক অবস্থার মধ্যে মানুষের ভেতর গণতান্ত্রিক চেতনার উন্মেষ ঘটানো হচ্ছে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। একটা বিপ্লব করা নিশ্চয়ই কঠিন কাজ; কিন্তু সেই বিপ্লব করে তুমি এর কিছুই টিকিয়ে রাখতে পারবে না, যদি মানুষের মধ্যে ন্যূনতম গণতান্ত্রিক বিকাশ না ঘটে।" বাইরে কড়া নাড়িয়ে কে যেন ডাকে, অভী উঠে যায়।

কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে অভী বলতে শুরু করে, "একটা ব্যাপার কিন্তু আমরা আমেরিকা থেকে শিখেছি। শিল্পপতিও জানবে দু'ধরনের হয় — এক অভিজাত শিল্পপতি যারা বহুদূর দৃষ্টি নিয়ে দেশের কথা ভাবে। আর একদল হচ্ছে হঠাৎ গজিয়ে ওঠা ভুঁইফোঁড় কাউবয় শিল্পপতি যারা তক্ষুনি তাদের ভাগটা বুঝে নিতে চায়, দেশের ভবিষ্যতের কথা মাথাতেও রাখে না। আমাদের এখানে সব ঐ কাউবয় শিল্পপতি যারা মানুষের কথা একেবারে ভাবে না। অথচ মানুষই আমাদের কাছে সব থেকে বড় সম্পদ। অবশ্য মানুষ মানে তো এই ধরনের অশিক্ষিত, পশুর জীবনযাপন করা মানুষ নয়। এক সময় এখানে এমন অবস্থা ছিল যে প্রতিদিন পিপে পিপে মদ গিলে বহু মানুষ সর্বস্বান্ত হত।"

সোমা সায় দেয়, "ঠিকই এসব মানুষ তো সংগঠনের পক্ষেও অযোগ্য। এই মাতালদের দেখলে আমার বড্ড ভয় লাগে, একেবারে সহ্য করতে পারি না।"

অভী নিজের মত করে বলে যায়, "তাছাড়া এটা কী মানুষের জীবন! শারীরিকভাবেও এরা এত দুর্বল হয়ে পড়ে যে এইসব মানুষ সংগঠনের কোন কাজে লাগে না। আর এক বোতল মদের জন্য সব গোপন কথা ফাঁস করে দিতেও সে প্রস্তুত। কিন্তু আমরা তো একটু অন্য ধরনের মানবিক গুণসম্পন্ন মানুষ চাই। আর যদি দেখি মদের জন্য সেই মানুষই যেন ক্রমশ আমাদের দিগন্ত থেকে কর্পূরের মত উবে যাচ্ছে তাহলে ঐ মদই তখন আমাদের প্রবলতম শ্রেণীশত্রু। নইলে এই পৃথিবীতে স্বর্গরচনা করব আমরা কাদের দিয়ে, আর মানুষ না থাকলে সেই ভোগপ্রাচুর্যের স্বর্গ নিয়েই বা আমরা কী করব!"

সোমা স্থির দৃষ্টিতে তাকায়, "কিন্তু এইভাবে নতুন মানুষ তৈরি করতে হলে তো হাজার বছর লাগবে।"

অভী হাসে, "ঐসব হিসাব আমি জানি না আর তোমায় বলতেও পারব না। তবে এটুকু বুঝি, কোন্‌টা সংস্কারের কাজ আর কোন্‌টা বিপ্লবের কাজ — এই চুলচেরা বিচার করার কোন অর্থ নেই। আসলে আমরা সব সময় আমার জীবদ্দশায় কী ঘটল তার মানদণ্ডে সবকিছুকে বিচার করি। কিন্তু তোমাকে সব সময় খেয়াল রাখতে হবে, তুমি তোমার আসল লক্ষ্যে ঠিক আছ কিনা। সুতরাং প্রতিদিন তোমাকে তোমার কাজ করে যেতে হবে গরিব মানুষের স্বার্থে, যদি তোমার কোন আদর্শবোধ থাকে — যা পার যতটুকু পার। না পারলে অন্তত পক্ষে ক্ষতি করবে না, নিজে যে কাজই কর সেটা নিখুঁতভাবে করার চেষ্টা কর, সেটাও গরিব মানুষের স্বার্থে যাবে।"

একটু দম নিয়ে অভী আবার বলতে শুরু করে, "আর একটা কথা তোমায় বলি, মনে পড়ে গেল। নিয়োগীজীর এই মদ তাড়ানো আন্দোলনের ব্যাপারে নানা জনে নানা কথা বলেছে; কিন্তু তুমি গোর্কির 'মা'তে দেখবে প্রথম লাইনেই আছে, পাভেল মদ ছাড়ছে। অর্থাৎ কমিউনিস্ট হতে হলে প্রথম ধাপেই তোমায় এই গুণটি আয়ত্ত করতে হবে। এই বিষয়টা আমাদের দেশের কমিউনিস্টরা কোনদিনই বুঝতে পারল না। একজন ভাল মানুষ না হলে কোনদিন কমিউনিস্ট

হওয়া যায় না। যদি কোন কমরেড সর্বক্ষণ শুধু বিচার করে, হিসাব করে — এ আমাদের লোক, ও ওদের লোক, তাহলে সে তো কোনদিনই বৃহত্তর সমাজকে দেখতে পায় না। সেই কমরেড দিয়ে আর যাই হোক মার্কসবাদ হয় না। কারণ মার্কসকে বুর্জোয়ারা বলে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত-মানবতাবাদী।"

সোমা কিছু বলতে চাইছিল, অভী তাকে থামিয়ে দিয়ে বলে, "হ্যাঁ আর একটা কথা বলি। আমরা কাজ করতে গিয়ে ভুল করি। এ ব্যাপারে আমাদের বক্তব্য হল, ভুল যদি বুঝতে পারি তাহলে ভুল স্বীকার করতে হবে, আর তার সংশোধন করতে হবে। আর একই ভুল বার বার করা যাবে না। তাহলে ধরে নেওয়া হবে, হয় আমরা ভুল ধরতে পারিনি বা আমরা ভুল সংশোধনের ব্যাপারে মোটেই একনিষ্ঠ নই।"

এই পর্যন্ত বলে সোমাকে ইশারায় থামিয়ে দিয়ে অভী উঠে যায়।

ফিরে এসে সে দেখে, সোমা নিবিষ্ট মনে দেখে যাচ্ছে এলবামের ছবিগুলো — লাল ময়দানে নিয়োগীজী অন্তিমশয্যায় শায়িত। এই ছবিটাতে সোমার চোখ যেন আটকে গেছে। কখন অভী এসে তার পাশে দাঁড়িয়েছে তা সে খেয়ালও করেনি।

সোমা খেয়াল করতেই অভী বলে, "এই ছবিটার সঙ্গে আমার একটা অন্যরকমের স্মৃতি আছে। ঐ দূরে দেখো হাত নাড়িয়ে একটা বুড়ি যেন কী বলতে চাইছে। বুড়ি তখন নাকী সুরে চিৎকার করে বলছিল, জঙ্গলের পশু তোকে মারতে পারেনি; কিন্তু হায় রে অন্ধকারে শয়তান তোকে মেরে দিল! আমার কানে বুড়ির ঐ গলার সুরটা যেন এখনও বাজছে।"

সোমা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে, অভী বলে, "হ্যাঁ একবার একটা চিতাবাঘের সঙ্গে নিয়োগীজী লড়াই করেছিলেন জঙ্গলে। সে কাহিনী এখানে সবাই জানে। এখানকার চার পাহাড় — ঠিকাদার বা শিল্পপতি, তাদের ভাড়াটে গুণ্ডা, পুলিস আর রাজনৈতিক নেতা। এদের মিলিত আক্রমণে তাড়া খেয়ে নিয়োগীজী তখন গ্রামে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। পুলিস পেলেই তাঁকে গ্রেপ্তার করবে। তাই ভেক ধরতে হচ্ছে কখনো কৃষি-মজুর, কখনো ফেরিওয়ালা, কখনো ছাগল বিক্রেতা, কখনো জঙ্গল-মজদুর। ঐ সময় এক চিতাবাঘের আক্রমণের মুখে তিনি পড়েন।"

সোমার দীর্ঘশ্বাসটা যেন স্পষ্ট অভীর গায়ে লাগে, "কোন কোন মৃত্যু কত কঠিন হয়ে দাঁড়ায়! আমাদের ওখানে উনি একবারই গিয়েছিলেন। কী চমৎকার বক্তৃতা দিতে পারতেন, ছত্তিশগড়ী ভাষাটা কী চমৎকার রপ্ত করেছিলেন। আমার মনে আছে ক্রান্তি, ভ্রান্তি, শান্তি — এইসব নিয়ে পাক্কা আধঘণ্টা কাটিয়েছিলেন। আমরা একেবারে মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনেছি।"

অভী সমর্থনের সুরে বলে, "কবিতা লিখতেন তো, আদপে রোমান্টিক মানুষ, এমন একটা মজবুত আদর্শবোধ ছিল যা টপকে যাওয়া কারো পক্ষে সম্ভব ছিল না।"

তারপর সোমার ভঙ্গি দেখে অভী ঠাট্টা করে, "তুমি যেভাবে এলবামটা আঁকড়ে ধরেছো

তাতে মনে হচ্ছে তুমি আর এটা ছাড়বে না।"

সোমা হেসে ওঠে, "তুমি তো ভবঘুরে, এটা নিয়ে তুমি কী করবে।"

অভী দুষ্টুমির দৃষ্টিতে সোমার্ দিকে তাকিয়ে বলে, "মনে রাখবে কোন কোন জিনিস আমাদের মধ্যবিত্তদের কাছে সম্পদ হয়ে দাঁড়ায়। অর্থাৎ ধর আমি তো আর চিরকাল এইরকম বিপ্লবী থাকবো না। তখন আমার বিগত বিপ্লবী কর্মকাণ্ড মুখে বলা বা লেখার চেয়ে এই ছবিগুলির মধ্যে অনেক দামী হয়ে উঠবে।"

সোমা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বলে, "অন্তত তোমার তা প্রয়োজন হবে না।"

অভী তাকায়, "বৃথা বাক্য!"

সোমা তাকায়, "দেখো আজকের দিনে এমন একটি মানুষের কত প্রয়োজন ছিল।"

অভী স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে, "হ্যাঁ আজ যদি কেউ আমায় জিজ্ঞাসা করে এখান থেকে তুমি কী শিখলে? তাহলে আমার একটাই উত্তর, কেমন করে রোমান্টিক ভাবপ্রবণতা থেকে পরিণত জীবনবোধে পৌঁছাতে হয়। নিয়োগীজী যেন এটাই আমাদের শিখিয়ে দিয়ে গেলেন।"

অভী যোগ করে, "এখানকার নায়ক বীর নারায়ণ সিং-কে নিয়ে তিনি প্রথম শহীদ দিবস পালন করেন। মনে আছে ঐ সময় লাল ময়দানে বক্তব্য রাখেন, তার কয়েকটা কথা এখনও আমি অন্তর দিয়ে অনুভব করি। তিনি বলেছিলেন, এই ছত্তিশগড়ের জল মাটি বাতাস আমায় মানুষ করেছে তাই আমি মায়ের কাছে যেমন ঋণী তেমনি ছত্তিশগড়ের কাছেও ঋণী। মারা যাবার আগে এই মাতৃঋণ শোধ করে দিয়ে যাবো।"

সোমার চোখদুটি ছলছল করে ওঠে।

অভী বলে চলে, "কখনো কখনো দেশের অবস্থা দেখে যখন দুঃখ পেতেন তখন বলতেন আমরা এক একটা ক্ষুদ্র মানুষ আমাদের কী বা করার ক্ষমতা আছে! — এই সংগঠনই আমাদের আসল শক্তি! মানুষ যদি আমাদের না ভালবাসে আমাদের সঙ্গে না থাকে তাহলে বৃথাই আমাদের জীবন।"

তারপর কিছুক্ষণ থেমে অভী বলতে শুরু করে, "এই মানুষের ভালবাসার কথায় মনে পড়ছে। গতবার যখন নিয়োগীজী জেলে গেলেন তখন তার প্রতিবাদে এখানকার মানুষ হোলি বয়কট করল। এখানকার হোলিতে মানুষের কী উন্মাদনা হয় তা তো জানো? তারপর নিয়োগীজী জামিন পাওয়ার পর সেই হোলি চলল সারা দিনরাত ধরে।"

এলবামের ছবিগুলো উল্টাতে গিয়ে সোমার চোখ আটকে যায়, মুখ তুলে অভীর দিকে তাকায়, অভী চিনিয়ে দেয়, "এটা হচ্ছে একটা নির্মাণকর্ম — সাফাই অভিযান, এটা স্বেচ্ছাশ্রমে শহীদ হাসপাতাল তৈরি, এটা হেমন্ত পাঠশালা, এই হচ্ছে আমাদের জঙ্গল — এখানে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গার গাছ এনে নিয়োগীজী লাগিয়েছিলেন। বাংলার কেষ্টর কদম গাছও এখানে পাবে, তোমায় দেখাবো।"

সোমা মুচকি হাসে, "আমি দেখে এসেছি। একটা বুড়ো শম্বর বাঁধা আছে।"

অভী হাই তোলে, "হ্যাঁ ওটাও নিয়োগীজীর স্মৃতি। শম্বরটা তখন বাচ্চা, জঙ্গলে পথ হারিয়েছিল নিয়োগীজী নিয়ে এসেছিলেন।"

তারপর আঙ্গুল দেখিয়ে বলে, "এটা হচ্ছে আমাদের গ্যারেজ। এই গ্যারেজও নতুন ধরনের। এইরকম অসংখ্য নির্মাণকর্ম তুমি এখানে দেখতে পাবে। যেমন এটা তো আদিবাসী এলাকা, লোকেরা অসম্ভব মদ খায় এবং সব আজে-বাজে দেশী মদ। নিয়োগীজী এই মদ তাড়াবার জন্য আগে আমাদের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা করেছেন। মদ মানুষ কেন খায়, খেলে দেহের কী কী ক্ষতি হয়, ছাড়াতে গেলে কী কী অসুবিধা হতে পারে, এর চিকিৎসা কী — এইসব বিষয়ে তিনি একেবারে পড়ুয়ার মত নোট নিয়েছেন। পরে এ ব্যাপারে আলোচনায় তার বক্তব্য শুনে আমরা তো অবাক, আমাদের বিজ্ঞানের কথাগুলো কী চমৎকার ছত্তিশগড়ী রূপক দিয়ে অবলীলাক্রমে বলে যাচ্ছেন। আর তারই কিছু কিছু পরবর্তীকালে স্লোগান হয়ে গেল, কামগারদের বস্তিতে, দূর-দূরান্তের গ্রামে তা ছড়িয়ে পড়ল।"

বিছানায় শুয়েই সোমা বলে যায়, "আচ্ছা অভী, এসব জায়গায় এখনও জঙ্গলের রাজত্ব চলে, তাই নয় কী?"

অভী তখন কী একটা হাতের কাজ করছিল, সোমার দিকে মুখ তুলে তাকায়, "তার থেকেও অনেক অনেক খারাপ।"

তারপর হঠাৎ কী মনে পড়ে যাওয়ায় কলমটা গুটিয়ে নিয়ে সোমার দিকে তাকিয়ে বলে, "এখন আমার স্থির ধারণা হয়েছে, আমরা কথায় কথায় এই যে হিংস্রতা, নিষ্ঠুরতা এইসব বোঝানোর জন্য পশুদের আচরণের উদাহরণ দি-ই, তা অত্যন্ত খারাপ। আমি নিয়োগীজীকেও বলেছি, আপনি ঐ বাঘ কখনো ঘাস খায় না, আর বাঘের হিংস্রতা কখনো সংশোধন করা যাবে না, এইসব উদাহরণ দিয়ে শত্রুদের সঙ্গে বাঘের তুলনা একেবারে করবেন না।"

সোমা নড়েচড়ে বসে, "কেন এ কথা বলছ?"

অভী আনমনে তাকিয়ে থাকে, "দেখো জঙ্গলের একটাই নিয়ম আছে তা খাদ্য-খাদক সম্পর্ককে ঘিরে। এটা অস্তিত্ব রক্ষার ব্যাপার, তাই দেখবে পশুপাখিরা যে জায়গায় বাস করে সেখানে সে তার অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য তার মত করে মানিয়ে নেয়, যেটা তার বংশগতিতে রয়েছে তারপর সে এই ব্যাপারে লড়াই করে টিকে থাকে।"

সোমা হাসে, "আর এলাকা দখল?"

অভী খুশি হওয়ার ভঙ্গিতে বলে, "বেশ, এটাও মনে রাখবে, এই এলাকা দখল করার ব্যাপারে পশুদের কোন হিংস্রতা, নিষ্ঠুরতা নেই। এমনকি নিজের জাতের প্রাণী হলে এরা দাঁত নখও ব্যবহার করে না। এরা নিছক খেলাচ্ছলে অন্য প্রাণী মারে না, শুধু তাড়িয়ে দিতে পারলেই হল, তখন হারেম আর খাবারের ভাঁড়ারের দখল সে একাই পাবে।"

সোমা হাসে, "এখানেই বা তফাতটা কী? নিয়োগীজী ঐ চার পাহাড়ের এলাকায় ঢুকে

পড়েছেন, উৎপাত করছেন। তাদের লভ্যাংশে ভাগ বসিয়ে এইসব হাভেতে হাঘরেদের জন্য নানা ব্যবস্থা করছেন, তাদের তাতাচ্ছেন, কিছুতেই এখান থেকে নড়বেন না বলে সংসার পেতে ফেলেছেন। তাহলে এমন লোককে উপড়ে ফেলতে গেলে মেরে দেওয়া ছাড়া উপায়ই বা কী! সুতরাং পশু তার বুদ্ধি দিয়ে যা পারে করে। আর মানুষ তার বুদ্ধি দিয়ে বন্দুক তৈরি করেছে, সেটাই সে প্রয়োজনে ব্যবহার করবে। বাঁচার জন্য লড়াই আর যে যোগ্য সে-ই এখানে টিকে থাকার অধিকার পাবে। আমরা নিশ্চয়ই অযোগ্য, তাই নিয়োগীজীকে বাঁচাতে পারলাম না।"

অভী সোমার কথায় খুশি হয়, "আমি এই কথাটাই বলতে চাইছি, এক্ষেত্রে মানুষের উপমা কখনো পশু, দানব হতে পারে না, তার থেকেও অনেক বেশি খারাপ। ঠিকই ডারউইনের ঐ কথাগুলো স্লোগান বানিয়ে, মানুষের সমাজে প্রয়োগ করার জন্য বাজারে ছেড়েছিলেন স্পেনসার। কারণ তখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্য কোনদিন অস্তমিত হবে বলে কেউ বিশ্বাস করত না। তখন ব্রিটিশ পুরুষরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রাণী। কিন্তু আসলে ডারউইন কী বলতে চেয়েছিলেন তা আমাদের ভাল করে জানা দরকার।"

এই বলে অভী যেন গুছিয়ে কথাগুলো বলার জন্য পায়চারি শুরু করে, "উনি বলছেন, মরুভূমিতে একটি গাছ অস্তিত্ব রক্ষার জন্য মাটিতে লম্বা শিকড় চারিয়ে দেয়। এটা তার বাঁচার জন্য লড়াই। আবার কোন একটা পরিবেশে যখন খাবার অপ্রতুল, তখন সামান্য খাবারে ভাগ বসানোর জন্য দাঁত আর নখ দিয়ে প্রাণীরা প্রকৃতিকে রক্তাক্ত করে থাকে, আর সেখানে যে যোগ্য সে-ই টিকে থাকে। এর সঙ্গে মানুষের এই কুৎসিত ভয়ঙ্কর অমানবিক আচরণকে তুমি কী করে মেলাবে! বুদ্ধির জোরে কতিপয় দানবমন এই হাজার হাজার বছরের গড়ে তোলা সভ্যতাকে নয়-ছয় করে ফেলছে। মানুষের এই বুদ্ধি একদিকে তার কাছে যেমন আশীর্বাদ তেমনি আবার অভিশাপও। এটাও একটা ডায়ালেক্টিকস।"

আনমনা সোমাকে দেখে অভী বলে, "বুঝলে, নাট্যকার বার্নার্ড শ'য়ের একটা মন্তব্য আছে, এই বুর্জোয়া সভ্যতার দুটি নিকৃষ্টতম উপহার হল, রোমান্টিক প্রেম আর বন্দুকের মশলা।"

সোমা তাই শুনে হেসে ওঠে, "যে দুটো জিনিসই তোমাদের বিপ্লবে প্রচুর পরিমাণে লাগে।" তারপর সে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে বসে।

বাইরে অস্বাভাবিক জোরে কেউ দরজায় ধাক্কা দেয়। এতখানি জোরে যে সোমা চমকে ওঠে। অভীও তড়াক করে লাফিয়ে উঠে দরজায় দিকে এগিয়ে যায়, দরজা খুলে কার সঙ্গে কী কথা বলে, তারপর দ্রুত চটিটা পায়ে গলিয়ে বলে, "আমি একটু আসছি।"

ঘটনার আকস্মিকতায় সোমা কিছু বোঝার আগেই অভী বেরিয়ে যায়। সোমা উঠে দাঁড়ায়, চাঁদনীকে কাছে ডেকে ইশারায় ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করে। বোঝা যায়, সোমার মনের মধ্যে এই ঘটনার জন্য ক্রমশ একটা টেনসন তৈরি হচ্ছে। চাঁদনী বুঝে ফেলে, তারপর সে ঘটনাটা

জানার জন্য বাইরে বেরিয়ে যায়। সোমা তাকে বাধা দেবার আগেই চাঁদনী চড়ুই পাখির মত যেন উড়ে যায়।

ঠিক সেই মুহূর্তে কী করা উচিত এটা বুঝতে না পেরে সোমা হতভম্বের মত কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। অল্পক্ষণের মধ্যেই চাঁদনী এসে ঢুকে জানালার পর্দা সরিয়ে সোমাকে দেখতে ইঙ্গিত করে। সোমা জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখে হাসপাতালের সামনে একটা অস্বাভাবিক ভিড়, মানুষের জটলা, চিৎকার-চেঁচামেচি; কিন্তু অভীকে দেখা যায় না। সোমা আরও ভয় পেয়ে যায়।

নিজেকে শান্ত করার জন্য, চাঁদনীকে কী একটা কাজের নির্দেশ দিয়ে সোমা চুপ করে বিছানায় এসে বসে। নিজেকে বোঝাবার চেষ্টা করে, কোন বড় গোলমাল নিশ্চয়ই নয়। তাছাড়া অভী অনেক শক্ত-সমর্থ। তাকে নিয়ে দুশ্চিন্তার কিছু নেই। যতই সে নিজেকে এ কথা বোঝাক তবু সে খেয়াল করে, দুশ্চিন্তা তাকে ছেড়ে যাচ্ছে না। তাই চেষ্টা করেও কোন কাজে সে মন দিতে পারে না। ঘরের মধ্যেই সে পায়চারি করে।

একবার বাথরুমে যায়, জল খায়, একবার বাইরের বারান্দায় পা দেয়; কিন্তু সেখানেও শান্তি পায় না। আপনমনে ভাবে তাহলে সে যদি এখানে থাকত ঠিক এমনই কষ্ট পেত। কারণ অভী তো চুপচাপ বসে থাকার ছেলে নয়। মাঝে মাঝেই সে এমন গোলমালের মধ্যে পড়ত। তাছাড়া ওর কাজের ধরনই হচ্ছে এই। আর ঘরের মধ্যে সোমা ভেবে আধমরা হত। অথচ দুশ্চিন্তায় ভেবে ছটফট করা ছাড়া তার করারও কিছু নেই। বিশেষ করে এমন একটা সম্পূর্ণ অপরিচিত পরিবেশে।

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে সোমার। এও কী অসম্ভব অবস্থা। তখন নিজের মনেই সে হেসে ফেলে নিজেকে সান্ত্বনা দেয়, আমরা চাইলেই ভাল কিছু পেতে পারি না, তার জন্য মূল্যও দিতে হয়।

তারপর নিজে আরও কী ভেবে সান্ত্বনা পায়, হয়তো দুশ্চিন্তা করার মত কিছুই ঘটেনি। সে শুধু শুধু দুশ্চিন্তা করছে। কিন্তু যতক্ষণ না সে অভীকে দেখছে স্বস্তি পায় না।

আরও কিছুক্ষণ পর প্রায় বিধ্বস্ত অবস্থায় অভী ঢোকে। সোমার চোখমুখ দেখে সে হাসে, "খুব দুশ্চিন্তায় ফেলেছিলাম নিশ্চয়ই। কী আর করা যাবে, এসবও আধুনিক সভ্যতার দান, চতুর্দিকে এত মাফিয়া তৈরি হয়েছে, তুমি চাইলেও তোমায় শান্তিতে স্বস্তিতে থাকতে দেবে না।"

বিষণ্ণমুখে সোমা হাসে, "মারামারি করলে নাকি?"

অভী বাথরুমের দিকে যাবার জন্য পা বাড়ায়, "না না, আমায় কিছু করতে হয়নি, আমাদের কমরেডরাই এ ব্যাপারে যথেষ্ট ব্যবস্থা করেছে। তারা শুধু আমার নির্দেশের অপেক্ষায় ছিল। আমি শুধু অবস্থাটা সামলাবার চেষ্টা করেছি।" এ কথা বলে সে হাসে, "নিয়োগীজী না থাকলেও এখনও তিনি আছেন!"

অভীর জামাটার দিকে আঙ্গুল তুলে অবাক হয়ে সোমা বলে, "জামাটা ছিঁড়লো কী করে?"

অভী তখন খেয়াল করার ভঙ্গিতে দেখে, সত্যি বটে, জামাটা অনেকখানি ছিঁড়েছে, "এ ধস্তাধস্তির ফল। তাও ভাল জামার ওপর দিয়ে গেছে, আর একটু হলে চশমাটাই ভেঙ্গে যাচ্ছিল। আমি এক্ষুনি আসছি।" বলে সে বাথরুমের দরজা বন্ধ করে।

হঠাৎ বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে সোমাকে সচকিত করে অভী বলে ওঠে, "আমার এই মুহূর্তে শশীশেখরের কথা মনে পড়ছে।" এই বলে সে দুহাত তুলে কীর্তনের ভঙ্গিতে গাইতে থাকে, 'ওহে চঞ্চল, হে চিরন্তন, ভুজবন্ধনে ফিরে এস।' আবার সে বাথরুমে ঢুকে যায়।

সোমা হেসে, কেশে বলে, "উন্মাদ।"

চাঁদনী হাঁ করে এদের দেখছিল, সোমা ইঙ্গিতে তাকে বোঝাবার চেষ্টা করে ধারে-কাছে কোথাও সুচ-সুতো আছে কিনা। চাঁদনী কিছু না বলে বেরিয়ে যায়।

অভী এসে স্থির হয়ে বসতেই প্রশ্ন করার দৃষ্টিতে সোমা তাকায়, "আচ্ছা নিয়োগীজীর এই সংঘর্ষ-নির্মাণ কী ডায়ালেকটিকস, আমাদের ওখানে অনেকে এই কথাই বলে।"

অভী হাসে, "হ্যাঁ তা বলতে পারো, নিয়োগীজীর ডায়ালেকটিকস। তিনি এইভাবে বুঝতেন এবং অন্যদের বোঝাতে চাইতেন। আসলে আমাদের বামপন্থী রাজনীতিতে দেখবে দীর্ঘদিন অন্যায়-অত্যাচারের শিকার হয়ে প্রতিবাদ-প্রতিরোধের সব ভাষাই হয়ে ওঠে কেমন যেন নেতিবাচক। মানুষকেও দোষ দেওয়া যায় না। এতদিন ধরে এত অত্যাচার তারা সহ্য করেছে যে এই একঘেঁয়ে নেতিবাচক ভাষা ছাড়া আর কিছু যেন তাদের দেহ থেকে নিষ্কাশিত হয় না। এই ব্যাপারেই নিয়োগীজীর প্রতিবাদ ছিল। তিনি বলতেন, আমরা তো নতুন জীবন চাই।"

সোমা হেসে তার দিকে তাকায়, "অন্য মানুষ চাই!"

অভী মাথা নাড়ে, "অবশ্যই, আর সেই মানুষ, যে জীবন প্রতিষ্ঠিত করার জন্য লড়াই করতে চাই, তার সবটুকু নেতিবাচক হবে কেন? জীবন তো মৃত্যুর বিপরীতে দাঁড়িয়ে আছে আর কথায় বলে, মরার বাড়া গাল নেই। তাই আমরা যে সবুজ জীবনের স্বপ্ন দেখি, তার নির্মাণকর্মও এই লালসংঘর্ষ বা প্রতিবাদের একটা ধরন।"

সোমা দু' হাতে বালিশ চাপা দিয়ে বলে, "এ দুটো মেলানো কী সহজ কাজ?"

অভী দুহাত তুলে বলে, "আরে এই রঙে আর কী তফাত, এ তো জীবন থেকে, রোদ্দুর আর আকাশ থেকে গড়ে ওঠা আমাদের চেতনার রঙ। এর থেকেই বেরিয়ে আসবে আমার সাহস, আত্মবিশ্বাস, মনোবল। এটা যে কত বড় সত্যি কথা তা তুমি এই শহীদ হাসপাতালের চত্বরে দাঁড়িয়েই বুঝতে পারবে। দেখতে পাবে শ্রমিকরা, কৃষকরা একে অপরকে দেখাচ্ছে,

এটা আমাদের হাসপাতাল, আমরা এটা তৈরি করেছি। আমার জীবনে এই দৃশ্য দেখা এক মস্ত বড় পুণ্য পাওনা বলে মনে হয়। ধর না, আমাদের যে অসংখ্য নতুন নতুন ঝক্‌ঝকে প্রতিষ্ঠানগুলি তৈরি হয় তা তৈরি করতে কত অসংখ্য শ্রমিক তাদের জীবন যৌবন সর্বস্বান্ত করে দেয়।"

সোমা চুল বাঁধতে বাঁধতে হাসে, "এই কথাটা তুমি আগেও বলতে।"

অভী মাথা নাড়ায়, "ঐ প্রতিষ্ঠানগুলি কাদের প্রতিষ্ঠান? সমস্ত বিত্তবান মানুষদের প্রতিষ্ঠান। আমাদের গরিব মানুষেরা কী কোনদিন ভাবতে পারে একটা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, একটা কারখানা তার সম্পত্তি, তারই শ্রমে তৈরি। মার্কস, শ্রমিকের যে এলিয়েনেশনের ধারণা সম্পর্কে লিখেছিলেন তাকে নিয়োগীজী এইভাবে বুঝতেন, আর শ্রমিকদেরও ঠিক সেইভাবে উৎসাহিত করতেন।"

সোমা চিরুনিটা চুল আছড়াবার জন্য তুলে নিয়ে চুলে দেয়, "হ্যাঁ মনে পড়ছে, তাঁর আধা-যান্ত্রিকীকরণের তত্ত্বের ব্যাপারটা আমাদের কাছে এইভাবে বুঝিয়েছিলেন। তাঁর কথাগুলো এখনও আমার কানে বাজে — যন্ত্র আসবে, বিজ্ঞান আসবে, প্রযুক্তি আসবে; কিন্তু তা যেন মানুষকে সঙ্গে করে নিয়ে আসে। মানুষকে বাদ দিয়ে নয়। একটি যন্ত্র যদি একশোটা মানুষের, তার পরিবারের পেটের ভাত কেড়ে নেয় তাহলে এর বিরুদ্ধে আমরা মরণ পণ লড়াই করব।"

অভী সায় দেয়, "ঠিক এই কাণ্ড ঘটেছে বস্তারের বাইলাডিলায়, কেন্দুরীলে। যেখানে প্রথম সংগঠন করতে গিয়ে প্রচলিত ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন সম্পর্কে নিয়োগীজীর মোহভঙ্গ হল, লড়াইয়ের দৃষ্টিভঙ্গি একেবারে পাল্টে গেল। ওখানকার সব লোহাপাথর জাপানে বিক্রি হয়।"

তারপর কিছুক্ষণ চিন্তা করে প্রায় স্বগতোক্তির মত অভী বলে চলে, "আসলে যন্ত্রের অনেক সুবিধা। সে থাকার ঘর চায় না, খাবার চায় না; জল চায় না, বিদ্যুৎ চায় না, হাসপাতাল চায় না, ছেলেমেয়েদের স্কুল চায় না, এসবের জন্য ধর্মঘট করে না। অথচ মানুষকে দিয়ে কাজ করালে কত আপদ, তাই কেন ওরা যন্ত্র চাইবে না।"

সোমা আগের কথার খেই ধরিয়ে বলে, "আচ্ছা, বাইলাডিলায় কী হয়েছিল?"

অভী তার কথায় ফিরে আসে, "সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত রাশিয়া খনি থেকে লোহাপাথর তোলার জন্য তাদের কিছু ফেলে দেওয়া যন্ত্রপাতি আমাদের কিনতে বাধ্য করে। ক্রমে দেখা গেল, এই যন্ত্রগুলি দশ হাজার শ্রমিকের ভাত কেড়ে নিয়েছে। এই শ্রমিকেরা তাহলে তাদের পরিবার নিয়ে কোথায় যাবে! কিন্তু কর্তৃপক্ষ হুঁশিয়ারি দিল, আমরা দেশে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের ব্যবস্থা গড়ে তুলছি, সুতরাং তার স্বার্থে তোমাকে কোমরে বেল্ট বাঁধতে হবে।"

সোমা জিজ্ঞাসা করে, "আচ্ছা ওখানে কাদের সংগঠন ছিল?"

অভী যেন তাতে খুব আগ্রহী নয়, "সবার ছিল, সব দলের ছিল। কিন্তু সব সংগঠনকে উপেক্ষা করে অর্ধ উলঙ্গ মানুষের দল ভুখা পেটে অবস্থান শুরু করল। পরিণামে তাদের

মেয়েদের বলাৎকার করা হল, দশ হাজার ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হল, আন্দোলনকারীদের গুলি করে হঠিয়ে দেওয়া হল। এই হল প্রগতিশীল দেশের যান্ত্রিকীকরণের নমুনা!"

সোমা জিজ্ঞাসা করে, "এখানে কোথাও হয়নি!"

অভী কেশে গলা পরিষ্কার করে, "এখানে রাজহারায় যন্ত্র দিয়েই সব কাজ করা হয়; কিন্তু দল্লী খনিতে এই কাজ মানুষে করে। তাই বাইলাডিলার ঘটনার পর এখানকার শ্রমিকরা সতর্ক হয়ে গেল। তারা বুঝতে পারল, এবার তাদের ওপর খাঁড়া ঝুলছে। কিন্তু এখানে শ্রমিকরা নিয়োগীজীর নেতৃত্বে সচেতন ও সংগঠিত তাই ওরা পারেনি। শ্রমিকরা মরণপণ লড়াই করেছে। ওরা ওদের সর্বশক্তি দিয়ে এই যান্ত্রিকীকরণের প্রতিরোধ করেছে আর সফলও হয়েছে। এর থেকে বোঝা যায়, আমরা যে বলি কিছু করা যায় না তা ঠিক নয়। মানুষের সচেতন, সক্রিয় প্রতিরোধের কাছে সবাই হঠে যায়।"

সোমা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, "কিন্তু মানুষকে ঐরকম প্রতিরোধ করার মত সচেতন, সংগঠিত করে তুলতে হবে তো।"

অভী মাথা ঝাঁকায়, "কী জানি, কেউ বাইরে থেকে এসে এদের সচেতন করে দেবে, না এরা নিজেরাই ক্রমে সেই শক্তিতে বলীয়ান হয়ে উঠবে। যখন ভাবি, খুব ধাঁধা লাগে। যেমন ভারতবর্ষের ট্রেড ইউনিয়নের ইতিহাস যদি তুমি দেখো তাহলে দেখবে প্রতিটি ক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত নেতারা তাদের শ্রেণীস্বার্থ দেখেছে।"

সোমা হাসে, "ঐ দ্রোণের মত একলব্যদের সঙ্গে আচরণ করেছে!"

অভী আঙ্গুল তুলে বলে, "কিন্তু আমি তোমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছি, এই নিষাদের দেশে নিয়োগীজী কিন্তু আমাদের এই কালচারের মূর্ত প্রতিবাদ। নইলে এখানকার সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা মধ্যবিত্ত আর এইভাবে বাইলাডিলার ঘটনার মত তারা শ্রমিকদের সঙ্গে বেইমানি করেছে।"

তারপর অভীর যেন কী কথা মনে পড়ে যায় সে নড়েচড়ে বসে, "ভাল কথা মনে করিয়ে দিয়েছো। আমি ভাবি, আজ নিয়োগীজী আমাদের মধ্যবিত্তদের এই কলঙ্কের হাত থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন। নইলে শ্রমিকদের কাছে এটা স্বতঃসিদ্ধ হত, যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাবণ।"

তবু সোমার যেন কিছু কথা মনে পড়ে যায়, "বলছ বটে; কিন্তু পৃথিবীতে সব জায়গায় বাঁচার লড়াইয়ে এই দ্রোণরাই একলব্যদের উদ্ধারের জন্য এগিয়ে এসেছে। তুমি ক'টা উদাহরণ দিতে পারবে যেখানে শুরুতেই শ্রমিকদের মধ্যে থেকে কমিউনিস্ট তৈরি হয়েছে।"

অভী সন্ধানী দৃষ্টিতে সোমার দিকে তাকায়, হাসে, তার এ কথাও সত্য, সুতরাং মেনে নেওয়া ছাড়া, এর কোন প্রতিবাদ হয় না।

তবু কোথাও একটা সূক্ষ্ম প্রতিবাদ যেন থাকে, "কিন্তু একটা কথা তুমি খেয়াল করছ না, এইসব ক্ষেত্রে দ্রোণদের রূপান্তর ঘটেছে। তারা মনের দিক থেকে ওদের শ্রেণীতেই চলে গেছেন। ফলে সব সময় ওদের স্বার্থই দেখেছেন। সভ্যতার আসল সমস্যাটা তো এটাই

যে আমরা আমাদের সহস্র শুভ ইচ্ছা দিয়েও আমাদের শ্রেণীস্বার্থের গণ্ডির বাইরে পা রাখতে পারি না। মধ্যবিত্তদেরও দেখবে এটা একটা বিরাট পরাজয়। ঠিক এই কারণে আমার বিবেচনায় তিনিই মহৎ মানুষ যিনি জীবনাচরণে না পারলেও অন্তত তাঁর কাজ দিয়ে এই শ্রেণীস্বার্থের গণ্ডি অতিক্রম করতে পেরেছেন।"

তারপর দুজনেই কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে।

অভী বলে, "জানো, অনেক ভেবে দেখেছি, আমরা আমাদের ব্যক্তিস্বাধীনতা, মুক্ত ইচ্ছা এইসব নিয়ে আকাশ ফাটাই, ওদিকে যারা সমাজ চালায় তারা কিন্তু আমাদের কাজে লাগিয়ে ক্রমাগত তাদের স্বার্থসিদ্ধি করে চলে, আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জঘন্যতম কাজ আমাদের দিয়ে করায়। এই মুক্ত ইচ্ছার বাসনা নিয়েও আমরা কিন্তু তা মেনে নি-ই।"

সোমা সায় দেয়, "নিশ্চয়ই এটা সত্যি নইলে এতদিনে জগৎটার চেহারা অন্যরকম হত।"

তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে অভী বলে, "আমরা কত অসহায় না, প্রকাশ্যে বড় বড় কথা বলি; কিন্তু নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য গোপনে ওদেরই পদলেহন করি, সামান্য ইশারা ইঙ্গিত পেলেই কুকুরের মত লেজ নাড়তে নাড়তে জিভের জল সামলাতেই ব্যস্ত হয়ে পড়ি।"

এইসব বলতে বলতেই লম্বা-চওড়া চেহারার একটি মানুষ সসম্ভ্রমে দরজা ঠেলে উঁকি মারে।

অভী তাকে দেখে প্রায় চিৎকার করে ওঠে, "আইয়ে ফাগুরাম সাব।"

লোহা-খাদানের কমরেড, গায়ক, ছত্তিশগড়ী গোণ্ড ফাগুরাম ধীর পায়ে ঢুকে সোমাকে জোড়হাতে বলে, 'নমস্তে'।

অভী তাকে সোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়, "ইনি হলেন কমরেড ফাগুরাম, ওকে আমি আসতে বলেছিলাম। ও এ মাটির সন্তান সুতরাং সোমা তোমার যা কিছু জানার তুমি ওর কাছ থেকে জেনে নিতে পারবে। তাছাড়া ও গায়ক, আমাদের এখানকার গানগুলো ও চমৎকার গায়।"

এই কথা বলে সে ফাগুরামের দিকে তাকিয়ে বলে, "ফাগুরামজী বাঈকো শোনাইয়ে ওহি গানা, বীর শহীদো লাল সালাম।"

অভী উঠে ততক্ষণে ফাগুরামের বসার জায়গা করে দেয়, খাটের তলা থেকে হারমোনিয়ামটা বার করে, সাবধানে বাইরে তুলে এনে তাতে জমে থাকা ধুলোগুলো ঝেড়ে ফেলে।

ঘরে ঢুকে সোমার দিকে তাকিয়ে বলে, "এটা ছোড়দির হারমোনিয়াম, বাড়ি থেকে এবার চাদরে বেঁধে নিয়ে এসেছি। ছোড়দি গান করে না, বাড়িতে পড়ে ছিল।" তারপর ফাগুরামের দিকে তাকিয়ে ইশারায় তার গন্তব্যস্থলটা হাসপাতালের দিকে দেখায়। বেরুবার আগে সোমা বলে, "তুমি ফিরে এলে চা করব।"

রাত্রে খেতে বসে সোমা বলে, "ফাগুরামের কাছে গল্প শুনছিলাম, কী ভয়ঙ্কর অবস্থার মধ্যে নিয়োগীজী কাজ করেছিলেন। তাঁর কথা বলতে বলতে ও কেঁদেই ফেলল। নিয়োগীজী

আমাদের কাছে বাবার থেকেও বড় ছিল — একথা শুনে আশ্চর্য হলাম।"

অভী আনমনে বলে যায়, "এত মানুষের ভালবাসা পাওয়া মুখের কথা নয়। তাঁর অন্ত্যেষ্টির শোভাযাত্রায় তুমি ভাবতে পারবে না, কাতারে কাতারে মানুষ, অন্ততপক্ষে কয়েক লাখ। আমি জানি না, ভারতবর্ষের কোন ট্রেড ইউনিয়ন নেতার জন্য শ্রমিক-কৃষকেরা এমন স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেদের মিশিয়ে দিয়েছিল কিনা। যেমন বুর্জোয়ারা বলে, লেনিন বেঁচে থাকলে পৃথিবীটা ওদের দখলে চলে যেত। তেমনি আমরা বলি, এই মানুষটা বেঁচে থাকলে ভারতবর্ষটা আমরা দখল করে নিতাম।" এই বলে সে আপন মনে হাসতে থাকে।

আগেই গুছিয়ে রেখেছিল, সকালবেলায় এলবাম সমেত কয়েকটা জিনিস হাতের মধ্যে ধরে অভী বলে, "তোমার পুঁটুলিতে জায়গা আছে, তাহলে এগুলো ভরে নাও।"

সোমা উদাসীন দৃষ্টিতে তাকায়, "কী আছে এর মধ্যে।"

অভী হাই তোলে, "সে তুমি জব্বলপুরে গিয়ে খুলে দেখো, এখন পুঁটুলিতে জায়গা আছে কিনা বল, নইলে আমি একটা পুঁটুলি করে দেব।"

সোমা তিরস্কারের ভঙ্গিতে তাকিয়ে থাকে, "বলিহারি, তোমার সব ভাষা!"

অভী হাসে, "শব্দের নশ্বর ব্যবহার, আচ্ছা পেটিকা বললে ঠিক ছিল তাই না, বেশ তাই হল।"

হঠাৎ কথাটা যেন অভীর মনে পড়ে যায় এমন ভঙ্গিতে সে জিজ্ঞাসা করে, "আচ্ছা তোমাদের ওখানে মুক্তিমোর্চা এত শক্তিশালী হল কী করে?"

বিছানার চাদর ঠিক করতে করতে সোমা বলে, "এসব ব্যক্তিগত উদ্যোগ, বেশিদিন নয়, নব্বই সালে আমাদের একটা জোর লড়াই হয়। তাতে বেশ কিছু কর্মীকে সাসপেন্ড করে। তখন আমাদের শ্রমিক নেতা দীননাথ ত্যাগী নিয়োগীজীর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। এরপর নিয়োগীজী আমাদের ওখানে যান, সভা করেন।"

তারপর একটা কথা যেন সোমার মনে পড়ে যায়, "এই সভায় দীননাথজী নিয়োগীজীর পরিচয় করিয়ে দিয়ে একটা চমৎকার গল্প বলেন। উনি বহুদিনের পোড় খাওয়া ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য। বেশ সুন্দর বক্তৃতা করেন। নিজের মাথার সামনের দিকের কয়েক গাছা পাকা চুল দেখিয়ে উনি বলতে শুরু করেন, এই যে দেখছেন চুল পেকে গেছে এর একটা ইতিহাস আছে।"

এই পর্যন্ত বলে সোমা নাটক করার ভঙ্গিতে দেখায়, "আমি নিয়োগীজীর মুক্তিমোর্চার এলাকায় যেখানে এগারোজন শ্রমিক শহীদ হয়েছিলেন তার মাটি এই চুলে মেখেছিলাম। বলতে পারেন এটা আমার একটা ছেলেবেলাকার অভ্যেস, শ্রমিকের রক্তে ভেজা মাটি মাথায় মাখি। তারপর দেখলাম চুলটা সাদা হয়ে গেছে। আমি আমার জীবনে এমন বহু আন্দোলনের

মাটি মাথায় মেখেছি, কিছু হয়নি। কিন্তু এই মুক্তিমোর্চার মাটিতে চুল সাদা হয়ে যাওয়ায় বুঝলাম এই হল আসল মাটি।"

অভী কথাটা মন্ত্রমুগ্ধের মত শোনে, সোমা শেষ করার পর বাথরুমে চলে যায় আর অভী হাঁ করে তাকিয়ে থাকে।

সোমা ফিরে এলে অভী বলে, "আচ্ছা সেদিন কানুবাবুর কথা তুমি কী বলছিলে, বলতে বলতে কথাটা অন্যদিকে ঘুরে গেল।"

সোমা হাসে, "না তেমন কিছু নয়। এই নিয়োগীজীর কথা শুনে আমার খুব তাঁর কথা মনে হচ্ছিল। তোমাদের কলেজে তো তাঁর পিত্তথলির পাথরের অপারেশন হয়েছিল। আমি গৌতমের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। বীরপাড়ায় যার সঙ্গে তাঁর বোনের বিয়ে হয়েছে তিনি আমার পিসতুতো দাদা।"

অভী হাসে, "ও তাই নাকি!"

তারপর কাগজে কী লিখতে লিখতে সে সোমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, "তাঁর অপারেশনের ঘটনাটা নিশ্চয়ই জানো না। আউটডোরে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে জেনারেল বেডে ভর্তি থেকে অপারেশন করিয়েছেন। কী অসম্ভব কষ্ট সহ্য করতে পারেন ভদ্রলোক! এক্স-রে যেদিন হবে আমি ছিলাম না, অন্য একজনকে দায়িত্ব দিয়েছিলাম। শীতের দিনে ঠাণ্ডা গায়ে ঐ অন্ধকার ঘরে ট্রলিতে পাক্কা চার ঘণ্টা শুয়েছিলেন। বিদ্যুৎ ছিল না, পরে যখন বিদ্যুৎ এল তখন রোগীর ভিড়ে চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা। ঐ কষ্টের মধ্যে সবার শেষে কাজ শুরু হয়েছে, তারপর ওষুধ দিতেই প্রতিক্রিয়া হয়েছে — সে একেবারে যাচ্ছেতাই অবস্থা। পরের দিন আমি তো কানুবাবুর সামনে মুখ দেখাতে পারছিলাম না। তারপর অপারেশন করতে গিয়ে পিত্তনালী কাটা পড়ল। আমাদের তো মাথায় বজ্রাঘাত হল, এ মানুষটাকে আর বোধহয় বাঁচাতে পারব না। আমরা ইতিহাসে একটা কলঙ্কই তৈরি করলাম!"

সোমা হাসে, "রাখে হরি মারে কে!"

অভী তাকে সমর্থন জানায়, "প্রায় তাই।"

সোমা বলে, "একদিন বাবার অনুরোধে দুপুরবেলায় শিলিগুড়িতে কাজে এসে দাদার সঙ্গে আমাদের বাড়িতে দুপুরে খেয়েছিলেন। তখন এটা ওটা গল্প করতে করতে শ্রমিক-শ্রেণী, শ্রেণীসংগ্রাম এইসব কথাগুলো যখন এল তখন তিনি বললেন, আমাদের দেশে মার্কস লেনিনের শ্রমিক কই! বাগনানের কৃষক ক্ষেতমজুরেরা হাওড়ায় লোহা শিল্পে কাজ করতে যায়, তারা গাঁয়ে ক্ষুদে জোতদার আর শহরে মজুর। শ্রমিকের চরিত্রই তাদের মধ্যে তৈরি হয়নি। ঠিক এক অবস্থা দুর্গাপুর, বার্নপুরের শ্রমিকদের।"

অভী দীর্ঘশ্বাস ফেলে, "নিয়োগীজী আর কানুবাবুর মধ্যে অদ্ভুত মিল আছে না। দুজনেই আদিবাসী শ্রমিক-কৃষকদের মধ্যে সারাজীবন কাটালেন।"

অভী যেন তার মুখে কথা যুগিয়ে যায়, "দু'জনেই ভারতবর্ষে শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে

কারখানার শ্রমিককে তাঁদের আন্দোলনের শক্তি হিসাবে পেলেন না। কানুবাবুর সঙ্গে ছিল চা-বাগানের শ্রমিক, তাকে কৃষি-শ্রমিকই বলা যায়। আর নিয়োগীজীর ছিল খনি-শ্রমিক। দু'জনের বিরুদ্ধেই অভিযোগ ছিল যে তাঁরা নিজেদের এলাকার মধ্যেই আবদ্ধ রয়েছেন, এলাকা ছাড়তে পারেন না। এইসব দেখেশুনে মনে হয়, এ দেশের বিপ্লবের চরিত্রও এর মধ্যে খুঁজে দেখতে হবে।"

হঠাৎই প্রদীপকে সঙ্গে নিয়ে মুন্সিরাম ঘরে ঢোকে।

অভী সোমার দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারে তারপর হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলে, "আরে আসুন আসুন। আপনার গিন্নীকে এই বন্দীদশা থেকে উদ্ধার করুন।"

প্রদীপও অভীর দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়।

সোমা হেসে তাকে অভিবাদন জানায়, "আসতে কষ্ট হল। অনেক ঘুরতে হল বুঝি, ও হচ্ছে ডাক্তার অভীক —।"

তারপর যেন প্রদীপ ধাতস্থ হয়, অভীকে হাতজোড় করে নমস্কার করে হাসে মাথা চুলকায়, "না, জায়গাটা ঠিক বুঝতে পারছিলাম না।"

এক ঝলক দৃষ্টি বিনিময় করেই অভী তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে হাতের ব্যাগটা নিজের হাতে নিয়ে এককোণে রেখে দেয়, তারপর নিজের চেয়ারে জোর করে তাকে বসিয়ে দেয়, "হ্যাঁ আগে বসে দু'দণ্ড জিরিয়ে নিন, গিন্নীর খবর নিন।"

প্রদীপ রাত্রের ট্রেনে এসেছে। জব্বলপুর থেকে দুরগ্ প্রায় একরাত্রি পথ, ভোরবেলায় স্টেশনে নেমে বাস ধরেছে। বেচারির সারা রাত্তিরে অনেক কষ্ট হয়েছে। সারা দেহে তার পথের ক্লান্তি। সোমা ইতোমধ্যে চা করে নিয়ে আসে।

অভী লক্ষ্য করে, সামনে প্রদীপ থাকলেও সোমার কোন সঙ্কোচ আড়ষ্টতা নেই। যেমন আর পাঁচজন মানুষের সঙ্গে সোমা ব্যবহার করে এখানেও তাই। এটাই কী দম্পতির বোঝাপড়া, না শুধুই সোমার ব্যক্তিত্বের গুণ। একটা ক্ষীণ আশঙ্কা অভীর ছিল, হয়তো কোন ছোটখাট অপ্রীতিকর অবস্থার সৃষ্টি হলেও হতে পারে। অভী নিশ্চিন্ত হয়, সে আশঙ্কা অমূলক!

অভী প্রদীপের দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বলে, "আপনি বোধহয় ফোন করেছিলেন?"

তারপর সোমার দিকে তাকিয়ে বলে, "আমাদের হাসপাতালের লাইনটা গোলমাল করছে। মোর্চার অফিসে ফোন এসেছে, একজন কমরেড আমায় এসে খবর দিল, কে একজন সুষমাবাঈ আমার ঘরে আছে তার বাড়ির লোক ফোন করেছিলেন। আবার দশ মিনিট পর ফোন করবে। আমি তাকে বলে দিলাম, বলবে কোন চিন্তা নেই, সব ঠিক হ্যায়।"

অভীর কথা বলার ধরনে উপস্থিত সবাই হেসে ওঠে। "আপনারা তাহলে কথা বলুন আমি একটু ঘুরে আসি," কাজের অজুহাতে অভী উঠে যায়।

ঘরে ফিরেই অভী দেখে সোমা প্রস্তুত হয়ে গেছে। কিন্তু চাঁদনীকে হাতের কাছে কোথাও পাওয়া গেল না। অনেক দূরের পথ। অগত্যা সোমা তৈরি হয়ে নিয়েছে।

স্নানঘর থেকে ফিরে ব্যস্ত হয়ে সোমা ব্যাগের চেন লাগায়, শেষবারের মত আয়নায় মুখটা দেখে নেয়। অভীকে ইঙ্গিতে দেখিয়ে দেয় পড়ে থাকা প্রসাধন সামগ্রী সে চাঁদনীর জন্যে রেখে যাচ্ছে। পরনের শাড়ির আঁচলটা বড় হয়েছে দেখে সেটা ঠিক করে, স্বগতোক্তি করে, "বুঝলে, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়াই ভাল।"

প্রদীপ একটা ভাড়াগাড়ি আনার জন্য বেরিয়ে যায়। অভীই যেতে চাইছিল, প্রদীপ তাকে বাধা দেয়।

সোমার খুব কাছে দাঁড়িয়ে অভী বলে, "সোমা আমায় ক্ষমা করে দিও।"

সোমা তার ঠাণ্ডা হাত দুটো অভীর হাতে দিয়ে জোর করে চেপে ধরে হাসে, "কী পাগলের মত বকছো!"

তারপর ওর নাকটা টিপে বলে, "তুমি মানুষটা ভাল, সেইরকমই আছ। সেইরকম রোমান্টিক, ঐরকম ভাবুক, ঐরকম জেদী, বাইরে যতটা কঠিন ভেতরে ততটা নরম, অন্যের দুঃখ-কষ্টে কাতর হও, যক্ষুনি যা মনে হল তক্ষুনি তা করে ফেল, তা সে অন্যে কষ্ট পেলেও — ঠিক সেই মানুষটা, যাকে আমি আমার মানুষ বলে ধরে নিয়েছিলাম।"

একটু থেমে কিছু ভেবে নিয়ে বলে, "তুমি যতখানি কাছে ছিলে, অন্তত আমার মনে হয়েছিল, ঠিক ততখানি দূরে রয়েছ, এটা বুঝতে পারিনি।"

অভী, সোমার হাত দুটো মুঠোর মধ্যে ধরে নেয়, "নিজের প্রকৃতি কী করে বদলাতে পারি বল।"

সোমা যেন আরও দুর্বল হয়ে পড়ে, প্রায় ফিস্‌ফিস্ করে বলে, "কী অদ্ভুত দেখ, এখানে এই কয়েকদিনে কোথায় আমার কষ্ট, কোথায় আমার অসুস্থতা কিছুই বুঝতেই পারলাম না। তাহলে কেন লোকে আমায় বলবে না আমি বেশি বেশি রোগ দেখাই।"

তারপর একটু চুপ করে থেকে আবার বলতে শুরু করে, "তোমায় এক সময় বললাম তো আমার বিয়ে করার মোটেই ইচ্ছা ছিল না। তারপর কথাটা নিয়ে স্নানঘরে গিয়ে ভাবতে বসলাম, আচ্ছা ওকে কথাটা কী ঠিক বললাম? অনেকক্ষণ ভেবে দেখলাম, না ঠিক বলিনি! মনের মধ্যে কোথাও যেন একটা সুপ্ত বাসনা বাসা বেঁধে ছিলই।"

সম্মোহিত অভীর সামনে মিহি গলায় প্রায় ফিস্‌ফিস্ করে সোমা বলে, "যদি তোমার মত একটা ছোট্ট ফুটফুটে বাচ্চা পেতাম। সারাদিন তাকে চটকাতাম, বুকের মধ্যে রাখতাম। তেল মাখাতাম, স্নান করাতাম, ঘণ্টার পর ঘণ্টা তার বিরক্তি সহ্য করতাম। তুমি যেমন জ্বালাও তেমনি ও জ্বালাচ্ছে — এই কথা সারাক্ষণ ওকে শোনাতাম, কপট রাগ দেখাতাম আর ও ঠোঁট ফোলালে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরতাম।"

অভী বিহ্বল দৃষ্টিতে সোমার দিকে তাকিয়ে থাকে।

সোমা হেসে যোগ করে, "তা না হলে আর তোমাকে কী করে পাব বল, তুমি যতখানি কাছে ততখানি দূরে।"

তারপর সেই ঘোর নিস্তব্ধতায় আনমনে খোলা দরজায় দৃষ্টি রেখে দূরের দিকে তাকিয়ে ছলছল চোখে সোমা বলে ওঠে, "কেমন অদ্ভুত হয় দেখ, আমি জানি এটা সত্যি নয়, তবু সত্যি বলে ভাবতে ইচ্ছা করে! সবই তো জানি-বুঝি তবু কেন এমন হয়! যেমন ধর তুমি যখন সেদিন গাইছিলে, নাজিম হিকমতের কবিতাটা, ফাগুরাম বসে ছিল, সেই লাইনটা '— নক্ষত্রের নিচে জ্বালা/অগ্নিকুণ্ডের মত তুমি, আমার প্রিয়তমা/আমি তোমাকে স্পর্শ করেছি —।' আমি যেন একটা ঘোরের মধ্যে শুনছি আর তোমায় কেবল জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছা করছে। নিজের মনকে শাসন করছি, বার বার নিজেকে বোঝাচ্ছি, আমি সে প্রিয়তমা নই। এসব আদিখ্যেতা; কিন্তু তবু মন যেন ঐ মিথ্যেটাকেই বিশ্বাস করে আঁকড়ে ধরতে চাইছে।"

অভী অবাক হয়ে সোমার দিকে তাকিয়ে থাকে।

কিছুক্ষণ দুজনেই নিথর, নিস্পন্দ।

সেই নিস্তব্ধতার রেশ কাটিয়ে সোমা বলে যায়, "খুউব ভাল লাগল। কেন ভাল লাগল হয়তো সবটা জানি না; কিন্তু তোমায় গোপনে বলছি, আমার জীবনের সব থেকে ভাল কয়েকটা দিন আমি এখানে কাটিয়ে গেলাম। বহুদিন মনে থাকবে। কেন মনে থাকবে তাও ঠিকমত হয়তো বলতে পারব না। জানই তো তোমার মত অত গুছিয়ে কথা বলতে পারি না, এর জন্য কত বকুনি খেয়েছি।"

অভী হাসে, "না তুমি অনেক পরিণত হয়েছো, এখন তুমি আর আমার সেই চেনা লাজুক মেয়েটি নও।"

সোমা হাসে, রুমালে মুখ মোছে, "মুখরা, বেশ তাই না হয় হল! অভীক খুব ভাল লাগলো তোমার এখানে এসে। সেই ভাললাগাটা প্রতিটি রোমকূপে শুষে নেবার চেষ্টা করেছি। আমরা দৈনন্দিন জীবনে এমন বিরক্তিকর অবস্থার মধ্যে দিন কাটাই যে তোমার এখানে এলে বোঝা যায়, জীবনের প্রাণবন্ততা কত শক্তিশালী। এ তো তীর্থক্ষেত্রে হজ করে যাওয়া।"

হঠাৎ সোমা খেয়াল করে, অভী কাঁদছে, তার চোখে জল।

"এ কী", বলে কপট রাগ দেখিয়ে, হঠাৎ সোমা তার কাঁধ দুটো ধরে মৃদু ঝাঁকিয়ে চোখটা মুছিয়ে দিয়ে বলে, "হায় রে! আমার বীরপুরুষ ছেলে!"

এতে অভীর কান্নার মাত্রা যেন আরও বেড়ে যায়।

সোমা এবার তাকে তিরস্কারের ভঙ্গিতে বলে, "ছিঃ অভী, তোমার চোখে এসব মানায় না। প্লিজ, আমায় দুর্বল করে দিও না। তোমার এই কষ্ট আমায় কতখানি ব্যথা দেবে একবার ভাবো তো!"

অভী 'সরি' বলে অস্ফুট উচ্চারণ করে মুখটা সরিয়ে নেয়!

নিচের থেকে প্রদীপের হাঁক আসে। সোমা সহজ করার ভঙ্গিতে বলে, "চিঠি লেখার

অভ্যাস তোমার নেই; কিন্তু আমি তোমায় চিঠি দেব। মনে হলে দু'এক লাইন উত্তর দিও। আর এখান থেকে কোথাও বদলি হলে নিশ্চয়ই জানাবে।"

তারপর চুপ করে থেকে হেসে বলে, "কোনদিন সুযোগ হলে যেও। আর যদি আমার দ্বারা কোন সাহায্য —।"

অভী মাথা নাড়ে, "ওষুধগুলো যেমন যেমন বলেছি ঠিকমত খেয়ো।"

মাথা নেড়ে হাতের ব্যাগটা নিয়ে সোমা এগিয়ে যায়।

ঘরে ফিরে এসে সোমার সেই যাওয়ার পথটায় অভী তাকিয়ে থাকে। এই কয়দিনে বাড়িটায় অসুস্থ শরীর নিয়েও যেন সে কী একটা রচনা করে রেখেছিল। অভী অন্তরে জানত, সে কতখানি শ্বাসকষ্টে ভুগছে, তবু যেন এতদিন সব ভুলে সেই রচনাই দেখে চলেছিল, তাতেই সে বিভোর হয়ে গিয়েছিল।

আশ্চর্য, সে সব ভুলে গিয়েছিল! বাইরের জগতের দিকে তাকাবার ফুরসত হয়নি। পাখির ডিমে তা দেওয়ার মত মন পড়েছিল এই বাড়িতেই। যে বাড়ি তার কাছে এত নিঃসঙ্গ ছিল সেই বাড়ি যেন তার কাছে কত মধুময় হয়ে উঠেছিল। চারপাশে সোমার গায়ে লাগা বাতাস যেন এখনও ঘুরে বেড়াচ্ছে।

আর কী একটা কষ্ট যেন তার বুকের মধ্যে আটকে রয়েছে। কিছুতেই এটাকে তাড়াতে পারছে না। কেন এই কষ্ট হচ্ছে তাও সে ঠিকমত জানে না!

মনে হচ্ছিল ওদের যাবার পথে আরও একটু এগিয়ে দেয়; কিন্তু হাসপাতাল ছাড়তে ইচ্ছে করল না। ডাক্তাররা কেউ নেই।

সেটাও বোধহয় কারণ নয়। তার এ কথাও মনে হয়েছে, ওদের সঙ্গে যাওয়া মানে আর একটু কষ্ট বাড়ানো।

কিন্তু এখন অভীর কষ্ট হচ্ছে কেন? সোমা তো ওর বেদনা লাঘব করে দিয়ে গেছে, এতে অভীর আরাম পাবার কথা।

অভী নিঃশব্দে পায়চারি করে।

হঠাৎ জল খাবার জন্য ঘরে ঢুকে অভী উপলব্ধি করে, সারা ঘরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে সোমার স্মৃতি, তার হাতের পরশ। একদিকে টেবিলের ওপর পড়ে আছে 'শ্যামলী'টা, তার মিলভাঙ্গা কবিতার এক জায়গায় সোমা পেন্সিল দিয়ে দাগ দিয়েছে। হয়তো ভেবেছিল অভীকে পড়াবে, ভুলে গেছে। অভী আগ্রহী হয়, চোখ বোলায়।

"... আমার জীবনধারা
কোথাও রইল না থেমে
দুর্গমের মধ্যে, গভীরের মধ্যে,
মন্দভালোর দ্বন্দ্ববিরোধে,
চিন্তায় সাধনায় আকাঙ্ক্ষায়,
কখনো সফলতায়, কখনো প্রমাদে,
চলে এসেছি তোমার জানা সীমার
বহুদূর বাইরে ;
সেখানে আমি তোমার কাছে বিদেশী।

সেই তুমি আজ এই মেঘ-ডাকা সন্ধ্যায়
যদি এসে বস আমার সামনে,
দেখতে পাবে আমার চোখে
দিক-হারানো চাহনি
অজানা আকাশের সমুদ্রপারে
নীল অরণ্যের পথে। ..."

আরও একপাশে পড়ে রয়েছে জর্জ এলিয়েটের মিডলমার্চের কোটেশনটা। এটা ভারি পছন্দ হয়েছিল তার। সেটা হাতে তুলে নিয়ে অভী অনুচ্চস্বরে পড়তে শুরু করে, "Here and there a signet is reared uneasily among the ducklings in the brown pond, and never finds the living stream in fellowship with its own weary-footed kind. Here and there is born a St. Theresa, foundress of nothing, whose loving heartbeats and sobs after an unattend goodness tremble of and are dispersed among hindrances instead of centering in some long-recognizable deed."

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে অভীর। সে জানলার দিকে আনমনে তাকিয়ে থাকে। সোমার আসার কথা ছিল না, সে হঠাৎ করেই এসেছিল, আর সে থাকার জন্য এখানেও আসেনি। মাত্র পাঁচটা দিন ছিল। তাই তার চলে যাওয়ায় এতখানি কষ্ট হওয়ার কথাও নয়।

তাছাড়া সোমা ভাল আছে। সে তার জীবনকে যেভাবেই হোক মানিয়ে নিয়েছে। এর জন্য বাড়তি কোন দুঃখ তার মনের মধ্যে নেই। সুতরাং এ ব্যাপারেও অভীর কোন কষ্ট হবার কথা নয়।

তাহলে তার বুকে এমন একটা চাপা ব্যথা হয় কেন! তা কী সোমাকে আরও পেতে চেয়েছিল বলে!

কিন্তু তেমন তো বোধ হয় না। সোমা তাকে অনেক বড় করে দিয়ে গেছে, তাকে এতটুকু

ছোট করে যায়নি।

এই পাঁচদিন একটা ঘোরের মধ্যে তার কেটেছে। তার প্রতিদিনের অসংখ্য কাজের রুটিন যেন এলোমেলো হয়ে গেছে। যেমন একটা হঠাৎ ধেয়ে আসা কালবৈশাখীর ঝড়ে চারপাশ সব অবিন্যস্ত করে দিয়ে যায়। সে যেন এ ক'দিন অন্য জগতে ছিল, মধুর মিষ্টি স্বাদ আর মোমের স্নিগ্ধ আলোয়, কোন মাধুর্যের জগতে কল্পনার জাল বুনে চলেছিল।

সেই পেছন দিকে ফেলে আসা দিনগুলোয়, সেই গড়ে উঠবার দিনগুলোয় — সেই সময়টা যেন তার কাছে আরও একবার সত্য হয়ে এসেছিল। তারা দু'জনে যেন ইচ্ছা করে সেই দিনগুলোকে ফিরিয়ে এনেছিল। দু'জনেরই মনে হয়েছে যা জীবন থেকে চলে যায় তা আর কোনদিন ফিরে পাওয়া যায় না। অন্তত সেইভাবে নয়। কিন্তু তাকে কল্পনা করে সাজিয়ে নিয়ে কষ্ট পাওয়া যায়, এমনকি প্রাণের আরামও পাওয়া যায়।

বোধহয় ঐ সময়টা জীবন থেকে হারিয়ে যাবার জন্য বুকের ভেতরে এমন একটা চাপ চাপ ভাব হচ্ছে। ঐ অধ্যায়টা যেন অনেক তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল।

এবার নতুন অধ্যায়, আরও কঠিন অধ্যায় শুরু করতে হবে। পুরানো সঞ্চয় নিয়ে বেচাকেনা করে আর কাটানো যাবে না। একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে অভীর।

জানলায় চোখ রেখে দূরের আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। এই পনেরো বছরে কত পরিবর্তন হয়েছে পৃথিবীর! অভীও কী আর সেই মানুষ আছে! সে-ও কত পাল্টেছে!

এখানে একরকম করে চলছিল; কিন্তু নিয়োগীজী মারা যাবার পর সেই স্থিরতা নিয়েও যেন সংশয় দেখা দিয়েছে। আবার তাকে নতুন করে ভাবতে হবে, নোঙর হয়তো তুলতে হতে পারে। এইসব ভাবনার সঙ্গে আরও কত কথা মনের মধ্যে ভিড় করছে।

মনে হচ্ছে সোমা যেন অভীর জীবনের এই ঘুরপথের বাঁকটায় এসে দেখা দিয়ে গেল। আর বলে গেল, আমাদের চাওয়া-পাওয়া সব যতখানি কাছে ঠিক ততখানি দূরে।

এইসব ভাবতে ভাবতে অভীর মনে হয়, এ জগতে যা সত্য তা হয়তো কোনদিনই জানা যাবে না। তাই সময়ের অপত্যরূপে যা জানছি আর বুঝছি, তাকেই সত্য বলে মেনে সান্ত্বনা পাওয়া ছাড়া উপায় নেই! এই কারণেই কী আমরা জগৎ-জীবন-সংসারের প্রতি নির্লিপ্ত হতে চাই! এই ঘটনাকেই কী কালিদাস বলছেন, ভূমার মালিক হবার জন্য নিজেকে অস্বীকার করে ভিখারি হয়ে যাওয়া!

অভী চশমার কাচটা পাঞ্জাবির কোণায় মুছে দূরের দিকে তাকায়।

এতদিনে কত কথা হয়েছে। শুধু আবেগের টানে এত অফুরন্ত কথা অনর্গল উঠে এসেছে! দীর্ঘশ্বাস পড়ে অভীর।

কতদিন নিয়োগীজী পরিকল্পনা করতেন, চলিয়ে ডাক্তারসাব। দূর-দূরান্তের গ্রামে চাঁদনী

রাতে সারা রাত ধরে মাদল বাজিয়ে যুবক-যুবতীরা নাচগান করে। এ জিনিস আর দেখা যাবে না। মানুষের প্রাণের আনন্দ, প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছাস হয়ে এখন ক্রমশ কাগজের ফুল হয়ে সামনে এসে হাজির হচ্ছে। এইসব স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণের আবেগ আর হয়তো দেখা যাবে না। চারদিকে দূষণ আর কলুষের মধ্যে অসংখ্য শহর, নগর, গঞ্জ গড়ে উঠবে।

প্রকৃতির সেই প্রাণবন্ত জীবন কোথাও হারিয়ে যাবে, জাদুঘরের দরজার মধ্যে।

কিন্তু এটাই কী সভ্যতার অগ্রগতির অমোঘ নিয়ম নয়! নইলে এই ন্যাংটা অভুক্ত চিররুগ্ণ মানুষের দল তাদের এই প্রাকৃতিক সহজ-সরল স্বভাব নিয়ে কোন্ স্বর্গলোক রচনা করবে, যদি তারা জীবনের সমাজের এই অসম্ভব জটিল গ্রন্থিগুলোর বাধা অতিক্রম না করতে পারে!

দিন-রাত্রি, ভাল-মন্দ, নতুন-পুরাতন, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, না-হ্যাঁ — এমন দ্বিমাত্রিক ভাবনা দিয়ে প্রতিদিনের জটিল সমস্যার সহজ সমাধানের দিন শেষ। নতুন মানুষকে এইসব নতুন জটিল অবস্থার মোকাবিলা করার জন্য হতে হবে আরও অনেক জটিল।

কিন্তু তাতে কী মানুষ ক্রমশ আরও দুর্বোধ্য হয়ে উঠবে না! জটিল বিষয়ের সমাধানের জন্য কী মানুষের মনকেও জটিল হতে হয়! তার সহজ-সরল আবেগের প্রকাশও তখন ততোধিক জটিল হয়ে ওঠে! তাহলে সে অন্য মানুষদের ভালবাসবে কী করে!

এটাই কী বিজ্ঞানসম্মত ভালবাসা!

তাহলে শিশুরা কী ক্রমশ যন্ত্র হয়ে উঠবে না!

এই যান্ত্রিকতা থেকে মানুষকে বাঁচাবে কে — নারী!

অভী আর ভাবতে পারে না। 'জটিল আবেগ' কথাটাই যেন কেমন লাগছে তার।

এইভাবে আপন মনে বিভোর হয়ে নিজের সঙ্গে কথা বলাই বোধহয় পাগলামি, অন্তত অন্য মানুষদের চোখে। যেমন অভীর হঠাৎ মনে হচ্ছে, সে কেন এখনো হাসপাতালে পা রাখেনি এটা দেখার জন্য নিশ্চয়ই দু'চারজন উঁকিঝুঁকি দিয়ে গেছে। অভী তখন তা ভ্রূক্ষেপ করেনি। সে নিজের চিন্তাতেই বিভোর হয়েছিল। এবার দায়িত্ব পালন করার জন্য তাকে প্রস্তুত হতে হবে।

কিন্তু এই মানুষটা যে এই সময়ে একটা বাতিঘরের খোঁজে সমুদ্রের উথাল-পাতাল ঢেউয়ে ঘনান্ধকার জাহাজের মাস্তুলের ওপর টলছে আছাড় খাচ্ছে আর চোখ কচলাচ্ছে, এই কথাটা কী কেউ কোনদিন জানবে বা বুঝবে?

তারা না জানুক, তবু অভী জানে, এই ভাবনাই মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে। তাই এখন সে সময় পেলেই নিজের সঙ্গে কথা বলে, ঠিক একা একা দাবাখেলার মত।

আচ্ছা, আজ যদি সোমার বদলে মানসী তার সামনে এসে দাঁড়াত তাহলে ব্যাপারটা কেমন হত? নিশ্চয়ই পরিবেশ-পরিস্থিতি একটু অন্যরকম হত। এরা দুজনেই নারী, দুজনের মধ্যেই রয়েছে নারীসত্তায় মেশানো অফুরন্ত প্রাণের চঞ্চলতা; কিন্তু দুজন দু'রকমের। এটাই তো স্বাভাবিক।

অভীই বা কে? আর পাঁচজনের মত এই সমাজে গড়ে ওঠা একটা মানুষ, যে শিকড় চারিয়ে দিতে চায় মানুষের মধ্যে, জীবনের গভীরে। এমনি আমরা সবাই আমাদের হৃদয়ের প্রকাশের মধ্যে দিয়ে আমাদের আচার-আচরণ, শিক্ষা-রুচি — এইসব কিছুতে মেশানো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড খণ্ড মানুষের ইতিহাসকে টেনে নিয়ে চলি। তাই মানুষগুলোকে জানার সঙ্গে সঙ্গে সেই যুগটাকেও জানা হয়। কিন্তু তাতে কী আদর্শের রঙ ছাপ ফেলে না?

নিশ্চয়ই ফেলে। আর আদর্শ কী মানুষকে একচক্ষু হরিণ করে তোলে না?

অভীর এখন মনে হয়, ব্যাপারটা একেবারে শত্রুতার পর্যায়ে না গেলে প্রকৃতির সন্তান-সন্ততিরা যে যেমন আছে থাক্, সুখে থাক্, ভাল থাক্। এই বিচারে কে ভাল কে খারাপ — এ প্রশ্ন আজ অভীর কাছে অবান্তর। সবাই তার আপন হিসাবে পথ চলে।

কিন্তু তবু এই কথাটাও সত্যি, তাই বলতেই হয়, জীবনবোধের গভীরতায় যে মানুষ অনেক বেশি মানবসত্তার কাছাকাছি পৌঁছাতে পেরেছে তার প্রতি আমাদের বোধহয় শেষ বিচারে একটু পক্ষপাতিত্ব থেকেই যায়।

কী বিচিত্র, ভঙ্গুর মানুষের মন! হয়তো এরই মধ্যে লুকিয়ে আছে নিওটেনি, নমনীয়তা।

একদিকে তার মধ্যে রয়েছে অফুরন্ত প্রেম, টান-ভালবাসা আবার অন্যদিকে রয়েছে তার নিষ্ঠুরতা, হিংস্রতা। যে মানুষ তার সন্তানকে ভালবাসে, তার প্রিয়াকে ভালবাসে, তার ধন-সম্পত্তিকে ভালবাসে, তার জীবনকে ভালবাসে আবার ঐ মানুষই কোন কোন ক্ষেত্রে অন্যদের প্রতি নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে। একেই গৌরীদা বলেন ইভিল। আর নিয়োগীজী, রামকৃষ্ণদা বলেন সংশোধন-অযোগ্য শ্রেণীশত্রু।

সত্যি কী এই নিষ্ঠুরতা আমরা প্রকৃতি থেকে পেয়েছি!

ভাড়া করা যে মানুষটি নিয়োগীজীকে খুন করেছে সে হয়তো ঐ টাকা দিয়ে তার ব্যবসা ফাঁদবে, তার ছেলেমেয়ে মানুষ করবে, তার ঘরের অন্নসংস্থান করবে বা হয়তো মদ খেয়ে জুয়া খেলে ঐ পয়সা উড়িয়ে দেবে।

না, এটি ঐ লোকটির নিষ্ঠুরতা নয়, এটা তার পেশা। এর সঙ্গে অন্য মানুষদের নিষ্ঠুরতার সমন্বয় ঘটেছে।

অচ্ছা এমন তো হতে পারত 1923 সালের নভেম্বরের নাৎসিদের সঙ্গে সংঘর্ষে হিটলার গ্রেপ্তার না হয়ে মারা গেল। তাহলে পৃথিবীর ইতিহাসটাই বদলে যেত — এক কোটি দশ লক্ষ ইহুদি অন্তত মারা যেত না!

একটা কথা বার বারই অভীর মনের মধ্যে ঘুরে ঘুরে আসে।

তখন কী অভী সোমার প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করেনি! যে মেয়েটা তার দেহের অসুস্থতা নিয়ে অভীর সঙ্গে ঘর বাঁধতে চেয়েছিল, অভী তাকে নির্মমভাবে নিজের জীবন থেকে সরিয়ে দেয়নি! আরও ভাল কিছু পাবার লোভ, এক দুরন্ত মোহ তাকে আচ্ছন্ন করে তুলেছিল। আর এটাই তাকে শেষমেষ নিষ্ঠুর করে তুলল।

এ কথা সত্যি, সেই সময় মানসীকে পাওয়ার জন্য একটা উদগ্র লোভ তাকে তার জ্ঞান,

বুদ্ধি, বিচার-বিবেচনাবোধ সব ভুলিয়ে দিয়েছিল।

তবু অভী তার কৃতকর্মের জন্য অনেক কষ্ট পেয়েছে। সোমা এর জন্য অনেকখানি মানসীকে দায়ী করে। কিন্তু অভী জানে, এই সমস্ত ঘটনার বড় অংশের দায় তার। তবে মানসীও স্বীকার করেছিল, এ দোষ শুধু তার নয়। মেয়েরা অনেকে এমন কাজ করে, এই কাজ না করার মত উদার সে অন্তত নয়।

ঠিক এটাতেই সোমার ভীষণ আপত্তি।

অভী তাকে একবার 'শিল্পী' বলায় সোমা যেন দপ্ করে জ্বলে উঠেছিল। শিল্পীরা কী অন্য গ্রহের মানুষ নাকি! তারা নিজেরা দুঃখ-কষ্ট পায় না! তারা জানে না জীবনটাও একটা শিল্প, বহু কষ্ট করে তা গড়ে তুলতে হয়! একজন মেয়ে হয়ে মানসী অন্য মেয়ের ব্যথা বুঝতে পারলো না, সে কিসের শিল্পী!

অভী নিজেকে দোষ দেয়। সমস্ত ঘটনাটা সে সংঘটিত করেছে। সে না চাইলে কোন কিছুই ঘটতো না।

জীবনে অনেক কিছুই অভী চেয়েছে তাই হয়েছে। এটাও অভী চেয়েছিল তাই হয়েছিল। কিন্তু এর জন্য যতটুকু মূল্য দেবার তা কী অভী দিয়েছে! তবু সোমা তাকে যেন মুক্তি দিয়ে গেল।

কিন্তু মানুষ কেন এতখানি নিষ্ঠুর হয়! কেন সে অনেক সময় অন্যের ব্যথা বোঝার চেষ্টা করে না! কেন সে কোন কোন সময় নিজের স্বার্থকেই একমাত্র জীবনের লক্ষ্য করে তোলে!

এটা কী তার বেঁচে থাকার সংগ্রাম। তাহলে মানুষের সমাজেও কী জীবজন্তুদের মত এই ধরনের নিরন্তর অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম চলে!

মানুষ কী সত্যি তার এই গুণাগুণ নিয়ে জীবের বিবর্তনে মইয়ের মাথায় নৈবেদ্যের কদমার মত বসে আছে! না সে শুধুমাত্র জীবজগতের মহাবৃক্ষের এই বিপুল অপূর্ব বৈচিত্র্যের এক অতি ক্ষুদ্র অংশ, একটা ছোট্ট শাখা!

মানবমন কী এই জগতের সব কিছুর মানদণ্ড!

এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে, এই অতি ক্ষুদ্র জীবজগতের বিবর্তনে প্রগতি বলে সত্যি কী কিছু আছে! না এটা নিছক বস্তুর পরিবর্তিত রূপ। এইরকম নানা প্রশ্নের ভিড়ে অভী যেন উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে যায়, ক্ষত-বিক্ষত হৃদয়ে পায়চারি করে চলে।

হঠাৎ দরজায় করাঘাত পড়তেই অভীর ধ্যানভঙ্গ হয়, সে চমকে ওঠে! দুর্ঘটনা, অভীকে এক্ষুনি হাসপাতালে যেতে হবে।

চেয়ারে বসেই অভীর বুকটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে, সোমার কিছু হয়নি তো! সে হঠাৎ ওঠার সামর্থ্য হারিয়ে ফেলে। শুকনো গলায় ঢোক গিলে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারে, বাঈ চলে গেছে, তাকে খুঁজতে গিয়ে চাঁদনীর পায়ের ওপর দিয়ে গাড়ি চলে গেছে। অভী 'ওফ্' বলে একটা আর্তনাদ করে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে যায়!

অন্য মানুষ

যুগে যুগে আমাদের এই প্রিয় পৃথিবীকে ছেনি আর হাতুড়ি দিয়ে আমাদের স্বপ্ন আর আকাঙক্ষার মত গড়ে তুলতে চেয়ে আমরা, অসংখ্য সাধারণ মানুষেরা কম বেশি অন্য মানুষে রূপান্তরিত হই। এই রূপান্তরের পথটা সফল হলে ছোট আমি বড় আমিতে গিয়ে মেশে, ছোট প্রেম বড় প্রেমে উদ্ভাসিত হয়, ব্যক্তি-মুক্তি সমষ্টি-মুক্তিতে একীভূত হয়। যার পেছনে শক্তি হিসাবে কাজ করে আদর্শের বিজ্ঞান বা বিজ্ঞানসম্মত আদর্শ। এই নতুন মানুষ গড়ার কারিগররা তাঁদের সমাজকে ভালবেসে, দেশকে ভালবেসে এক অভাবনীয় আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁদের জীবন উৎসর্গ করে থাকেন। ঠিক যেমন ভবের সঙ্গে ভাবের মিলন করতে চেয়ে ছত্তিশগড়ে শঙ্কর গুহনিয়োগী প্রাণ দিয়েছিলেন। ভারতবর্ষের জন্য একদল আদর্শবান অন্য-মানুষ তিনি গড়তে চেয়েছিলেন। কারা এই অন্য মানুষ? লেখকের জবানীতে পাবেন, সেই অন্য মানুষের প্রকৃতি।

লেখক পরিচিতি

লেখক মনোরোগ-বিশেষজ্ঞ এবং মানবমন পত্রিকার সম্পাদক, বিশেষত বাংলাভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ে লেখেন। তাঁর লেখা আরও কয়েকটি বই—বিজ্ঞানদর্শন পরিচয়, অন্য মন, বংশগতি ও জিনের অসুখ, রোগ অসুখ, গ্রামীণ স্বাস্থ্য, দুরন্ত, নারীর প্রতি হিংসাত্মক আচরণ।

পাভলভ ইনস্টিটিউট

ISBN 81-88036-11-0

প্রচ্ছদ : দীপ্তধী মুখোপাধ্যায়